বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৬

BIGALITA KARUNA JANHABI JAMUNA
A travelogue on The Himalays by Sanku Maharaj published by
Mitra & Ghosh publishers Pvt. Ltd., 10, Shyama Charan Dey Street,
Calcutta 700073

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসাসি অফসেট ৩৯বি, নারকেলডাঙ্গা মেন
রোড কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে সন্দীপ চ্যাটার্জী কর্তৃক মুদ্রিত

৺অতুলচন্দ্র গুহ

ও

৺বিমলকুমার ঘোষের

অমর আত্মার উদ্দেশে

গঙ্গাবতরণ – গঙ্গোত্রী।

ফটো জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

মন্দির ও গঙ্গোত্রী উপত্যকা

যমুনা মন্দির – যমুনোত্রী। ফটো গোরাচাঁদ পাল।

গঙ্গোত্রী মন্দির পেছনে সুদর্শন ও মাতৃ শৃঙ্গ দেখাযাচ্ছে। ফটো শম্ভুনাথ দাস।

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

তথাস্তু।

সেই থেকে শিব চিরবিরাজমান এখানে। এই ঋষিকেশে। হিন্দীতে ঋষিক্ শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় দমন করা যায় যেখানে।

শিব এখনও এখানে রয়েছেন, না পালিয়ে বেঁচেছেন, বলতে পারি না। থাকলে কিন্তু তাঁকেও ইন্দ্রিয় দমন করতে হচ্ছে। শ্রবণেন্দ্রিয়। আজকের ঋষিকেশের রাস্তা দিয়ে চলতে হলে কানে তুলো গুঁজে নিতে হয়। বিশেষ করে বড় রাস্তার মোড়ে চক্চকে দোকানগুলো। ক্রেতাদের কল্‌কলানিতে সরব। সে সব যদিও বা সহ্য করা যায়, অসহ্য এই রেডিও-সিলোন। পশ্চিমী ঢঙের হিন্দী গানে মুখর হয়ে আছে চারিদিক।

এই মুখরতার সঙ্গে ঋষিকেশের প্রাচীন ইতিহাসের কিন্তু কোন মিল নেই। বরাহপুরাণে পড়েছি—দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসে তপস্যা শুরু করেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রম্‌লোচা নামে অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে। নিজের সৌন্দর্য ও যৌবনের বিনিময়ে প্রম্‌লোচা দেবরাজের আদেশ পালন করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু জন্ম দিতে হল দেবদত্তের কন্যা রুরুকে। প্রম্‌লোচা দেবরাজ-সভায় ফিরে যাবার পরে দেবদত্ত আবার তপস্যা শুরু করে সিদ্ধিলাভ করেন।

দেবদত্তের দেহরক্ষার পর পিতার পরিত্যক্ত আসনে তপস্যা শুরু করলেন রুরু। সন্তুষ্ট শিব তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'বৎসে, তোমার তপস্যায় মুগ্ধ আমি। সার্থক তোমার ভক্তি। ধন্য তোমার জীবন। বল, কি তুমি চাও?'

আভূমি প্রণাম করে উত্তর দিলেন রুরু, 'দেবাদিদেব! তপস্যাচারিণী আমি। আমার তো কোন কামনা-বাসনা নেই। আপনার দর্শনেই ধন্য আমার জীবন। নিজের জন্য আমার কিছুই চাইবার নেই, হে সর্বশক্তিমান।'

'নিজের জন্যে না হোক, মানুষের জন্য—মানুষের এই পৃথিবীর জন্যও কি তোমার কোন প্রার্থনা নেই?'

উত্তর দিতে একটু ভাবতে হয় রুরুকে। তার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, 'হে

মহেশ্বর। এই সসাগরা পৃথিবীতে তপস্যা-ভূমির বড়ই অভাব। আপনি যদি এখানে চিরকাল বিরাজ করতে সম্মত হন তা হলে এই পুণ্যভূমি আগামী দিনের ঋষিদের তপস্যা-ভূমিতে পরিণত হতে পারে।'

—'তথাস্তু।'

সেই ঘর। এক বছরে যেন একটুও বদলায় নি। খাটিয়াটা এমনি ছিল দেয়াল ঘেঁষে। হরপার্বতীর ছবিটাও ঠিক তেমনি আঁটা আছে দেয়ালে। শুধু একটু ময়লা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। ছবিটা এঁটেছিল অঞ্জলি।

গতবারে কেদার বদরী থেকে কলকাতা ফেরার পথে ঋষিকেশে এই আশ্রমেই ছিলাম কয়েকদিন। আশ্রমের সাধুবাবা দেশের লোক। তাছাড়া জায়গাটাও নির্জন। বেশ শান্তিতে থাকা যায়। স্থায়ী বাসিন্দা বলতে সাধুমা সাধুদি অঞ্জলি ও তার মা। ঋষিকেশ সাধুবাবার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। কিছুদিন আগেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ফিরেছেন। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে প্রস্তরময় হৃষিকেশের চেয়ে শীত অনেক কম।

সেদিন সকালে দেখি অঞ্জলি সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোকে না আজ আশীর্বাদ করতে আসবে? বাঙালীর মেয়ে হয়ে আজকের দিনে শাড়ি পরিস নি কেন?"

"আমার যে শাড়ি নেই, দাদা।"

কেউ বলে না দিলেও অঞ্জলি আমাকে দাদা বলে ডাকত। ক'দিনেরই বা পরিচয়। কেদার-বদরী যাবার পথে চারদিন থেকে গেছি। ফেরার পথে সেদিন নিয়ে দিন সাতেকের দেখাশোনা। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে প্রায় মাসাধিককাল ঘুরে বেড়িয়ে দেহ আর মনের শ্রান্তি দূর করতে ঋষিকেশে বিশ্রাম করছিলাম। বড়ই মধুর লেগেছিল সম্পর্কহীনা কিশোরীর 'দাদা' সম্বোধনটুকু।

কোন কথা না বলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। দোকান থেকে একটা জামা ও একখানা রঙিন শাড়ি কিনে এনে অঞ্জলির হাতে দিয়ে বলেছিলাম, "এগুলো পরে চট্ করে একবার সামনে আয় তো। দেখি, ছড়িদার তোকে পছন্দ করে ঠিক করেছে কিনা?"

অঞ্জলির বাবা বঙ্গবিভাগের সময় অপঘাতে মৃত্যুর ভয়ে শিশুকন্যা ও স্ত্রীর হাত ধরে ঋষিকেশে এসে বাসা বাঁধেন। হাতের সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে যাবার আগেই স্থানীয় বাস সিণ্ডিকেটে একটা চাকরি যোগাড় করেন। চার বছর বেশ সুখেই ছিলেন অঞ্জলির মা। বাঙালী মন্দিরের কাছে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে

সংসার পেতেছিলেন। কিন্তু কপালে তাঁর এই সুখ সইল না। বাস দুর্ঘটনায় মারা গেলেন অঞ্জলির বাবা।

ভিটে ছেড়ে এতদূরে পালিয়ে এসেও ভদ্রলোক অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন না। তখন অঞ্জলি দশ-এগারো বছরের। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে কোনরকমে টিকে ছিলেন অঞ্জলির মা। এই আশ্রমে সাধুবাবা একখানা ছোট ঘর দিয়েছিলেন তাঁকে। ভাড়ার বিনিময়ে দু বেলা বাসন মাজতেন, জল তুলতেন, আশ্রম ঝাঁট দিয়ে সাধুবাবার নিরামিষ রান্নার মসলা পিষে দিতেন। আমিষের প্রতি অরুচি না হলেও ঋষিকেশে বসে সাধুবাবার নিরামিষাশী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাছ-মাংস খাওয়া ঋষিকেশে বেআইনী।

আমার দেওয়া সেই শাড়িখানাতেই ছিল হরপার্বতীর ছবিটা। পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে যাবার পর অঞ্জলি ছবিটাকে দেয়ালে এঁটেছিল। বলেছিল, "রোজ সকালে হরপার্বতীকে নমস্কার করে বিছানা ছাড়বেন। দিন ভাল যাবে।"

হায়রে অবুঝ মেয়ে। ভুলে গিয়েছিল আমি পথিক। তারপর আর মাত্র চারদিন এখানে ছিলাম। সে ক'দিন কী সেবা-যত্নই না করেছিল মেয়েটা।

ফিরে যাবার দিন সাধুবাবার সঙ্গে আমাকে বিদায় দিতে অঞ্জলিও স্টেশনে গিয়েছিল। বহুবার বলেছে সেই কথা, "কি এমন ক্ষতি হত আর আটটা দিন থেকে গেলে?"

অষ্টম দিনে ওর বিয়ে। তবুও ফিরে যেতে হয়েছিল ওর বিয়ে না দেখে। বোনের চেয়ে 'বস্' বড়।

সাধুবাবার কাছে শুনেছি বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে অঞ্জলির। ছেলেটি দেখতে সুন্দর। স্থানীয় অধিবাসী। ঋষিকেশেই একটা মন্দিরে ছড়িদারের কাজ করে। সচ্ছল অবস্থা। ওদের সমাজে বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করতে পারা ভাগ্যের কথা। অঞ্জলি সুখেই আছে।

আগামী কাল রওনা হতে চাই। পৌঁছতে হবে আর্যাবর্তের প্রাণধারা গঙ্গার উৎস গোমুখীতে। হাতে পঁয়তাল্লিশ দিন সময়। অঞ্জলিরা মনকে ভারী করে তুলতে পারে কিন্তু পা দুখানাকে হালকা রাখতে হবে। ভারী মনেও আমরা পথ চলতে পারব। পুণ্যসঞ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য নয়। চক্ষুকর্ণের তৃপ্তির জন্য আমরা এই অজানা পথে পা বাড়িয়েছি। সাধু আমরা নই। হতেও চাই না। তবু মেরিন ড্রাইভের চেয়ে ভাল লাগে হর-কী-প্যারী। তাজের চেয়ে ভাল লেগেছে কেদারনাথ। আমরা চলেছি রাওয়াই-এর আকর্ষণে। চলেছি গঙ্গা-যমুনার উৎস দর্শনে।

রঞ্জন সেই যে সাধুবাবার ঘরে ঢুকেছে আর এ মুখো হচ্ছে না। যথাসম্ভব নিজেই ঘরটা পরিষ্কার করে ফেললাম। বহুদিনের ধুলো জমে ছিল। গতবারে এ কাজটা অঞ্জলিই করে দিত। অঞ্জলির মাকেও দেখছি না। এ ঘরটা আশ্রমের অতিথিশালা। এ বছরে বোধ করি আমরাই প্রথম।

বেরুবার মুখে সাধুবাবার ঘরে এসে দেখি তিনি গীতা ব্যাখ্যা করছেন। রঞ্জন ভক্তিভরে শুনছে। নীরবে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। প্রস্তরময় অসমতল অপ্রশস্ত পথের ধারে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকা লাইট-পোস্টের মাথায় মাথায় আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। বাঁদিকের জঙ্গলটার কোন চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। বাস্তুহারারা সরকারী সাহায্য ছাড়াই এখানে গড়ে তুলেছে একটা বিরাট উপনিবেশ। নিজের হাতে পাথর ভেঙেছে, জঙ্গল কেটেছে, ঘর-বাড়ি আর পথ তৈরি করেছে। লড়াই করতে হয়েছে বাঘের সঙ্গে, সাপের সঙ্গে। এখনও এখানে মাঝে মাঝে বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা যায়। গরু ছাগল বা সুবিধা পেলে মানুষও মেরে নিয়ে যায়। অবশ্য সব সময় যে নিয়ে যেতে পারে তা নয়। অনেক সময় বাঘও প্রাণ দিয়ে যায়।

সন্ধ্যার সান্নিধ্যে উপনিবেশটি মুখর হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা খাওয়া ভুলে খেলায় মেতেছিল। এবারে ঘরে ফিরে মেয়েদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। কাজের শেষে পুরুষরা ঘরে ফিরে এসেছে; সারাদিন রানী-পোখরীতে ওরা পুল তৈরির কাজ করেছে, মোট বয়েছে, ফেরি করেছে কিংবা বাস চালিয়েছে। পরাধীন ভারতে ওদের জোত-জমা ঘর-বাড়ি দোকান-পসার সবই ছিল। স্বাধীনতা ওদের সর্বহারা করেছে। তবু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ওরা আবার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। চাষী হাল ছেড়ে হাতুড়ি ধরেছে। শিক্ষক নিয়েছেন দরজীর কাজ। গতবারে এদের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দেখছি ভাগ্যবিবর্তনের জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই ওদের। রত্নপ্রসবা পাঞ্জাব।

উদ্বাস্তু উপনিবেশের উল্টো দিকটার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। তেমনি ঘন শালবন রয়েছে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যেই শাস্ত্রীজী বাড়ি করেছিলেন। প্রকাণ্ড পাষাণ-পুরী। অন্ধকারে অশরীরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। গভীর রাতে দেয়ালে কান পাতলে আজও নাকি ওখানে নারীকণ্ঠের আর্তচীৎকার শোনা যায়। সকল প্রিয়জনের অলক্ষ্যে যারা এই পাষাণকারায় আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের ভয়ার্ত আত্মা আলোর জন্য, প্রাণের জন্য, নারীত্বের জন্য মানুষের কাছে সাহায্য চাইবে—এ তো স্বাভাবিক। নিঝুম নিশীথে দূর গাঁয়ের যে সব সুন্দরীদের ভুলিয়ে,

অর্থের লোভে অথবা ডাকাতি করে, এই পুরীতে আনা হত, তারা নগ্ন পাথরের ঐ প্রবেশদ্বারে পৃথিবীর মুক্তবায়ুতে শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে একবার আকুল নয়নে ওপরের দিকে চাইত। ভগবানের উদ্দেশ্যে নয়। ভগবানকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে তারা তখন ভগবানে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সীমাহীন কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তারা তাকাত পাহাড়ের ওপরে আলোর মালায় শোভিত নরেন্দ্রনগরের দিকে। ঋষিকেশ যখন আঁধারে ঢাকা, নরেন্দ্রনগর তখন আলোয় ছাওয়া। তাই বলে নরেন্দ্রনগর সেই হতভাগিনীদের জীবনের আঁধার ঘোচাতে আলো দান করে নি। ওপরের সে আলো নীচে নেমে আসে নি।

আমাকে দেখে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে অঞ্জলি আমার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে চায়। দু হাতে ধরে ফেলি ওকে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে। পরনের শাড়ি, গায়ের গয়না আর মুখের হাসি দেখে বুঝলাম সুখেই আছে। রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করতে থাকে, "কবে এলেন? চেহারা খারাপ হয়েছে কেন? এবার নিশ্চয় অনেকদিন থাকবেন।"

উত্তর দিতে একটু দেরি হয় আমার।

আবার বলে ওঠে অঞ্জলি, "ওঃ, কি মজাই হবে! আপনাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যাব। ইস—রামনগরের সরকারী মেলার সময় যদি আসতেন। কত জিনিস—ওড়না শাড়ি চুড়ি চিরুনি পাথরের মালা—আপনি থাকলে অনেক কিনে নিয়ে যেতেন। কলকাতায় এমন মেলা বসে না।"

ও সেই মার্চ মাসের মেলার কথা বলছে। জানে না যে এপ্রিলের আগে কেউ এদেশে বেড়াতে আসে না।

আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই অঞ্জলি জানায়, "কাল বিকেলে আশ্রমে গিয়ে আপনাকে আমি বীরভদ্রেশ্বরের দিকে বেড়াতে নিয়ে যাব। দেখবেন ঋষিকেশ কত বড় হয়ে গেছে।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। অপরাধীর কণ্ঠে বললাম, "আমি যে কালই চলে যাচ্ছি ভাই।"

রুদ্ধকণ্ঠে অঞ্জলি প্রশ্ন করে, "কোথায় যাবেন?"

"ধরাসু।"

"কেন?"

"গোমুখী যাব।"

"গোমুখী।" বিশ্বাস করতে চায় না অঞ্জলি। একটু চুপ করে থেকে বলে,

"ধ্যেৎ, আপনি বাজে কথা বলছেন। গোমুখী যাবেন কেন? সেখানে গেলে যে মানুষ আর ফিরে আসে না।"

হেসে ফেলতে হল আমাকে। বললাম, "কে তোকে বলেছে এ কথা?"

আমার কণ্ঠস্বর বোধ হয় অঞ্জলিকে আশ্বস্ত করে তোলে। বলে, "কি? ভেবেছিলেন খুব ভয় পাইয়ে দেবেন, না? দেখলেন, ঠিক ধরে ফেলেছি।"

অবুঝ মেয়েটাকে বিচলিত করে তুলব কিনা ভাবতে একটু সময় লাগে। তারপর বলি, "না, অঞ্জলি, সত্যিই আমি গোমুখী রওনা হচ্ছি।"

"তবে এখানে এলেন কেন? কি দরকার ছিল আমার সঙ্গে দেখা করার?"

আর কিছু বলতে পারে না ও। আমিও কি বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। অস্বস্তিকর ভাবে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়। তার পরে দ্রুতপদে অঞ্জলি পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলির মা ও ছড়িদার এসে হাজির। বুঝলাম, মা মেয়ের সংসারেই আছেন। জামাই অর্জুনপ্রসাদ পিতৃমাতৃহীন। আপন বুদ্ধিবলে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যোগাড় করেছে। ঋষিকেশের ছড়িদার সমাজে জুনিয়র হলেও তার সম্মান ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। অভাব ছিল স্নেহ-ভালবাসার। আজ তার সে অভাবও মিটেছে।

ব্যস্তভাবে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, "বহিন রাগিয়েছে কেন?"

অঞ্জলি স্বামীকে বাংলা শেখাচ্ছে এ খবরটা শুনেছিলাম। পালটা প্রশ্ন করি, "বুঝলে কেমন করে?"

"কানুটে কানুটে চলিয়ে গেলো।" উত্তর দেয় অর্জুন। গাণ্ডীব-টংকারে নয়। একালের অর্জুনের হাতে ছড়ি। কথার তালে তালে ছড়িটা নাচায়।

জবাব দিলাম, "গোমুখী যাচ্ছি বলে। অঞ্জলির ধারণা গোমুখী গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না।"

"ফিরে আসবে না কেনে? সাধুরা আসে কেউ কেউ। লেকিন আপনি যাবেন না। কেদার-বদরী ঘুরিয়ে আসুন। বহুৎ পুন্ হোবে। গোমুখী মৎ যাইয়ে।"

"কেদার বদরী আমি গত বছর ঘুরে এসেছি। এবার ফিরে এসে প্রমাণ করব গোমুখী সাধুদের একচেটে নয়। অসাধুরাও গোমুখী দর্শন করতে পারে। তুমি অঞ্জলিকে ডেকে নিয়ে এস। সময় কম। আমাকে টুরিস্ট-অফিসে যেতে হবে।"

অঞ্জলি এল। কালো একখানা মুখ নিয়ে থালা হাতে সামনে এসে দাঁড়াল সে। থালায় কিছু ফল ও মিষ্টি। লক্ষ্মী ছেলের মত সব খেয়ে নিয়ে ওর একখানা

হাত ধরে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করি, "কি রে রাগ পড়েছে?"

"রাগ করে যেখানে কোন ফল হবে না, সেখানে রাগ করে লাভ কি?"

"তোকে কে বলল, গোমুখী গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না?"

"বলবে কে আবার? প্রতি বছরই তো ও রাস্তায় লোক মারা যায়। গোমুখী কেন, গঙ্গোত্রী এমন কি ধরাসুর পথেও তো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। এই তো সেদিন পাহাড় ধসে যাত্রীবোঝাই একটা বাস চুরমার হয়ে গেল।" একটু থামে অঞ্জলি। তারপর অনুরোধ করে, "আমি বলছিলাম নাই বা গেলেন গোমুখী। আশা করে এসেছেন, নিষেধ করব না। গঙ্গোত্রী থেকে ঘুরে আসুন। কি হবে গোমুখী গিয়ে? এত কষ্ট নাই-বা করলেন।"

কষ্টের প্রতি আকর্ষণ আমাদেরও নেই। কিন্তু কৌতূহল মেটাতে হলে কষ্ট পেতেই হবে। প্রকৃতির ঐশ্বর্য আহরণ করতে চাইলে প্রকৃতিকে মূল্য দিতে হয়। আমরা সে মূল্য দিতে প্রস্তুত শুনে টুরিস্ট-অফিসার খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পরে বললেন, "বেশ আপনারা যখন যাবেনই, তখন বলতে আমার আপত্তি নেই যে গোমুখী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। গঙ্গোত্রীর পরে আর কোন সহযাত্রী পাবেন বলে মনে হয় না। আপনারা যদি সত্যই গোমুখী দেখে আসেন, তা হলে এ বছরের পথের অবস্থাটা জানা যাবে।"

টুরিস্ট-অফিসার জাতিতে ক্ষত্রিয়। অযোধ্যার লোক। বয়সে নবীন। দেরাদুন থেকে বছর তিনেক আগে বি. এ. পাস করেছেন। তরুণী স্ত্রী দেরাদুনে বাবার কাছে থেকে আই. এ. পড়ছে। মেয়েটির সঙ্গে গত বছর পরিচয় হয়েছিল। আমাকে ভাইজান বলে ডাকত। দেরাদুনে আছে জানলে দেখা করে আসতে পারতাম। এখানে আসার পথে আমরা দেরাদুনে নেবেছিলাম।

আমরা দেরাদুন হয়ে এসেছি শুনে টুরিস্ট-অফিসার খুবই দুঃখ করলেন। বর্ণনা করার চেষ্টা করলেন, আমাদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর স্ত্রী কি রকম খুশি হতেন। তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। বুঝলাম তাঁর স্ত্রীর প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা না করলে অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই শুরু করি, "বহিনের পরীক্ষার আর কত দেরি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস সামলে নিয়ে জবাব দেন, "এখনও প্রায় আট-ন মাস।"

সত্যই সুদীর্ঘকাল। বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই যান মাঝে মাঝে?"

"না।" এবারে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস সামলাতে পারেন না, "কোথায় আর যেতে পারি। সিজন-টাইম চলছে। স্টেশন লিভ্ করা সম্ভব নয়। যাত্রীরা যে দুটো

দিন আসা বন্ধ করবে, তাও নয়।"

বাস্তবিকই তো। সংসারে ভ্রমণের কি-ই বা প্রয়োজন? তীর্থে এসে কে করে বাস্তব জীবনে লাভবান হয়েছে? তীর্থযাত্রা একটা বিলাস। অল্প লোকের মানসিক আনন্দের খোরাক। টুরিস্ট-অফিসারের দাম্পত্য-জীবনে মিলনের মূল্য অনেক বেশী। অথচ এই তীর্থযাত্রীদের জন্য বিরহের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে তাকে ঋষিকেশে বসে থাকতে হচ্ছে।

"বহিন তো ছুটিছাটাতে বা শনি রবিবারেও এখানে বেড়িয়ে যেতে পারে।"

"হুঁ। আমার শ্বশুরমশায়কে তো জানেন না। ভদ্রলোক সমস্ত জীবন অধ্যাপনা করে লেখাপড়া ছাড়া যে সংসারে আর কিছু আছে, তা ভুলে গেছেন। আচ্ছা, আপনারাও তো পড়াশুনা করেছেন। সপ্তাহে একটা দিন না পড়লে কী এমন ক্ষতি হয়?"

সহানুভূতি একবার যখন দেখিয়েছি, তখন উপায় নেই অন্য কোন। বললাম, "কিছু না। আমরা সপ্তাহে একদিনও পড়ি নি, নেহাত পরীক্ষার আগে ছাড়া। আর আপনার এখানে এলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে কেন? আপনিও তো একটু-আধটু দেখিয়ে দিতে পারেন।"

"আরে রাম রাম। তা জানেন না বুঝি? আপনার বহিনের ধারণা, আমি পাস করলেও লেখাপড়া কিছু শিখি নি। গত মার্চ মাসে আমি যখন দেরাদুন গিয়েছিলাম, একদিন কথায় কথায় ওকে বই নিয়ে আসতে বললাম। ও তো হেসেই খুন। হাসি থামলে জিজ্ঞেস করি, 'হাসছ কেন?' জবাব দিল, 'তুমি পড়ালে আমার কি গতি হবে তাই ভেবে।' দেখুন দেখি কি অন্যায়?"

"বটেই তো। আচ্ছা ফেরার পথেও আমি দেরাদুন হয়ে যাব। বহিনের সঙ্গে দেখা করে যাতে অন্ততঃ মাসে দুটো উইক্-এণ্ড্ এখানে এসে কাটিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করব।"

"করবেন?" ছেলেটির চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়তে চায়।

"নিশ্চয়ই। আপনি এখানে একা একা থাকেন। ও যদি মাঝে মাঝে এসে আপনার ঘরটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে না যায়, তা হলে কেমন করে আপনার চলে? আচ্ছা, আজ তা হলে আসি। নমস্তে।"

বেরিয়ে এলাম পথে। বিচিত্র এই সংসার। ঘর ছেড়ে ন'শ উনত্রিশ মাইল ছুটে এসেছি পথের আকর্ষণে। অথচ পথের ধারে যাদের বাস, ঘরের জন্য তাদের কী অন্তহীন আকুলতা!

॥ দুই ॥

যাত্রার দিন পেছুতে হল। কাল রাত থেকে রঞ্জনের জ্বর। বাস অফিসে টিকিট দুটো ফেরত দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। একটু গিয়েই ডান হাতের বড় রাস্তা ধরি। সমতল ও মসৃণ এই পথটি প্রাচীন ঋষিকেশের সঙ্গে আধুনিক দেরাদুনের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে যে অনেকদূর এসে পড়েছি খেয়ালই করি নি। তাকিয়ে দেখি হাসপাতালে পৌঁছে গেছি। ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে। 'ডাগদার মিট্টরা' নামে আমাদের মিত্তির মশাই। যশোরের লোক। তিনকুলে কেউ আছে বলে জানি না। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু মিলিটারী ডিসিপ্লিন রপ্ত করতে পারেন না। রাওয়ালপিণ্ডিতে বসে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তাই বলে ঘরের ছেলে আর ঘরেও ফিরে আসেন না। চার বছর পাঞ্জাবে থেকে পাঞ্জাবকে ভালবেসে ফেলেছিলেন তিনি। স্টেশনের কাছেই ছোট একটা ঘর নিয়ে দাওয়াখানা খুললেন। শুরু করলেন প্র্যাকটিস্। খুব একটা পসার না হলেও বেশ ছিলেন। ধর্মনির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণের সেবা করে যাচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে। কেউ পারিশ্রমিক দিত, কেউ বা তখনকার মত বাকি রাখবার অনুরোধ করত। তাদের অনেকেই আরোগ্যলাভের পরে, আবার অসুস্থ হবার আগে দাওয়াখানার চৌকাঠ মাড়াত না। তবু ডাক্তারের কোন অভিযোগ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন গরীব বলেই ওরা এরকম করে। অভাবের জন্যই ঠকাতে চায়। আসলে ওরা তাকে ভালবাসে।

অথচ এই ভালবাসার সত্যিকার রূপ দেখে সেদিন রাত্রে ডাক্তারকে শিউরে উঠতে হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে দিনের পর দিন যাদের সেবা করে এসেছেন, মনুষ্যত্বের তাগিদে তারাই সেদিন রাত্রে তাঁর দাওয়াখানা লুট করেছিল। ছোরা হাতে সামনের দরজা ভেঙে তাঁর ঘরে ঢুকেছিল কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে। খালি গায়ে, খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কেমন করে গুরুদ্বার পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন, তা আজও তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারেন না।

তার পর বাস্তুহারাদের প্রবাহে মিশে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দিল্লী। দিল্লী থেকে ঋষিকেশ। ঋষিকেশের বাঙালী সমাজ আনন্দের সঙ্গে আপন জন বলে বরণ করে নিল তাঁকে। চাঁদা তুলে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি কিনে দিল। ছত্রের ডাল-রুটি খেয়ে নির্বিকারচিত্তে প্র্যাকটিস্ শুরু করলেন মিত্তিমশাই। উদ্বাস্তু উপনিবেশের নির্মাতাদের তিনি হলেন পরম সহায়।

এক বছরের মধ্যেই ঋষিকেশের উদ্বাস্তুরা 'ডাগ্‌দার মিট্টরা'কে তাদের

ভালমন্দের অংশীদার বলে গ্রহণ করে নিল। তাদের অনুরোধেই এই হাসপাতালে চাকরি নিয়েছেন তিনি।

ছোট হাসপাতাল। কর্মচারীদের কোয়ার্টার হাসপাতালের পেছনে। ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের সামনে এসে দরজায় কড়া নাড়লাম। একটি পাহাড়ী মেয়ে দরজা খুলে দিল। ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করতে জবাব দিল, "ওষুধ আনতে দেরাদুন গেছেন, কাল ফিরবেন।"

ডাক্তারের স্ত্রীকে ডেকে দিতে বলায়, মেয়েটি আমাকে বসতে বলে ভেতরে গেল।

একটু বাদেই ডাক্তারের স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকল। ভাঙা-ভাঙা বাংলায় জানাল, আমাকে তার বেশ মনে আছে।

চেহারা দেখে পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ হলেও, পোশাকে বাঙালী বলেই মনে হয়। মনে পড়ল, এর সৌন্দর্যের মূল্য দিতে ডাক্তারকে কি অসহ্য কুৎসার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে দিনের পর দিন।

পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার পথেই বীণা ও তার মা'র সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় হয়। বীণার মা তাঁর হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। সজল চোখে তিনি যখন বলেছিলেন—গভীর রাতে কিভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরা, স্ত্রী আর কন্যাকে সেই জেহাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কেমন করে প্রাণ দিয়েছিলেন বীণার বাবা, তখন ডাক্তার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের দেখাশোনা করবার।

সে প্রতিশ্রুতি ডাক্তার পালন করেছেন। অসহায়া মা ও মেয়েকে তিনি রক্ষা করেছেন। শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, বাহুবলেরও প্রয়োগ করতে হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে।

ঋষিকেশে এসে ছত্রে ঠাঁই পেয়েছিলেন ওঁরা। ছত্রে সবাই সিধা পায় রোজ, কিন্তু তে-রাতের বেশী থাকতে পায় না কেউ। ডাক্তার তাই বীণার মাকে ছত্রে একটা কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন, যাতে ওঁরা স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন সেখানে।

প্রথম দিকে বীণার মা এই কায়িক পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। অসুখ হয়ে পড়ল তাঁর। খবর পেয়ে ডাক্তার ছুটে এলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। ক্ষিদের জ্বালায় আগের রাতে জ্বর নিয়েই ডালরুটি খেয়েছিলেন। হজম করতে পারেন নি। বমি হয়ে গেছে সব। দুর্গন্ধে ভরে গেছে সারা ঘর। পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে বীণা। যা কোনদিন করে নি, ডাক্তারকে দেখে তাই

করে ফেলল সে। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—"আপনি আমার মাকে ভাল করে দিন। আমার যে আর কেউ নেই।"

লাজুক মেয়েটির মুখে কথা ফোটাতে চেষ্টা করে বহুবার বিফল হয়েছেন ডাক্তার। স্বামীর কথা বলতে বলতে ওর মা'র চোখ দুটো যখন বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসত, তখনও কোনদিন বীণাকে কাঁদতে দেখেন নি ডাক্তার। বীণা তখন তাকিয়ে থাকত তার মা'র সজল চোখ দুটির দিকে। তাকিয়ে থাকত দূর আকাশের বুকে।

সান্ত্বনা দেন ডাক্তার, "ভাল হয়ে যাবেন তোমার মা। চিন্তা ক'রো না তুমি।"

আশ্বস্ত হয়েছিল বীণা। ডাক্তারের পরামর্শে সারারাত মা'র মাথার কাছে বসেছিল সে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে উঠলেন মা। কিন্তু ডাক্তারের নিয়মিত যাতায়াত বন্ধ হল না। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের সামনে পড়ে থাকা খাটিয়াটার ওপরে জাঁকিয়ে বসতেন তিনি। মা ছত্রের রান্নাঘরে কাজ ব্যস্ত। মেয়ে অনতিদূরে একখানা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপব বসে ডাক্তারকে গল্প শোনাত। বলত—সেদিন ছত্রে রুটি বিলোবার সময় দুজন সাধুর মধ্যে কি রকম মারামারি হয়ে গেছে। বলত—তার বাবা অফিস থেকে ফিরে সদর দরজার সামনে এসে সাইকেলের ঘণ্টা বাজালে, সে কি রকম ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত। বলত—ছোটবেলায় দুধ খাবে না তাল তুলে কেমন করে মা'র কাছ থেকে চুড়ির পয়সা আদায় করত।

গল্প করতে করতে রাত কখন প্রথম প্রহর পেরিয়ে যেত কারও খেয়াল থাকত না। কাজ শেষে মা ফিরে এলে লজ্জা পেত দুজনেই। ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলে উঠতেন, "আজ তা হলে চলি—"

ধমক দিয়ে বীণা বলত, "চলি বলতে নেই, আসি বলতে হয়।"

"যাবার সময় বলব আসি! না, এরকম মিথ্যে আমি বলতে পারব না।"

"অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। জানেন না বুঝি!"

সুযোগ পেয়ে বলে ফেলতেন ডাক্তার, "আমার চলে যাওয়াটা তোমার কাছে অপ্রিয় হল কবে থেকে?"

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত বীণা, "জানি না—যান!"

"জান ঠিকই। বলবে না।" একবার থামতেন ডাক্তার। তারপর আশ্বাস দিতেন, "বেশ, তুমি যদি খুশি হও, বলব না। কথা দিলাম।"

অবাক হত বীণা। সাহস পেত সে। অবলম্বন খুঁজে পাবার আনন্দে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু ডাক্তারের কথার কোন জবাব দিতে পারত না তখন।

সামনেও দাঁড়াতে চাইত না। অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকত। খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সদরের দিকে হাঁটতে শুরু করতেন ডাক্তার। কয়েক পা এগোতেই বাধা দিতেন বীণার মা, "অন্ধকারে যাবেন না, একটু দাঁড়ান।" থমকে দাঁড়াতেন তিনি। মা মেয়েকে লক্ষ্য করে বলতেন, "কুপিটা নিয়ে একটু বাইরে আয় তো। ওঁকে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আয়। বড্ড অন্ধকার।"

আলো হাতে বেরিয়ে আসত বীণা। ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। দেউড়িতে এসে থমকে দাঁড়াত দুজনে। এবারে বিদায় নিতে হবে। বীণার মুখের দিকে তাকাতেন ডাক্তার। মাথা নীচু করত সে। আস্তে আস্তে ডাক্তার বলতেন, "আসি তা হলে।"

মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাত বীণা। ডাক্তার চলতে শুরু করতেন।

"শুনুন—"

"কি?" ফিরে এসে জিজ্ঞেস করতেন ডাক্তার।

"অন্ধকার রাতে চলাফেরা করেন। একটা টর্চ কিনে নেবেন।"

"না। আমি আলোহীন বলেই তো তুমি আলো দেখাবার ভার নিয়েছ। আমি আলোময় হতে চাই না, তুমিই আমার জীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকো।"

ডাক্তার আমাকে বলেছেন, সে-রাতে দু চোখের পাতা এক করতে পারেন নি তিনি। একটা অসহ্য আনন্দে ছটফট করেছেন সারারাত। উদ্দেশ্যহীন জীবনে আনন্দের অভাব ছিল না। সে-সব আনন্দে তিনি হেসেছেন উচ্ছল হয়ে। আর এ আনন্দ তাকে যেন একটা অব্যক্ত ক্রন্দনের মাঝে টেনে নিয়ে গেছে প্রহরে প্রহরে। অথচ ঐ ক্রন্দনই তাকে দুলিয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের মধুর ছন্দে। ভুলিয়েছে গতজীবনের ছন্দহীনতাকে। বুঝতে পেরেছেন তাঁর মন হারিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। তবু তিনি সে-মনের হদিস পেতে চান নি।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকে নি বেশীদিন। বিশেষ করে ঋষিকেশের বাঙালী সমাজ এ নিয়ে গোল পাকাতে চেয়েছিল। অথচ ডাক্তারের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতেও সাহস পায় নি কেউ। সাধুদির সাহায্য চেয়েছিল ওরা। সাধুদির প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, "আমি বীণাকে ভালবাসি। আর আগামী বুধবার আমাদের বিয়ে।"

"সদ্বংশের শিক্ষিত বাঙালীর ছেলে হয়ে ঐ পিতৃপরিচয়হীনা পাঞ্জাবী

মেয়েটাকে বিয়ে করবে, একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?"

"না। বিবাহিত রাজা শান্তনুর ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিয়ে করার কথা যদি পুণ্যকাহিনী হতে পারে, তবে অবিবাহিত আমার পক্ষে বীণাকে বিয়ে করায় লজ্জার কি থাকতে পারে সাধুদি?"

"সত্যবতী ধীবর-কন্যা ছিলেন না। ধীবর-রাজ তাঁকে লালনপালন করেছিলেন মাত্র। সত্যবতী রাজা উপরিচরের কন্যা।"

"তা হলেও বীণার বাবার চেয়ে রাজা উপরিচর পিতৃত্বের মাপকাঠিতে বেশী মর্যাদা দাবি করতে পারেন না। স্বার্থ ও সম্মানের প্রয়োজনে রাজা উপরিচর বাৎসল্যকে করেছেন অস্বীকার, আর বীণার বাবা তাঁর মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে বিসর্জন দিয়েছেন নিজের প্রাণ।"

বীণার প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে এলাম, "কি ভাবছেন?"

"ডাক্তারের কথা।"

"সে চেষ্টা করবেন না। আমি চেষ্টা করে দেখছি। থই পাওয়া যায় না।"

"হঠাৎ ডাক্তার এরকম বিরাগভাজন হল? বেশী অনুরাগের ফল নয় তো?"

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বীণা। এবার একটা সোফার উপর বসে বলতে থাকে, "অনুরাগ বৈকি। সেধে সেধে অন্যের বোঝা বইতে গিয়ে ঘর-সংসার ফেলে বাইরে ঘুরে বেড়ানোকে অনুরাগ ছাড়া আর কি বলব?"

মনে মনে ভাবি, অন্যের বোঝা বওয়া স্বভাব না হলে, তুমিও আজ তার ঘরনী হতে পারতে না। মুখে বলি, "খুব অনিয়ম করেন বুঝি?"

"অনিয়ম? ওর স্বভাবে নিয়মের কোন বালাই নেই। আচ্ছা, আপনিই বলুন। শত হলেও তো মানুষের শরীর, এত তোমার সইবে কেন? হয় হাসপাতাল, নয় রোগীর বাড়ি। আর তা না হলে ওষুধ আনতে দেরাদুন। তোমার এমন কি মাথাব্যথা পড়েছে নিজে গিয়ে ওষুধ আনার? ভেজাল দেবে? দিক না। ভেজাল ওষুধের জন্য রোগী মারা গেলে তো আর তুমি দায়ী নও। ইধারে ভেজাল থাকায় অপারেশন-টেবিলে একজন রোগী মারা গেল। সেই থেকে কি খেয়াল চেপেছে প্রতিবার নিজে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে।"

কি জবাব দেব, এ প্রসঙ্গে ডাক্তারের বিরুদ্ধে যখন কিছু বলা সম্ভব নয় তখন বিদায় নেওয়াই উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "আজ তা হলে চলি। ডাক্তার ফিরে এলে দেখা করতে বলবেন।"

"সে কি! গুরুকুলের মসলা দিয়ে চা বানাতে বলেছি। একটু বসুন।"

ভেতরে চলে গেল বীণা। আবার সোফায় পা এলিয়ে দিলাম।

ঝকঝকে বসার ঘরটি। ঠাকুর দেবতা ও মহাপুরুষ থেকে শুরু করে ওদের দুজনের একসঙ্গে তোলা কয়েকখানা ছবি ঝুলছে দেয়ালে। সিঁড়ির ধারে হাসনাহানার ঝোপটা দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোয় ওরা গন্ধহীন। সূর্যের সঙ্গে ওদের আড়ি। তবুও সূর্যের আলো আর তেজে বেড়ে উঠেছে ওরা। ডাক্তারের বিরুদ্ধে সীমাহীন অভিযোগ বীণার। তবুও ডাক্তারই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ডাক্তারকে কেন্দ্র করেই বীণার নারীত্ব হয়েছে বিকশিত।

একটা প্লেটে কয়েকখানা পাঁপরভাজা ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বীণা। সেণ্টার টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করল, "এবারে কোথায় যাচ্ছেন ?"

"গোমুখী।" ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম। বিশ্বাস নেই, হয়তো মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে বসবে।

"সাবধানে যাবেন। শুনেছি ভয়ানক বিপজ্জনক রাস্তা। প্রতি বছরই লোক মারা যায় ওপথে।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আরও দু-একটা কথার পর চায়ে শেষ চমক দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

নমস্কার করে বাইরে এসে দেখি – প্রখর রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। অনেকটা বীণার সদা-হাস্যময়ী মুখখানার মত।

॥ তিন ॥

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে, বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। রঞ্জনের জ্বর কমেছে। কিন্তু ছেড়ে যায় নি। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি লছমনঝুলার দিকে।

মোড়ের মাথায় এসে ঝরনার দিকে তাকাই। ঋষিকেশে যখন কলের জল হয় নি, ঐ ঝরনাই জনসাধারণের জীবন রক্ষা করত। এখন রাস্তার ধারে ধারে জলের কল। তবুও দেখছি দুপুরের এই দুঃসহ উত্তাপকে উপেক্ষা করে বহুলোক ঝরনার মিঠে জলে তৃষ্ণা মেটাতে ওখানে জড়ো হয়েছে। যন্ত্রশক্তি প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত পরাজিত করছে, তবু মানুষ প্রকৃতিকে ভুলে যেতে পারে নি।

কিছু দূর এগিয়েই চন্দ্রভাগা। নদী হলেও জল নেই। পাথর। শুনেছি বর্ষার ঢল নামলে এ নদী ভয়ঙ্করী হয়ে উঠে। নদীর ওপর কংক্রিটের পুল। পুল পেরিয়ে কিছুদূর হেঁটে মুনি-কি-রেতী। কোন কালে হয়তো শুধু মুনিরাই বাস করতেন। আজকাল মুনি নেই, আছেন সাধু। তাও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

পথে কৈলাস আশ্রম ও শত্রুঘ্ন মন্দির। আকারে বড় না হলেও শত্রুঘ্ন মন্দির বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত। পথের ধারে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে, রামায়ণের এই অতি-উপেক্ষিত চরিত্রটির কথা পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কৈলাস আশ্রমও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঁদিকে পাহাড়ের ওপর আশ্রমটি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে আশ্রমে উঠতে হয়।

এর পর সংকীর্ণ সমতল পথে এগিয়ে শিবানন্দ আশ্রম। তার পর আরেকটা নির্জন ঝক্‌ঝকে উঁচু-নিচু পথ ডিঙিয়ে লছমনঝুলা। এক দিকে পাহাড়। আরেক দিক ঢালু হয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশছে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে লাইটপোস্ট। বানরের অবাধ আধিপত্য। শুধু এখানে কেন, গোটা ঋষিকেশই শ্রীরামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর বংশধরদের পদানত। জনসাধারণ তাদের প্রভুত্বে সর্বদাই সশঙ্কিত।

লছমনঝুলার বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে চায়ের দোকানগুলোর কোন পরিবর্তন হয় নি। তেমনি চালাঘর রয়েছে এখনও। ওপরটা সমান করে চাঁচা সেই গাছের গুঁড়িগুলো খদ্দেরদের আসনের কাজ করছে। আজও ভেতরে ঢুকতে হলে মাথা বাঁচাতে নিচু হতে হয়। জীর্ণদেহে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। সৌন্দর্যের জন্যে নেই কোন আপসোস। প্রয়োজনে অপরিহার্য। বাস থেকে নেমে মাইল দুই হাঁটতে হয় সবাইকে। রওনা হবার মুখে শক্তি সঞ্চয় করতে বসতে হয় এসব দোকানে। চা ও দুধই প্রধান আকর্ষণ। তবে লাড্ডু আর দেশী বিস্কুটও পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় চীনবাদাম। নিজেদের খাবার জন্য নয়। বানরপ্রধান এ অঞ্চলে চীনাবাদাম না কিনে উপায় নেই।

চা মানে, চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁ বা মেচেদা স্টেশনের চা নয়। সকালে ছাঁকনিতে রাখা সস্তা চা-পাতার ওপর গরম জল ঢেলে, তার সঙ্গে পোয়াটাক খাঁটি ভয়সা দুধ আর ছটাকখানেক চিনি মিশিয়ে, আধসেরি কাচের গ্লাসে উপচে পড়া এক প্রকার রঙীন জলীয় পদার্থ।

বৈচিত্র্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চায়ের দিক থেকে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে এদেশে। বর্ধমান কিংবা বেজোয়াদা, দক্ষিণেশ্বর অথবা দ্বারকা সর্বত্রই সেই স্বাদগন্ধহীন উষ্ণ রঙীন পদার্থ চা নামে অভিহিত হচ্ছে।

ঋষিকেশের চা কিন্তু নিজ গুণে মহীয়ান। গন্ধহীন হলেও স্বাদহীন নয়। অনেকটা শরবতের মত। ওর একটা গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে আমার। আমি ঐ পাহাড়ে গিয়েছিলাম। আবার ঐ পাহাড়ে যাব। ওর আমন্ত্রণ আমি শুনতে পাই প্রতিনিয়ত। সে আমন্ত্রণে দিয়েছি সাড়া। পথকষ্টের কথা ভুলে, প্রিয়জনের বাধা ঠেলে, আমি আবার চলেছি

ওর বুকে। ও যে ওর হিমবাহরূপ হৃৎপিণ্ড গলিয়ে সৃষ্টি করেছে আমার এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির প্রাণপ্রবাহ গঙ্গা-যমুনাকে।

রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই কল্পনায় ছেদ পড়ে। কয়েকটি তরুণ তরুণী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দোকানের দিকে তাকাচ্ছে। একটু আগে হরিদ্বার থেকে যে বাসটা এল তাতেই এসেছে ওরা। গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য চায়ের প্রত্যাশী। অথচ এরকম চেহারার দোকানে ঢোকা উচিত কিনা সাব্যস্ত করতে পারছে না। চেহারা ও পোশাক দেখে বাঙালী বলেই সন্দেহ হচ্ছে। একটু বাদেই বুঝলাম আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। বাংলাতেই কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। দোকানদার আমন্ত্রণ জানাল। ওরা কিন্তু ইতস্ততঃ করছে এখনও। দোকানদারকে সাহায্য করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বাংলায় বললাম, "আসুন না। এ দোকানের চা খারাপ লাগবে না।"

বিস্মিত হল ওরা। বোধ করি পোশাক আর পরিবেশের জন্যে বাঙালী বলে বিশ্বাস করতে চাইল না আমাকে।

হেসে বললাম, "কি ভাবছেন ? আমি ভাল বাংলা বলতে পারি ? না, আমি বাঙালী।"

এবারে আর কোন আপত্তি করে না। তাড়াতাড়ি উঠে রুমাল দিয়ে একটা গুঁড়ি ঝেড়ে দিলাম। বসল ওরা। দোকানদারকে গাড়োয়ালীতে চারটা চা দিতে বলি।

এতক্ষণে মুখ খুলল একটি ছেলে, "আপনার গাড়োয়ালী শুনে তো বোঝাই যায় না, আপনি বাঙালী।"

একটু মুচকি হাসি হাসতে হল। ছেলেটি বলতে থাকে, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি। উঠেছি হরিদ্বারে ভোলাগিরির ধর্মশালায়। আজ সকালে ঋষিকেশ এসেছি। সন্ধ্যের আগেই লছমনঝুলা সেরে শিবানন্দ নগর থেকে বাস ধরে হরিদ্বারে যাব।"

"বেশ তো চলুন না। দেখিয়ে দিচ্ছি সব।"

একটানা খানিকক্ষণ নীচে নেমে লক্ষ্মণ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

"এ মন্দিরের নাম লক্ষ্মণ মন্দির হল কেন ?" প্রগল্‌ভা মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

"দীর্ঘ চোদ্দ বছর বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। রামচন্দ্রের অভিষেক হল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন লক্ষ্মণ। রাম বশিষ্ঠদেবকে লক্ষ্মণের আরোগ্যলাভের উপায় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানালেন, ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছে লক্ষ্মণের। লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলেন

এখানে এসে তপস্যা করে পাপমুক্ত হতে।"

কিছুই জিজ্ঞেস করতে না পেরে দ্বিতীয় মেয়েটি ছটফট করছিল। আমাকে থামতে দেখেই বলে ওঠে, "আচ্ছা এ মন্দিরের ঐ শিবলিঙ্গকে লক্ষ্মণেশ্বর-শিব বলে কেন, ওনাকে জিজ্ঞেস কর না চন্দ্রাদি।"

আমি কিছু বলার আগেই চন্দ্রা তাকে ধমক লাগায়, "ভদ্রলোককে একটু জিরুতে দে, মিনতি। নিঃশ্বাস ফেলার সময় অন্ততঃ পাক।"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মিনতির মুখখানা। মায়া হল আমার। বললাম, "নিঃশ্বাস ফেলতে মুখ বন্ধ করার দরকার হয় না আমার।"

আহত হয় চন্দ্রা। খুশি হল মিনতি। বলতে থাকি আমি, "স্কন্দ পুরাণে আছে—লক্ষ্মণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে কয়েক বছর জল বায়ু ও খাদ্য ছাড়া তপস্যা করলেন। তার পর এক শতাব্দী তপস্যা করলেন শুধু বায়ুর সাহায্যে। শেষ একশ বছর ফল-পাতা খেয়ে তপস্যা করলেন তিনি। অবশেষে শিব তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—বৎস, মুনি-ঋষিদের হত্যাকারী বহু রাক্ষসকে হত্যা করেছ তুমি। আজ হতে তুমি সকল পাপ ও রোগমুক্ত হলে। এখন থেকে লক্ষ্মণেশ্বর-শিব হয়ে এখানে চিরবিরাজ করব আমি। গঙ্গাস্নান করে যারা আমায় দর্শন করবে, তারাও হবে পাপমুক্ত। আর এস্থানের নামের সঙ্গে তোমার নামও হয়ে থাকবে অচ্ছেদ্য।"

চন্দ্রা ছাড়া আর সকলেই খুশি হয়ে উঠল আমার গল্প শুনে। কুণ্ডের দিকে তাকাতে তাকাতে গেট পেরিয়ে এল সে। এবারে আরও নীচে নামতে হবে। জীবনের পথ নয়। পাহাড়ের পথ। ওঠার চেয়ে নামা কঠিন।

অন্যমনস্কতার ফল পেতে দেরি হল না চন্দ্রার। আমি পেছন থেকে না ধরে ফেললে হয়তো একটা দুর্ঘটনাই ঘটত। তবু হাঁটুটা ছড়ে গেল।

এ জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। দূরে ধূসর পাহাড় প্রতি মুহূর্তে রং পালটাচ্ছে। সামনে শ্রান্তিহীনা গঙ্গা। এখানে সেখানে সবুজের ছড়াছড়ি। ঈশ্বর-অন্বেষণের আদর্শভূমি। বশিষ্ঠদেবের তপস্যাভূমি নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয়।

পাণ্ডাদের এড়িয়ে লছমনঝুলায় এসে উঠলাম। পাঁচজন একসঙ্গে ওঠায় সাড়ে চারশ ফিট লম্বা পুলটা একটু নড়ে উঠল। চন্দ্রা বলে ওঠে, "ছিঁড়ে পড়বে নাকি শেখরদা?"

"পড়লে ক্ষতি কি? গঙ্গাস্নান হবে। সাঁতার তো জানোই।" ভরসা দেয় শেখর।

মনে মনে হাসি। এই প্রস্তরময় খরস্রোতা নদীর মধ্যে পড়ে গেলে যে সাঁতার

জানা না-জানায় কোন তফাত থাকে না, সে ধারণা নেই শেখরের।

"সাঁতরাবার চেষ্টাই করব না। এখানে স্নান করলে যখন সমস্ত পাপ দূর হয়, ডুবে মরলে নিশ্চয়ই অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে।"

"ইস্, ডুবতে চাইলেই বা তোমাকে ডুবতে দেবে কে?"

কোন জবাব দেয় না চন্দ্রা। চকিতে একবার শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে চলতে থাকে।

"বাবা গো!"

চন্দ্রার চিৎকারে পিছন ফিরে তাকাতে হয়। দেখি লক্ষ্মণের অনুচরদের এক বংশধর ওর শাড়ি ধরে টানছে। প্রথমটা অন্য সবার মত শেখরও ভড়কে গেল। তার পর স্বস্থান থেকেই হুকুম করে, "এই হট্। যা ভাগ।" কিন্তু চন্দ্রার দিকে এগুতে চায় না। চন্দ্রা ততক্ষণে প্রাণপণ শক্তিতে তার বাদামী রংয়ের নাইলনের শাড়িখানা বানরের কবলমুক্ত করার চেষ্টা শুরু করেছে।

বাধা দিয়ে বললাম, "ওভাবে কোন লাভ হবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি ব্যবস্থা করছি।" দোকান থেকে বের হবার সময় যথারীতি দু'পয়সার চীনাবাদাম পকেটে করে নিয়ে এসেছি। কথায় কথায় ঝুলার মুখে খাজনা দিতে ভুলে গেছি ওদের। একমুঠো বাদাম নিয়ে বানরটার সামনে ধরতেই, চন্দ্রার শাড়ি ছেড়ে দিল সে। মানুষের মত আমার হাত থেকে বাদামগুলো তুলে নিয়ে সেখানে বসেই খেতে শুরু করল। ছাড়া পেয়ে ছুট দিতে চায় চন্দ্রা। সাবধান করি, "পায়ে লেগেছে একটু আগে। পড়ে যাবেন না যেন। তা ছাড়া ছোটবার দরকারও নেই কোন। ওর পাওনা পেয়ে গেছে। আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।"

"হ্যাঁ। ছোটবার কি আছে?" এতক্ষণে চন্দ্রাকে বুদ্ধি যোগায় শেখর। বীরোচিত ভঙ্গীতে বলে, "একটা বাঁদর বৈ ত নয়। কষে একখানা রদ্দা লাগালে বাছাধনকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।"

যার বিরুদ্ধে এত বীরত্ব সে কিন্তু নির্বিকার চিত্তে চীনাবাদাম চিবিয়ে চলেছে। শেখরের দূরত্ব তার থেকে নিদেনপক্ষে ফুট বিশেক।

॥ চার ॥

গণেশজী ও হনুমানজীর মন্দির দেখে এগিয়ে চলেছি। মন্দির দুটোর পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওদের। সবার আগে আমি। আমার পরে মিনতি ও তার বড়দা। পেছনে চন্দ্রা ও শেখর। বানর আক্রমণের পর থেকে আর আগে আগে

যাচ্ছে না চন্দ্রা। হয়তো বা পায়ের ব্যথাটাও পেছিয়ে পড়ার একটা কারণ।

এদিকটা বেশ নির্জন। পথচারীদের সংখ্যাও কম। অপ্রশস্ত পায়ে-চলা-পথটি চলে গেছে গঙ্গার সমান্তরাল হয়ে। সাঁকোর ওপর উঠে প্রশ্ন করে মিনতি, "এটা কি খাল নাকি?"

"খাল বলতে মানুষে তৈরি বোঝায়। সে বিচারে নয়। তবে আকৃতিগত মিল রয়েছে বৈকি। ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে নানা ঝরনার জল এই পথে গঙ্গায় গিয়ে মেশে।"

সাঁকো পেরিয়েই ছাইবাবার আশ্রম। আশ্রম মানে পাতায়-ছাওয়া একখানি কুঁড়ে। ছাই তো এখানে অনেক সাধুই মাখেন, তবু এঁরই নাম ছাইবাবা হল কেন, বলতে পারি না। কৌপীন পরে প্রকাণ্ড একটা চিমটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি। সঙ্গে থাকে একটা পাহাড়ী কুকুর। তাঁর একমাত্র পরিজন।

আশ্রমের বাইরে বসেছিলেন ছাইবাবা। দেখতে পেয়েই ডাক দিলেন। গতবার সাধুদির সঙ্গে এসেছিলাম দু'দিন। ঠিক মনে রেখেছেন দেখছি। ওদের একটু দাঁড়াতে বলে ছাইবাবার কাছে এগিয়ে গেলাম। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর দিলে প্রশ্ন করলেন, "ইয়ে লোগ কৌন হ্যায়?"

"কলকাতা থেকে এসেছেন। আমি ওঁদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি।"

"বুলাও বেটা উন্ সভোকো।"

এই নোংরার মধ্যে ওদের আনা ঠিক হবে কি না—একটু ইতস্ততঃ করলাম। শুনেছি সবাইকে ডাকেন না ছাইবাবা। যাদের ডাকেন তারা ভাগ্যবান!

আমার ডাকে এগিয়ে এল ওরা। সবাইকে ডিঙিয়ে আমার পাশে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চন্দ্রা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে ছাইবাবাকে। শেখর ও মিনতির বড়দা চন্দ্রার দু'পাশে এসে দাঁড়ায়। কুকুরটা ছুটে এসে সবাইকে একবার শুঁকে আবার যেন কোথায় চলে গেল। জটা বাঁধতে বাঁধতে উঠে দাঁড়ালেন ছাইবাবা। সবাইকে ভাল করে দেখে নিয়ে চন্দ্রার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কেয়া ঢুড়নে আই ইহাঁ পর?"

চন্দ্রা চট্ করে পারে না কোন জবাব দিতে। একবার শেখর ও একবার মিনতির বড়দার দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলে যে, সে এখানে কিছু খুঁজতে আসে নি, বেড়াতে এসেছে মাত্র।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ছাইবাবা। বিস্মিত হলাম তাঁর এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে। হাসি থামিয়ে বললেন, "বেটি পরমাত্মা এক হ্যায়। ধেয়ান্ এক পর্ রাখ্।"

ছাইবাবার আশ্রম ছেড়ে আবার এগিয়ে চলেছি। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চন্দ্রা আমাকে বলে, "এ সব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন কেন?"

"সম্পর্ক তো কিছু নেই আমার। আর চাইলেই বা উনি রাখতে দেবেন কেন? সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী উনি।"

"সন্ন্যাসী না হাতী।" অবজ্ঞার কণ্ঠে চন্দ্রা মতামত দেয়, "কোন ভাল সন্ন্যাসী ওরকম ছাই মেখে ভূত সেজে থাকে নাকি?"

আবহাওয়া বুঝে চুপ করে থাকি। চন্দ্রার কি দোষ? ও তো আর জানে না যে, ছাই হচ্ছে ভারতীয় Thermolactyl, যা দিয়ে ফ্রান্সে গেঞ্জি তৈরি হয়। শীতে দেহ গরম রেখে রক্তচলাচলে সাহায্য করে, আর গরমে ঘামতে দেয় না।

টিকারি মন্দিরের সামনে এসে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে ওরা। বোধ করি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও স্থানের মাহাত্ম্যে মেজাজ বেশীক্ষণ চড়ে থাকতে পারে না এখানে। শেখরের পাশ থেকে আমার কাছে পেছিয়ে আসে চন্দ্রা। মুগ্ধ কণ্ঠে বলে, "বাঃ। ভারি সুন্দর তো।"

"হ্যাঁ। হালে তৈরি কিনা। আপনাদের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি।"

"কে তৈরি করেছে?"

"টিকারি বলে এক ভূতপূর্ব করদ রাজ্যের রাজমাতা। এখন অবশ্য রাজারা আর সে রকম সাহায্য করতে পারেন না।"

"কেন?" প্রশ্ন করে মিনতি।

"সামর্থ্য নেই বলে। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্য গেছে। অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল তার আগেই। বর্তমান রাজা প্রায় মধ্যবিত্তের মত নিউ আলিপুরে ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। শুধু মন্দিরের নামে উৎসর্গীকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে কিছু সাহায্য আসে।"

"ভিড় দেখে তো মনে হচ্ছে ভক্তের সংখ্যা অনেক।" এতক্ষণে মুখ খুললেন মিনতির বড়দা। কিছুক্ষণ থেকেই তিনি চন্দ্রার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন।

"হ্যাঁ।" বলতে থাকি আমি, "তবে আগে এত ভিড় হত না। কয়েক বছর আগে একদিন সকালে দেখা গেল মন্দিরের মধ্য থেকে বিগ্রহের অলঙ্কার সব অদৃশ্য হয়েছে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। থানা পুলিস হল। কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। রাতে মন্দিরের পূজারী স্বপ্ন দেখলেন দেবতা তাঁকে বলছেন, 'চোর আমার গহনা নিয়ে সরে পড়তে পারে নি। মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে

রেখেছে।' দেবতা অদৃশ্য হবার পর ঘুম ভেঙে গেল পুজারীর। খোঁজাখুঁজি করে সমস্ত অলঙ্কার ফিরে পেলেন তিনি। সেদিন থেকে জাগ্রত বলে এ মন্দিরের দেবতার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। প্রতিদিন বহু লোক ভক্তি আর অর্ঘ দিয়ে এই জাগ্রত দেবতার করুণা প্রর্থনা করতে আসে।"

তপোবনে এসে পৌঁছলাম। যুগ যুগ ধরে সংখ্যাতীত সন্ন্যাসীর তপস্যাধন্য এই তপোবন। বিস্তীর্ণ আম্রকুঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথটি স্বর্গাশ্রম হয়ে গঙ্গায় ঘাটে গিয়ে মিশেছে। গঙ্গাতীরের বিভিন্ন আকৃতির কুঁড়েগুলোতে সন্ন্যাসীদের বাস। কোনটি পাথরের, কোনটি কাঠের, কোনটি বা লতাপাতা দিয়ে তৈরি। স্বর্গাশ্রমের কালিকমলীর ছত্রের ওপর নির্ভরশীল ওদের জীবন। তবু অশান্ত গঙ্গার তীরে শান্ত ঐ কুঁড়েগুলোতে শান্তি বিরাজ করে চিরকাল।

তপোবনের মধ্যে ধানক্ষেত দেখে আশ্চর্য হল ওরা। মিনতি জিজ্ঞেস করে, "এখানে ধান হয়?"

'শুধু হয় না—ভাল ধান হয়। তপোবনের চাল দেরাদুনের চালের চাইতেও ভাল।"

বহুক্ষণ হেঁটেছি। শ্রান্ত বোধ করছি। স্বর্গাশ্রমের কাছে শরবতের দোকানটা দেখে আনন্দ হল। আমাকে ফেলে এক রকম ছুটতে ছুটতে দোকানের সামনে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল ওরা। রাস্তায় পায়চারি করতে থাকি। পিপাসা পেয়েছে। অথচ ওরা না ডাকলে যেতেও পারছি না। একটু বাদে দোকানদার এক গ্লাস লস্যী এনে দেয়। নিঃশেষ করে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলাম তাকে। পকেটে হাত দিতেই বাধা দিল দোকানদার, "পৈসা মিল্ গিয়া মহারাজ। ও শেঠ লোগ দে দিয়া।"

হারানো উৎসাহ ফিরে পেয়েছে ওরা। শরবত পেটে পড়ে আবার চঞ্চল করে তুলেছে ওদের। উচ্ছল কণ্ঠে চন্দ্রা বলে, "চলুন, স্বর্গাশ্রম না মর্ত্যাশ্রম কি বললেন, দেখে আসি।"

সুপরিকল্পিত আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা আর বিভিন্ন সেবাকার্যের পরিচয় পেয়ে খুশি হল ওরা। শরবতে বোধ হয় তৃষ্ণা মেটে নি বড়দার। বিরাট চত্বরের মাঝখানে জলের কল দেখে চন্দ্রার অনুমতি চায়, "জল খাব?"

চন্দ্রা কিন্তু তখন শেখরের সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেছে। নিরুপায় বড়দা করুণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে, বিনা অনুমতিতেই জল খেতে শুরু করেন।

ভুল পথে যাচ্ছে দেখে চন্দ্রার উদ্দেশ্যে বলি, "ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?"

"কেন, গীতাভবনে।"

"দিক ভুল হয়েছে আপনার। ঐ পথটি গেছে নীলকণ্ঠেশ্বরে। গীতাভবনে গেছে এই রাস্তাটা।" হাত দিয়ে দেখিয়ে দিই।

"নীলকণ্ঠেশ্বর কি?" জিজ্ঞেস করে মিনতি। জল খেয়ে বড়দা ততক্ষণে আবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"এখান থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামে চার হাজার ফুট উঁচুতে একটি শিবমন্দির। অবস্থানটি বড় সুন্দর। চারদিকে পাহাড়ী ঝরনার জল। মাঝখানে একটি দ্বীপের মধ্যে মন্দিরটি। শ্রাবণ মাসে প্রতি সোমবার পুজো হয়। সারা মাস ধরে মেলা বসে। কালিকমলীর ধর্মশালা আছে। নেপালের রানীর বাড়ি আছে। অনেকে সেখানে কম্বল জড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে পরদিন আরও চার মাইল গিয়ে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটাও দর্শন করে আসেন। সে সময় এখানে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।"

"ইস্ এটা যদি শ্রাবণ মাস হত তা হলে ঘোড়ায় চড়া যেত।"

"এবার পায়ে চড়ে ডান হাতের সিঁড়ি ধরে শিবানন্দ নগরে চল, না হলে বাস পাবে না।" বড়দা এতক্ষণে চন্দ্রাকে শাসন করার সুযোগ পেলেন।

সিঁড়ি বেয়ে ঘাটের দিকে নেমে আসি। কালিকমলীর সমাধি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। মিনতি জিজ্ঞেস করে আমাকে, "আচ্ছা কালিকমলী কি ওনার সত্যিকার নাম ছিল?"

"সাধুদের পিতৃদত্ত নাম চিরকাল হারিয়ে যায়। শ্রী ১০৮ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। দীর্ঘকাল বদ্রীনাথে তপস্যা করে ভগবানের আদেশে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় গেলেন। গায়ে ছিল একখানা কালো কম্বল। একটা পেতলের ঘড়ার মধ্যে জ্বলন্ত কয়লা রেখে, সেই ঘড়াটাকে খালি মাথায় নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকতেন তিনি। ধনীদের কাছে আবেদন করতে লাগলেন, কেদার-বদ্রীতে ও পথে ধর্মশালা ও সদাব্রত নির্মাণ করে দিতে। অল্পদিনেই কলকাতায় সুপরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। কালো কম্বল গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে কলকাতার লোকেরা কালিকমলী বাবা বলে ডাকতে শুরু করে তাঁকে। ঐ নামেই তিনি আজ সর্বত্র পরিচিত।"

"তাঁর আবেদনে কলকাতাবাসী নিশ্চয়ই সাড়া দিয়েছিল?" প্রশ্ন করেন বড়দা। তাঁর মনোযোগ চন্দ্রাচ্যুত হয়ে কালিকমলীকে ভর করেছে।

"দিয়েছিল বৈকি। ধনীরা অকাতরে অর্থ দিয়েছিলেন। নারায়ণ স্বামী বলে একজন বাঙালী সন্ন্যাসী জীবন দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। তিনি অর্থ

সংগ্রহের জন্যে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। দেশের মাটি থেকে সেই তাঁর চিরবিদায়। মাদ্রাজেই মারা যান তিনি।"

"ঋষিকেশের ধর্মশালা কি কালিকমলী বাবা নিজেই তৈরী করেছেন?" জিজ্ঞেস করে মিনতি।

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়। তাঁর জীবদ্দশাতেই বহু স্থানে তিনি পানি-পিয়াও আর সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করে যান। দেহরক্ষার পরেও তাঁর আরব্ধ ব্রত বন্ধ হয় নি।"

"তাঁর চেলারা বুঝি চালিয়ে নিয়ে গেছে?" জিজ্ঞেস করে চন্দ্রা।

"শিষ্য তাঁর ছিল না কেউ। যে সব সাধুরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবা রামনাথ ও স্বামী আত্মপ্রকাশ তাঁর দেহরক্ষার পর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়ে বসলেন। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। আত্মপ্রকাশ স্বর্গাশ্রমে স্থায়ী হলেন। আর বাবা রামনাথ ঋষিকেশকে কর্মকেন্দ্র করে বাকী প্রতিষ্ঠানের পরিচালন করতে থাকলেন। কর্তৃত্বভার গ্রহণের পরে মাত্র উনিশ বছর বেঁচে ছিলেন বাবা রামনাথ। অথচ তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে এমন একটি সংগঠনে পরিণত করে গেছলেন যে তাঁর দেহরক্ষার পর আপনা থেকেই এর কাজ চলতে থাকে। তাঁর পরে পরিচালক হলেন বাবা মণিরাম। তাঁর ক্ষমতা হল সংকুচিত। এক মারোয়াড়ী সমিতির সৃষ্টি হল তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। তা হলেও কাজ চলেছিল নির্বিঘ্নে। কোন সমস্যা দেখা দেয় নি বাবা মণিরামের জীবদ্দশাতে। ১৯৪০ সালে তাঁর দেহরক্ষার পর পরিচালক নির্বাচন নিয়ে মহা সমস্যা দেখা দিল। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে এ সমস্যার সমাধান হয়। মূল পরিচালনা কেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। মারোয়াড়ী সমিতিকে একটি সার্বজনীন সমিতিতে রূপান্তরিত করে তার হাতে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সেই থেকে আর কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। নিয়মিত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এমন কি কলকাতা থেকে অডিটাররা এসে প্রতিটি চটিতে ঘুরে ঘুরে পরিচালকদের সততা পরীক্ষা করেন। কলকাতায় পরিচালনা কেন্দ্র হলেও, ঋষিকেশই প্রধান কর্মক্ষেত্র। এই প্রতিষ্ঠান এখন ৬৫টি সদাব্রত, ৬৫টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৯০টি ধর্মশালা, ৭০টি পানি-পিয়াও, ৬টি মন্দির, ৫টি গোশালা, ২টি পাঠশালা, ২টি অনাথ আশ্রম এবং একটি আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও ওষুধের কারখানা পরিচালনা করেন।"

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে পরিশ্রান্ত বোধ করছি। খেয়াল হতে দেখি গীতাভবনের সামনে এসে গেছি। ভেতরে গিয়ে ওদের দেখে আসতে বলে আমি গঙ্গার ঘাটে বসে পড়ি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গোধূলির রক্তিম রশ্মিতে ভবনের

দেয়ালে উৎকীর্ণ গীতার শ্লোকগুলো যেন রক্তস্নান করছে। রক্তের সঙ্গে গীতার সম্পর্ক অতি নিবিড়। গীতা অর্জুনকে রক্তের নেশায় মাতিয়েছিল। হত্যা করিয়েছিল তার দীক্ষাগুরু ও অগ্রজকে।

বেরিয়ে এল ওরা। সবার আগে ছুটে এসে চন্দ্রা বলে, "আচ্ছা গীতাভবনের প্রতিষ্ঠাতা শেঠ জয়দয়াল গোয়েঙ্কা নিশ্চয়ই কলকাতায় থাকেন।"

"ঠিক বলতে পারি না। তবে তিনি গোরখপুরের গীতা প্রেসের মালিক।"

আমার কথায় আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল চন্দ্রা, "তুই হেরে গেলি মিনতি। প্রেস যখন গোরখপুরে ভদ্রলোক কিছুতেই কলকাতায় থাকেন না।"

লজ্জা পেল মিনতি। মুচকি হাসল চন্দ্রা। একটু থেকে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ভবনের দেয়ালে কি গীতার সমস্ত শ্লোক উৎকীর্ণ করা আছে?"

"শুধু গীতা নয়। গীতা ও রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড উৎকীর্ণ আছে ওখানে।"

চলতে চলতে প্রশ্ন করেন বড়দা, "গীতাভবনের দোতলায় দেখলাম অনেক সাধু-সন্ন্যাসী রয়েছেন ঝোলাঝুলি নিয়ে। ওঁরা কারা?"

"তীর্থযাত্রী। দোতলার হলঘরটি তীর্থযাত্রীদের জন্য সব সময় খোলা থাকে।'

"তীর্থযাত্রীদের বুঝি খুব সাহায্য করেন এঁরা?" লজ্জা ভুলে প্রশ্ন করে মিনতি।

"সাহায্য বলতে শুধু সাময়িক থাকার ব্যবস্থা। কেদার-বদ্রী যমুনোত্রী ও গোমুখীর পথে সাহায্য বলতে যা কিছু বোঝায় সবই করে কালিকমলী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও সাধুদের সদাব্রত পরচা দেওয়া হয়। পথের ধর্মশালায় নিখরচায় সিধা পান তাঁরা। যে কোন যাত্রীই তেরাত্র থাকতে পারেন। অসুখবিসুখ হলে অবশ্য আলাদা কথা। ঋষিকেশের দপ্তরে কমপক্ষে পাঁচ টাকা দান করলে 'খাতিরদারী চিট্‌ঠি' পাওয়া যায়। ওর একখানা সঙ্গে থাকলে ঘর পেতে একটু সুবিধা হয় ধর্মশালাতে।"

অনেকক্ষণ কথা বলে নি শেখর। আমাকে থামতে দেখে বলে ওঠে, "গীতাভবনের প্রধান কর্মসূচী কি?"

"সৎসঙ্গ। প্রতি বছর চৈত্র থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ঐ যে বিরাট বটগাছটা দেখে এলেন, ওরই ছায়াতলে সৎসঙ্গ বলে এক সভা হয়। দূর দূর থেকে শত শত লোক আসেন প্রতিদিন। শেঠ জয়দয়াল নিজে উপস্থিত থাকেন। স্বামী শরণানন্দ, স্বামী অখদানন্দ, স্বামী পালকনিধি, স্বামী রামসুখদাস, স্বামী চক্রপাণি প্রমুখ পণ্ডিত সন্ন্যাসীরা সে সভায় ধর্মালোচনা…"

চন্দ্রার প্রশ্নে থামতে হল আমায়, "এটা কি ভবন?"

"ভবন নয়, নিকেতন। পরমার্থ নিকেতন।"

"উদ্দেশ্য একই। গীতাভবনের মতই। কীর্তন হয়, সৎসঙ্গ হয়। অনেক সাধু আসেন।"

সন্ধ্যে হয়ে গেছে বলে ওদের আর ভেতরে যাবার পরামর্শ দিই না। তা ছাড়া আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। অঞ্জলির আসার কথা আছে। হয়তো এসে গেছে এতক্ষণে। খেয়াঘাটে এসে পৌঁছলাম। ওপারে শিবানন্দ নগর দেখা যাচ্ছে। গঙ্গা পেরুতে হবে। মাথা পিছু এক পয়সা ভাড়া। আমার ভাড়াটাও দিয়ে দিল চন্দ্রা। প্রতিবাদ করলাম না।

এপারে পৌঁছে দোকানগুলো ছাড়িয়ে বাসের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এবার বিদায় নেবার পালা। কতক্ষণেরই বা পরিচয়। ঘণ্টা তিনেক আগেও চিনতাম না ওদের। তবু যেন মন চাইছে না ছেড়ে যেতে। আশ্চর্য মানুষের মন। কত অকারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

নমস্কার বিনিময় করে চলতে শুরু করি। কিন্তু থামতে হল শেখরের ডাকে। ফিরে তাকিয়ে দেখি চন্দ্রা ও মিনতির সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছে শেখর। মনে হচ্ছে কোন জরুরী আলোচনা। আলোচনা শেষ করে আমার কাছে এসে বিনীত কণ্ঠে শেখর বলে, "আমাদের জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনি। এর যথাযথ মূল্য দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।"

কি বলতে চায় শেখর? কৌতূহলী হয়ে উঠি।

"তবু এটাই যখন আপনার বৃত্তি, আপনাকে কিছু দিতে চাই আমরা। এইটে আপনাকে নিতে হবে।" কোন প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে আমার হাতে গুঁজে দেয় সেই পারিশ্রমিক। রাস্তার আলোয় দেখি একখানি চকচকে সিকি।

॥ পাঁচ ॥

"কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে আর আপনার এ দিকে পাত্তা নেই।" ঘরে ঢুকতেই অনুযোগ করে অঞ্জলি, "কোথায় গিয়েছিলেন?"

"লছমনঝুলা।"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায় রঞ্জন। তার পর বলে, "এই নোংরা পায়জামা আর হাফসার্ট পরে?"

"হ্যাঁ।"

বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় রঞ্জন। বুঝলাম কলকাতার প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পোশাকের বাহার যে মানুষের সঙ্গে সহজ হবার পথে কত বড় অন্তরায় তা সে জানে না। কোট প্যান্ট টাই পরা থাকলে তো আর শেখর আমাকে প্রফেশনাল্ গাইড ভেবে ঐ চকচকে সিকিটা দিতে পারত না।

রঞ্জনের বিরক্তি দূর করতে জিজ্ঞেস করি, "তার পর, তুমি কেমন আছ?"

"বেশ ভাল আছেন। আপনি পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর উনি দাওয়ায় বসে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিলেন। কোন্ সাহসে যে বাড়ির লোকেরা আপনাদের একা একা ছেড়ে দেন, বুঝতে পারি না বাপু।"

"একেবারে পাকা গিন্নী।" রঞ্জন মন্তব্য করেই হেসে ফেলে।

"আপনাদের মত দাদা যার, তার না পেকে উপায় কি?" অঞ্জলির টানা টানা চোখ দুটি থেকে যেন গাম্ভীর্য ঠিকরে পড়ে।

শুনলাম খানিক আগে হাসতে হাসতে অঞ্জলি আশ্রমে এসে হাজির হয়েছে। ছড়িদার ওকে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের ছুটি নিয়ে একটু 'হাওয়া' খেতে বেরিয়েছে। ঘরে ঢুকেই আমাদের জিনিসপত্রকে তছনছ করে ফেলেছে অঞ্জলি। নোংরা জামাকাপড় সব কুয়োর পাড়ে নিয়ে কেচে দিয়েছে। ঝেড়ে মুছে ঘরটার চেহারা পাল্টে ফেলেছে। মাথা ধুইয়ে বার্লি জাল দিয়ে ওষুধ খাইয়েছে রঞ্জনকে। কালো ছিমছাম দেহটিকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় নি, মুখটিকে তো নয়ই।

সীতার মা ও তাঁর শিষ্যা কাজলের সঙ্গে আমাদের সবাইকে খেতে বসিয়ে পরিবেশন করল অঞ্জলি। একটু বাদেই হিন্দী ছবির গান ভাঁজতে ভাঁজতে ছড়িদার ফিরে এল। গর্জে উঠল অঞ্জলি, "এই বুঝি তোমার এক ঘণ্টা?" এগিয়ে গিয়ে মুখের গন্ধ শুঁকল। ছড়িদার কিছু বুঝতে পারার আগেই গলার স্বর আর এক পর্দা চড়ল, "আবার গিয়ে গাঁজার আড্ডায় বসেছিলে?"

অপ্রস্তুত অর্জুন অঞ্জলিকে থামাবার বৃথা চেষ্টা করে। আমাদের দেখিয়ে চুপ করতে ইশারা করে। ভাবখানা, এ রকম গোপন তথ্য আমাদের সামনে ফাঁস করা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু অঞ্জলির গলার স্বর ততক্ষণে সপ্তমে চড়েছে. "আচ্ছা তোমার কি ঘেন্না-পিত্তি বলে কিছু নেই? এত কথা শোন, অথচ সুযোগ পেলেই গিয়ে গাঁজার আড্ডায় বসবে? যদি নাই ছাড়তে পারবে তবে বিয়ের আগে কেন কথা দিয়েছিলে? আমাকে ছুঁয়ে সোমেশ্বর শিবের বটতলায় বসে কেন প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আর কোনদিন গাঁজা ছোঁবে না?" শেষের দিকে গলার স্বরটা যেন কেঁপে ওঠে অঞ্জলির। একটু থেমে তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলে, "দাদাকেই জিজ্ঞেস কর না, ঐ ছাইভস্মগুলো খেলে শরীর খারাপ হয় কি না। ইচ্ছে করে কেন তুমি

নিজের এমন সর্বনাশ ডেকে আনছ ?" আর কিছু বলতে পারে না। মাথা নিচু করে চোখ দুটো মুছে নেয়।

ছড়িদার অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধীর মত। খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়।

তার পর আমিই সে নীরবতার অবসান ঘটিয়ে বলি, "ভাই অর্জুন, সত্যিই ও-সব খেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তুমি আর ও আড্ডায় যেও না।"

অতর্কিতে বসে পড়ে অর্জুন। দু'হাতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, "আমি আপনার গোড় ধরিয়ে জবান দিলাম, আউর উধারমে নেহি যায়গা।"

সবল আকর্ষণে ওকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। অঞ্জলির মুখে তখন হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

কাল বিকেলে আবার আসবে বলে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল ওরা দুজনে। রাস্তার অস্পষ্ট আলোতেও যেন দেখলাম অঞ্জলি অর্জুনের একখানা হাত হাতে তুলে নিল।

সীতার মা'র আদিবাস নৈহাটি। খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের কথা ঠিক পরিষ্কার করে মনেও করতে পারেন না তিনি। ভাটপাড়ার বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে তাঁর স্বামী। যজমানদের উদার অন্তঃকরণের জন্যে আর্থিক প্রাচুর্য ছিল তার শ্বশুর-ঘরে। সে আমলেও কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে বহুবিবাহের প্রচলন উঠে যায় নি। সীতার জন্মের পরেও কয়েকবার বিবাহ করেছিলেন তাঁর স্বামী। প্রতিবাদের অধিকার ছিল না তাঁর। শুধু অন্তঃপুরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে নীরবে অশ্রুপাত করতে পারতেন তিনি। মাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করত সীতা, "তুমি কাঁদছ কেন মা ?"

মা'র মুখে কোন উত্তর যোগাত না। সজোরে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

এমনি ভাবেই হয়তো তাঁর জীবনের সব দিনগুলো গড়িয়ে যেত। কিন্তু পড়ল বাধা। শুনতে পেলেন স্বামী আগামীকাল রানাঘাট যাচ্ছেন—সপ্তমবার বিবাহ করতে। আর একটি নারীর জীবনের কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। যথারীতি গভীর রাতে সোহাগ জানাতে এলেন স্বামী। কথায় কথায় আবার বিয়ে করতে নিষেধ করলেন। দাসীর এ দুঃসাহস বরদাস্ত করতে পারলেন না পতিদেবতা, "ছোট ঘরের মেয়ে তুই। কুলীন বামুনদের নিয়মকানুন তুই কি বুঝবি ? এ বিয়ে না

করলে কত লোকসান জানিস? পাঁচ কুড়ি এক টাকা, আরও কত জিনিসপত্র দেবে মেয়ের বাপ।"

"টাকার তো তোমার অভাব নেই। ঐ কটা টাকার জন্যে..."

"ঐ কটা টাকা? তোর বাপ তো মোটে তিন কুড়ি এক টাকা দিয়েছিল।"

"তবু টাকার জন্যে তুমি আর একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করো না।"

লাফিয়ে উঠলেন স্বামী। সীতার ঘুম ভেঙে গেল। কেঁদে উঠল সে।

সে কান্নার শব্দকে ছাপিয়ে উঠল স্বামীর চীৎকার, "মেয়েমানুষের আবার জীবন কি রে? আমার মত সাতকুল শুদ্ধ কুলীনের ঘরে এলে জীবন নষ্ট হবে? কেন, বয়েস হয়েছে বলে? চুল পেকে গেছে বলে? দাঁত পড়ে যাচ্ছে বলে? যদি জানিসই যে জীবন নষ্ট হয়, তবে এখানে পড়ে আছিস কেন?"

মেয়েকে শান্ত করতে করতে ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি ঠিক ও ভেবে বলি নি। মাপ করো। তুমি আমার স্বামী। আমার দেবতা। তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব আমি?" একবার থেমেছিলেন তিনি। তার পর করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমার কাছে কোন দিন আমি কিছু চাই নি। আমার কথা রাখো। আর বিয়ে করো না।"

"যাঃ যাঃ। আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। জীবন নষ্ট..." গজরাতে থাকেন স্বামী, "বেশ। আমি যদি সত্যিই তোর দেবতা হয়ে থাকি, তা হলে এই বলে গেলাম, বিয়ে করে ফিরে এসে যেন তোর জ্যান্ত মুখ দেখতে না হয়।"

স্বামীকে আর নিজের মুখ দেখান নি সীতার মা। পরের রাতে স্বামী যখন তার সপ্তম বাসরশয্যায়, নিজের সামান্য গয়নাগাঁটি ও অতি যত্নে সঞ্চয় করে রাখা যজমানদের নমস্কারী টাকা কটিকে সম্বল করে, স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছিলেন তিনি। সীতার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দ্বিধা করেছিলেন। তার পরেই মনের সে দুর্বলতা দূর করে, মেয়ের চিবুক স্পর্শ-করা আঙুলের ডগা দুটিকে একবার চুম্বন করে, চিরবিদায় নিলেন মা। সদরের বটগাছের কালো পেঁচাটাও বোধ হয় তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

স্টেশনে এসে প্রথম যে গাড়ি পান, তাতেই চেপে বসেছিলেন সীতার মা। লক্ষ্যহীন ভাবে কয়েকবার গাড়ি বদলে দিন পাঁচেক পরে হরিদ্বার পৌঁছেছিলেন। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। তবু তিনি সামলে উঠলেন। ধন্যবাদ দিলেন তাঁর ভগবানকে। কুলীন ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর থেকে যিনি তাঁকে টেনে এনেছেন দেবভূমি হরিদ্বারে।

সাধু-সজ্জনদের সাহায্যে সীতার মা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন

হরিদ্বারে। আজ আর তিনি অবলা নন—অবলাদের পরম সহায়। বহু অনাথা নারীকে আশ্রয় দিয়েছেন। হরিদ্বারের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে চেনে। তারজন্যে বহু তীর্থ দর্শন করেছেন তিনি।

কাছেই কোথাও কেউ কাঁদছে।

সীতার মা'র কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোর আসে নি। সাধুমা বলেছেন ঋষিকেশে চোর নেই। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর। চোখ মেলে চুপ করে শুয়ে রইলাম। আবার কান্নার শব্দটা ভেসে এল। সাধু-সন্ন্যাসীর এই বনভূমিতে, যেখানে সুখ-দুঃখ কামিনী-কাঞ্চন কিছু নেই, সেই আনন্দনিকেতনে, এই নিষুতি রাতে কে চোখের জল ফেলছে?

"কাঁদছিস কি হতভাগী? মাতাল স্বামীর চাবুক খেয়ে ঘর ছেড়েছিস। ঠাঁই দিলাম, বাবাজী দীক্ষা দিলেন। কাম-ক্রোধ-মোহ বিসর্জন দিয়ে গেরুয়া ধরলি। আর ছ'মাস যেতে না যেতেই রতনলালের সঙ্গে ঢলাঢলি?" থামলেন সীতার মা।

সীতার মা কাজলকে নিয়ে আমাদের ঘরের দাওয়ায় বিছানা পেতেছেন। গতবার হরিদ্বারে গিয়েছিলাম সীতার মা'র আশ্রমে। কাজলকে দেখি নি তখন। তাকে পেয়েছেন তার পরে। কাজলকে সীতার আসনে বসিয়ে সুখেই ছিলেন তিনি। শুনেছিলাম ইদানীং কি একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কাজলকে নিয়ে কিন্তু সমস্যাটা যে এ জাতীয় হতে পারে, কল্পনাও করি নি।

সীতার মা বলে চলেছেন, "রতনলাল সাধু নয়, লম্পট। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবি না তুই। ওর হাত থেকে রক্ষা করতে তোকে এখানে নিয়ে এসেছি। এখানেই কিছুদিন থাকবি। সাধুবাবাকে বলে কয়ে রাজী করিয়েছি। কাজকর্ম করবি যেরকমটি ওখানে করতিস। বেশ সুখেই রাখবেন সাধুবাবা। আর একটা কথা..." এক মুহূর্ত থামলেন তিনি, "রতনলালকে যখন নাই দিয়েছিস, সে এখানেও আসবে। এ আশ্রম সে চেনে। এখানে যে তোকে নিয়ে এসেছি, জানতেও পারবে সে। তাকে দেখলেই সাধুবাবাকে খবর দিবি। সাধুবাবা বলেছেন তার ঠ্যাং ভেঙে দেবেন। তার পর ঐ লম্পটটাকে হরিদ্বার থেকে তাড়িয়ে, তোকে হরিদ্বার নিয়ে যাব।" খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন সীতার মা। হয়তো কাজলকে নির্বাক দেখে আবার শুরু করেন, "মনে রাখিস, পুরুষ মানেই রাক্ষস। রতনলাল আর তোর স্বামীর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। যে কদিন তোর যৌবন আছে সে কদিন তোর সর্বনাশ করতে অনেক রতনলালই আনাগোনা করবে। যৌবনের জৌলুস ফুরিয়ে গেলে দেখবি ওরা তোকে ডেকেও জিজ্ঞেস করছে না। তোকে আমি

ভালবাসি বলেই বলেছি, রতনলালকে ভুলে যা।" চুপ করলেন সীতার মা।

চুপ করে থাকল কাজল। নিস্তব্ধ অসাড় রাত্রি বয়ে চলল অব্যাহত গতিতে। জেগে থাকল বহু নারীর অন্তহীন বেদনার সাক্ষী ঐ কালো আকাশ। চরিত্রের কালিমা ওকে লজ্জা দিতে পারে না। রাত এগিয়ে চলেছে প্রহর থেকে প্রহরে। ভারাক্রান্ত মন পাল্লা দিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

শ্রান্ত সীতার মা বোধ হয় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছেন। কাজল? সেও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? না সে ভেবে চলেছে রতনলালের কথা—তার মাতাল স্বামীর কথা—সন্ন্যাসিনী হবার অপচেষ্টার কথা আর নিজের অতৃপ্ত যৌবনের কথা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা চাপা কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ছুটে গেল।

"কাজল!" ফিস্ ফিস্ করে কে যেন ডাকছে, "কাজল!" পুরুষের কণ্ঠস্বর।

"কে?"

"চুপ...আমি রতন। আস্তে আস্তে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে এসো।"

চোর এসেছে। নীতিবেত্তা মন অনুশাসন দিল, 'সাধুবাবাকে ডাকো। সীতার মাকে জাগাও।' কবিমন বলল, 'রোদনভরা এ ভুবনে, দুটি মানুষের জীবনে, ক্ষণিক হাসির এ জোয়ারে, বাধা দেবে কোন্ অধিকারে?'

নিঃশব্দে জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। জানালার পাশেই রাস্তা। ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাইরে থেকে কেউ আমায় দেখবে না। গেরুয়াপরা স্বাস্থ্যবান সুন্দর একজন যুবক জানালার কাছেই চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে। কাজল এসে তার পাশে দাঁড়াল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, "তোমার কি জীবনের কোন মায়া নেই?"

"আছে বৈকি কাজল। জীবনকে ভালবাসি বলেই তো এখানে আসতে হল।"

"কেমন করে জানলে যে আমি ঐ দাওয়ায় শুয়ে আছি? যদি আর কেউ হত?"

"সন্ধ্যে থেকেই ঐ শিবমন্দিরের পেছনে লুকিয়ে আছি। বুড়ী এতক্ষণ সজাগ ছিল বলে আসতে পারি নি।"

"কিন্তু এ দুঃসাহস করলে কেন?"

"তোমাকে নিয়ে যাব বলে।" তৃপ্তকণ্ঠে সন্ন্যাসী জবাব দেয়।

"কোথায়?"

"তা তো জানি না। শুধু জানি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।" একবার থামে সন্ন্যাসী। তার পর আবার বলে, "ঘরের কথা ভেবে তো তুমি পথে বের হও নি, কাজল। ঘর আমাদের না-হয় নাই বা রইল। এসো পথের নেশাতেই আমরা চলা শুরু করি।"

॥ ছয় ॥

সাধুদির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। সাধুবাবা আমাকে ডাকছেন। তবে কি কাল রাতে আমি জেগেছিলাম, এ খবরটা তিনি পেয়ে গেছেন কোনমতে? ভয়ে ভয়ে মন্দিরের দিকে এগোলাম। সাধুদি বাধা দিয়ে বললেন, "বাবা আজ মন্দিরে যান নি, ঘরেই আছেন।"

সেকি? ঐ ছেলেমেয়ে দুটোর নৈতিক অধঃপতন দেখে, সমাজের কথা ভেবে সাধুবাবা কি পুজোপার্বণ ভুলে গেলেন? সাধুবাবার ঘরের কাছে যেতেই শুনতে পেলাম, "তুমি থামো সীতার মা। গেছে তো গেছে চুলোয় গেছে। তোমার বোঝা কমেছে। আমি আমার নিজের জ্বালায় জ্বলছি। তুমি ঐ অসতীর কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।"

সাধুবাবার আবার কি জ্বালা? ঘরে ঢুকলাম। এ কি চেহারা সাধুবাবার? কাল রাতের বাসি গেরুয়া পরে আছেন এখনও। চোখ দুটি ঘোলাটে। ঠোঁট দুটি পাণ্ডুর! আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "বাবা কুমার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে।"

চমকে উঠি। তবে কি সন্ন্যাসী রতনলাল সন্ন্যাসিনী কাজলের সঙ্গে আরও কিছু নিয়ে গেছে? শিবমন্দিরের পিছনে লুকিয়ে ছিল সে। এক ফাঁকে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের গয়নাগাটি নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় কিছু। এ কি করেছি? চোখের সামনে দিয়ে চোর পালিয়ে গেল আর আমি···

"ভাল ছেলে বলে তোমাকে বলেছি বিমানের কথা। ঠক, জোচ্চোর, প্রতারক। তের শ টাকা নিয়েছিল দু হাজার দেবে বলে।" একবার থেমে স্তব্ধপ্রায় কণ্ঠে স্বর ফিরিয়ে আনলেন, "সে পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে!"

"হ্যাঁ বাবা, আমাকে ফতুর করে পালিয়েছে। শুধু আমাকে নয়, ঋষিকেশের বহু লোককে ফাঁকি দিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।"

"বিশ হাজার?"

"হ্যাঁ। নিয়েছে মিস্টার ও মিসেস নটরাজনের কাছ থেকে। নিয়েছে হীরা সাউ ও সামন্তের কাছ থেকে, মাস্টারজী ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। আরও অনেকের থেকে। সকলে বোধ হয় তাদের সর্বনাশের কথা টের পায় নি এখনও। উপকার

করার ভান করে সকলের সঙ্গেই সে হৃদ্যতা করেছিল। স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, স্ত্রী জানে না। স্ত্রী টাকা দিয়েছে, স্বামী জানে না। আজ ভোরে ফেরার সময় দেখি ওর বাড়িতে তালা ঝুলছে। বাড়িওয়ালা লছমন বলল, কাল সন্ধ্যের সময় একটা স্যুটকেস্ হাতে ডাইনীটার সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে গেছে।"

"পুলিসে খবর দিয়েছেন ?"

"আমি দিই নি বাবা। আমার মাথা ঘুরছে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন সাধুবাবা। সীতার মা হাওয়া করতে থাকেন তাঁকে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার শুরু করলেন সাধুবাবা, "অনেকে থানায় গেছে। তুমিও গিয়ে আমার হয়ে একটা ডায়েরি করে এসো।"

সাধুবাবার ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি সাধুদি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ইশারায় আমাকে সাধুমার ঘরে যেতে বলে উঠানে পায়চারি করতে থাকেন তিনি।

শুয়েছিলেন সাধুমা। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। দু-চোখে তাঁর অশ্রুর বন্যা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, "আমাকেও শেষ করে গেছে বিমান। পোস্টাফিসের পাস-বইটা ওকে দিয়েছিলাম। মনে হয় সব তুলে নিয়ে গেছে। তোমাকে একবার পোস্টাপিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।"

"আপনার পাস-বই ওকে দিয়েছিলেন কেন ?"

"আমার দুর্মতি হয়েছিল।" একবার থেমে চোখ মুছলেন তিনি। তার পর বললেন, "সেদিন আমাকে এসে চুপি চুপি বলল, 'সস্তায় একশ মণ গম বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এক জায়গায়। ওর টাকায় কিছু টান পড়েছে। আর শ'তিনেক টাকা হলেই মালটা তুলতে পারে। খদ্দেরও আছে হাতে। পাঁচশ' টাকা মুনাফা হবেই। মোটে দিন সাতেক সময় লাগবে। লোভ, বাবা লোভ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। বলেছিল তিনশ'র বদলে পাঁচশ ফিরিয়ে দেবে এক হপ্তা বাদে।"

"সাত দিন বাদে টাকা চেয়েছিলেন ?"

"চেয়েছিলাম বাবা। বলেছিল মালটা যার নেবার কথা সে ব্যবসার কাজে হঠাৎ লখনৌ গেছে। অনুরোধ করেছিল আর কয়েকটা দিন সময় দিতে। বিশ্বাস করেছিলাম। আর না করেই বা পারি কেমন করে! এর আগে দুবার ঠিক কথামত টাকা ফেরত দিয়েছিল।"

"এই তা হলে প্রথমবার টাকা দেন নি ?"

"না। মাসখানেক আগে এক দিন দুপুরে এসে বলে, 'একটা সাহায্যের জন্য আপনার কাছে এসেছি মা। বলতে লজ্জাও করছে, অথচ না বলেও পারছি না। শ'খানেক টাকার জন্যে বড়ই ঠেকে গেছি। শ'খানেক টাকা হলে শ'খানেক আয়

করতে পারতাম কালকের মধ্যেই। একটা মাল পেয়েছি সস্তায়। আপনাকে এ সব বলা অন্যায়, আপনি সন্ন্যাসিনী। কিন্তু যদি অপরাধ না নেন তবে ঠাকুরের পুজোর জন্য গোটা পঞ্চাশেক টাকা বেশী দিতে রাজী আছি।' আমি বললাম, 'তা হয় না বিমান। সুদ নিয়ে টাকা ধার দিতে আমি পারব না। তুমি আর কারও কাছে যাও যারা মহাজনী ব্যবসা করে।' লজ্জিতভাবে জবাব দিয়েছিল, 'ছিঃ ছিঃ, একে আপনি সুদ ভাবছেন কেন? আপনি আমাকে স্নেহ করেন। আমার স্ত্রীকে সাধুবাবা দীক্ষা দিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসা করব? এত ছোট আমাকে মনে করবেন না মা। টাকাটা পেলে আমার উপকার হয় বলেই আমি চাচ্ছি। যা আয় হবে তার থেকে ঠাকুরের পুজোর জন্য আমি যদি কিছু দিই, আপনি আপত্তি করবেন কেন? টাকা আমি অনেকের কাছ থেকেই নিতে পারি। কিন্তু তারা তো পুজোর জন্য টাকা নেবে না, তারা নেবে সুদ।' খুশি হয়ে বললাম, 'আমার কাছে তো নগদ টাকা নেই। পোস্টাপিসে কিছু আছে। তার থেকে তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু তোমাকেই তুলে নিতে হবে, আবার রেখেও দিতে হবে গোপনে। তোমার সাধুবাবা যেন কিছু জানতে না পারেন।' সেও আমাকে বলেছিল, 'মৃণালকে যেন কিছু বলবেন না। ও তা হলে আমাকে ঘরে টিকতে দেবে না।' খুব সুন্দরী না হলেও বড়ই লক্ষ্মীশ্রী ছিল মৃণালের। রোজ এখানে আসত। আমাদের সেবাশুশ্রূষা করত। বিমানের স্ত্রী-ভাগ্যে খুশি হতাম আমরা।

"টাকা তোলার স্লিপ সই করে পাস-বইটা দিলাম ওকে। পরদিন দুপুরেই এসে হাজির। চুপি চুপি বইখানা আমার হাতে দিয়ে আমাকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে চলে গেল। দেখি একশ টাকা তুলে দেড়শ টাকা জমা দিয়েছে। তার পর আর একবার এসে দু'শ টাকা লিখিয়ে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে তিনশ টাকা জমা দিয়ে বই ফিরিয়ে দিল। কয়েকদিন আগে ঐ তিনশ টাকা নেবে বলে সই আর বই নিয়ে চলে যায়। আর ফিরিয়ে দেয় নি।"

"সাধুবাবা যে তেরশ টাকার কথা বললেন তার মধ্যে আপনার টাকাও আছে তো?"

"না, না। আমার ব্যাপারটা তিনি জানেন না। লোভ আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এতদিনের সাধন-ভজন সবই মিথ্যে করে দিয়ে গেল ঐ শয়তান। লোভ আমি জয় করতে পারি নি।"

আর কিছু বলতে পারেন না তিনি। ত্রস্ত পদক্ষেপে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন। ঠাকুরের কাছে আশ্রয় খুঁজতে গেলেন। বলতে গেলেন বোধ হয় নিজের এই আদর্শচ্যুতির কথা। ঠাকুরের কাছে তিনি সান্ত্বনা পাবেন কি না জানি না, কিন্তু

সান্ত্বনা দেবার মত সময় আমার হাতে নেই। আমাকে পোস্টাপিসে যেতে হবে যেতে হবে থানায়।

॥ সাত ॥

বিমান আজ শহরের হিরো। মন্দির থেকে থানা পর্যন্ত সর্বত্রই আলোচ্য বিষয়। তার এই সাফল্য এখানকার বাঙালী সমাজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। দু-একজন তো আমার সামনেই বলল, "বাঙ্গালী চোট্টা হায়।" কিন্তু কেউই তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারে নি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছে যে একটি বাঙালী যুবক পুণ্যভূমি ঋষিকেশের অর্থলোভী প্রবুদ্ধ সৎ-সমাজকে বোকা বানিয়ে গেছে।

আশ্রমে ফিরে চলেছি। সাধুমার জন্য কষ্ট হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। জাল নোটিস দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে সব টাকা তুলে নিয়ে গেছে বিমান। আজ তিনি সত্যই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী।

কিন্তু ওখানে ভিড় কেন? মাতাজীর আশ্রমের সামনে? তবে কি বিমান ধরা পড়েছে? হয়তো এতক্ষণে ওর সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। মৃণালও নিশ্চয়ই রেহাই পায় নি। সাধুমার সৌভাগ্য আর বিমানের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে ভিড় ঠেলে আশ্রমে ঢুকলাম।

উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট এলাকা নিয়ে মাতাজীর আশ্রম। গেট দিয়ে ঢুকলেই বাঁধানো চত্বর। চত্বরের চার পাশে গোলাপ আর গাঁদা ফুলের বাগান। পুবে মন্দির। দক্ষিণে এক সারি ঘর—মাতাজী, আশ্রমের সেক্রেটারী গোবিন্দলালজী ও অন্যান্য আশ্রমবাসীদের বাসগৃহ। মাতাজীর ঘরের সামনেই একটা বেদী। বাণীমঞ্চও বলা যেতে পারে।গত বারে দেখেছি ঐ মঞ্চের ওপরে ভেলভেটে মোড়া আসনে বসে রেশমী গেরুয়া পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে মাতাজী বাণী দেন তাঁর সন্তানদের উদ্দেশে। সামনে চন্দন কাঠের গ্রন্থাধারের উপর খোলা থাকে এক-খানা খাতা। পাশে জ্বলতে থাকে সুগন্ধি ধূপ। দুটি মেয়ে ঝালর দেওয়া প্রকাণ্ড দুখানা পাখা দিয়ে হাওয়া দিতে থাকে মাতাজীকে। জনা চারেক ছেলে পালা করে মাতাজীর পদসেবা করতে থাকে। আর মাতাজী অর্ধনিমীলিত চক্ষে তাঁর সন্তানদের দিকে তাকিয়ে, গোবিন্দজীর মাতৃবন্দনা শেষ হবার অপেক্ষায় বসে থাকেন। বন্দনা শেষে গোবিন্দলাল মাতাজীর পদযুগল গঙ্গাজলে ধুইয়ে দিয়ে সেই পবিত্র পাদোদক সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করতে থাকেন। সভা সাময়িকভাবে চঞ্চল হয়ে আবার শান্ত হয়। মাতাজী বলতে শুরু করেন, "আমার পেয়ারের

ছেলেমেয়েরা, তোমরা তোমাদের মা'র আশীর্বাদ গ্রহণ করো।"

সন্তানরা মাথা নত করে মাতাজীকে প্রণাম করে। মাতাজী বাণী দেন, "ঋষিকেশে আজ বহু আশ্রম, বিস্তর আখড়া আর অজস্র ভণ্ড। সাধন-ভজন না করে, ভগবানকে দর্শন না করে সাধু সেজে তারা আজ ধর্মপিপাসুদের প্রতারিত করছে। বিচারের ভার তোমাদের সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। তাই বলে তোমরা তাদের এ প্রতারণার সুযোগ দিতে পারো না। এদের দ্বারা প্রতারিত হলে, প্রতারণায় সাহায্য করার পাপে তোমরা পাপী হবে—

অন্যায়ঃ ক্রিয়তে যেন চান্যায়ঃ সহ্যতে হবা।
দহ্যতে ঘৃণয়া নিত্যাং সোঽগ্নৌ তৃণসমশ্চ তে॥

মা হয়ে তোমাদের আমি এই পাপ করতে দিতে পারি না। তাই মায়ের কর্তব্যে প্রণোদিত হয়ে আমি তোমাদের আদেশ করছি, তোমরা ঐ সব ভণ্ডদের ছায়া মাড়াবে না। এ আদেশ অমান্য করলে তোমাদের নরকেও ঠাঁই হবে না।"

ভেতরে ঢুকে দেখি মাতাজীর ঘরের সামনে ভিড়। হাত পা নেড়ে, ভুঁড়ি দুলিয়ে গোবিন্দলালজী চিৎকার করছেন, "সর্বসম্মতিক্রমে ট্রাষ্টিবোর্ড তোমাকে আশ্রম থেকে বহিষ্কার করেছে।"

"ট্রাষ্টিবোর্ড? কিসের ট্রাষ্টিবোর্ড? আমি এই আশ্রম তৈরি করেছি আমার স্বর্গত স্বামীর রক্ত-জল করে উপার্জিত টাকা দিয়ে। ঋষিকেশের কে না জানে যে আমি ট্রাষ্টিবোর্ডের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম তোর বুদ্ধিতে? ছত্রে ছত্রে ফেউ-ফেউ করে ঘুরে বেড়াতিস তোরা। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে জানি, কিন্তু মানুষ যে এতবড় বেইমান হতে পারে তা জানা ছিল না।"

"তোমার ও সব বাজে কথা ছাড়ো। সনাতন ধর্মের এই পাদপীঠকে যাতে না তুমি অনাচারে ডুবিয়ে দিতে পারো তাই আইনসঙ্গত ভাবে তোমাকে অপসারিত করা হয়েছে।"

"কি বললি? আমি এই আশ্রমকে অনাচারে ডুবিয়ে দিচ্ছিলাম? এতবড় কথা আমাকে—ঋষিকেশের মাতাজীকে—বলতে পারলি তুই?" কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর।

"মাতাজী! কে তোমাকে মাতাজী বানিয়েছে? কেন তুমি এতদিন মাতাজী ছিলে আর আজই বা মাতাজী নও কেন? তোমার অধঃপতন দেখে ভগবান আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, তোমাকে এই আশ্রম থেকে অপসারিত করতে।" সমবেত সন্তানরা যাতে কোনরকম সন্দেহের সুযোগ না পায় তাই একবার থেমে

দু-হাত জোড় করে তাঁর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, "সন্তানদের সামনে তোমার অনাচারের কথা বলে আমি আর এ আশ্রমকে কলুষিত করব না। শুধু একটা প্রশ্ন করি, তুমি এ দু মাস মীরাটে কাটিয়ে এলে কেন?" ওকালতি চালে জেরা করেন গোবিন্দলালজী।

"আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছি সেই যাওয়াই আমার কাল হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তুই আমার এ সর্বনাশ করেছিস।"

"বাজে কথা রাখো। তোমার ছেলে অসুস্থ বলে, ঋষিকেশের এই অগণিত সন্তান—যারা তোমাকে মাতাজী বলে মনে করত, তাদের ভুলে তুমি দু মাস মীরাটে সংসার করে এলে। সন্তানগণ!" গোবিন্দলালজীর ডাকে সকলে সচকিত হলে উঠল, "সন্তানগণ! আপনারা যাকে মাতাজী বলতেন, যিনি প্রতি সন্ধ্যায় আপনাদের উপদেশ দিতেন, 'শুধু সংসার ত্যাগ করলেই হবে না, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত না হতে পারলে মোক্ষলাভ হয় না', তিনি নিজের ছেলের মায়ায় দু মাস সংসার করে এলেন। আপনারাই বিচার করুন তাঁকে আর মাতাজী বলা উচিত কি না।"

নির্বাক জনসাধারণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। মাতাজীর চিৎকার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, "শয়তান, পাপিষ্ঠ, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। তোর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হবে। ভগবান তোর বিচার করবেন। এত বড় পাপ তিনি সইবেন না…"

ঝড়ের বেগে অকুস্থলে হাজির হলেন দারোগা পারেখ সাহেব। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল্। মাতাজীর সামনে এসে দারোগা বললেন, "আপনাকে বাইরে যেতে হবে। আপনার যদি এদের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকে তা হলে থানায় চলুন, ডায়েরি করে নেব। কিন্তু শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে এখানে আর আপনাকে আমি থাকতে দিতে পারি না।"

অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মাতাজী। খানিক আগের সেই তেজ যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। দারোগার ইশারায় কনস্টেবলরা তাঁর মালপত্র ধরাধরি করে রাস্তায় এনে ফেলল। একটা অস্ফুট প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলেন না মাতাজী। গোবিন্দলালজী ও তাঁর সহকর্মীরা শব্দহীন মুখে হাসি ফুটিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দেবসেবার অছিলায়।

সর্বহারার দৃষ্টিতে শেষবারের মত আশ্রমকে দেখে নিয়ে মাতাজী বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। স্বামীর অর্থ আর নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছিলেন এই আশ্রম।

সুষ্ঠ পরিচালনার জন্ত আশ্রিত গোবিন্দলালের পরামর্শে ট্রাষ্টিবোর্ড গঠন করেছিলেন। ট্রাষ্টিবোর্ড তাঁর ট্রাস্টের মর্যাদা রাখল না। আইনের প্যাঁচে আজ তিনি হেরে গেছেন—জীবনের শোচনীয়তম পরাজয়।

মাতাজীর পেছনে আমিও আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ আগেই তিনি মীরাট থেকে ফিরেছেন। গতরাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। সকালে জপ-তপ তো দূরের কথা, চোখে মুখে জল পর্যন্ত দেন নি, মনে হয়। দু মাস পরে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁর আশ্রমে। কল্পনাও করতে পারেন নি যে ইতিমধ্যে চাকা ঘুরে গেছে। সাধারণ রমণী তিনি। অর্থ আর স্থানের মাহাত্ম্যে মাতাজী হয়েছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সময় মাতাজী হবার হয়তো কোন উদ্দেশ্যও ছিল না তাঁর। স্বামীর বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে সংসার থেকে দূরে ঋষিকেশের এই বিজন প্রান্তে বাস করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। তার পর একদিন গোবিন্দলালের সঙ্গে পরিচয়। আশ্রয়ের বিনিময়ে গোবিন্দলাল তাঁকে মাতাজী করে তোলেন। 'সন্তানে'র সংখ্যা বাড়তে থাকে। আশ্রমের আয় বৃদ্ধি পায়। অর্থই অনর্থ ঘটায়। আশ্রিতেরা তাঁর অর্থের আকর্ষণে আজ তাঁকেই বিসর্জন দিয়েছে।

কয়েকজন পথচারী মাতাজীকে নিয়ে ধর্মশালার দিকে গেলেন। ঋষিকেশের পুণ্যার্থীদের হৃদয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন যিনি, তিনি আজ নিরাশ্রয়। ধর্ম তাঁকে সইল না। কিন্তু ধর্মশালা তাঁকে আশ্রয় দেবে। কাল সকালে তিনি ফিরে যাবেন সংসারে—যে সংসার থেকে পালিয়ে এসে তিনি একদিন মাতাজী হয়েছিলেন। বিচ্ছেদ ও বেদনা গৃহীকে সন্ন্যাসী করে জানি, মাতাজী জানিয়ে গেলেন, আঘাত ও প্রতারণা সন্ন্যাসীকেও গৃহীতে রূপান্তরিত করে।

৷ আট ৷

ঘরে ঢুকতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে। আশ্রমের আবহাওয়ার কথা ভেবে ওর উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে গলা মেলাতে পারলাম না। ক্ষীণকণ্ঠে প্রকাশ করতে হল মিলনের আনন্দকে। রঞ্জনের কাছে শুনলাম অনেকক্ষণ থেকে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন ডাক্তার। দেরাদুন থেকে বাড়ি ফিরেই এখানে ছুটে এসেছেন।

রঞ্জন জানাল, "ডাক্তারবাবু বলেছেন আমি ভাল হয়ে গেছি। কাল সকালে আমরা রওনা হতে পারি।"

ডাক্তার রঞ্জনকে সমর্থন করে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, কাল আপনারা রওনা হতে পারেন। ভাগ্যিস ঋষিকেশের জল-হাওয়ার গুণে রঞ্জনবাবু কাবু হয়ে পড়েছিলেন! নৈলে তো আপনাদের সঙ্গে দেখাই হত না।" একটা সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিগ্যেস করলেন, "কেমন আছেন বলুন।"

"ভালই।"

"ঋষিকেশের তো অনেক নতুন খবর শুনলেন।"

"কিছু কিছু শুনেছি। তবে আসলটাই শুনতে পাই নি এখনও।"

"আসল খবরটা আবার কি?"

"আপনার দাম্পত্য-জীবনের খবর।"

উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লেন ডাক্তার। অতি কষ্টে হাসি কমিয়ে বললেন, "খারাপ যে নয় তার প্রমাণ তো পেয়েই এসেছেন। আর ভাল কি না সে খবর আজ রাতেই নিয়ে আসবেন। সন্ধ্যের পর আমার ওখানে আপনাদের নেমন্তন্ন। বীণা বলেছে কোন ওজর আপত্তি চলবে না।" তার পর হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে জানালেন, "রায়ওয়ালা যাচ্ছি হরিণের মাংস আনতে।"

আশ্রমের অসাড় অবস্থা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। গতকাল এ সময়টা সাধুবাবার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি। আজ তাঁর মানসিক অবস্থা গল্পের অনুকূলে নয়। অকারণে রেগে যাচ্ছেন বারে বারে। তাঁর কাছে এগোতেই সাহস হল না। রঞ্জনকে বিশ্রাম করতে বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বেশ গরম পড়েছে। পড়ুক গে। এর পর বহুদিন উষ্ণতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি ভরত-লাইব্রেরির দিকে। কাগজ দেখতে। অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষার কাগজ সেখানে আসে নিয়মিত। এর পর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ সভ্য জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। সময় যখন পেয়েছি, অজানা পথে যাত্রার প্রাক্কালে সভ্য পৃথিবীটার একটু খবর নিয়ে যাই। তা ছাড়া ভরত-লাইব্রেরি ঋষিকেশের মিলনতীর্থ। কর্মাবসানে গণ্যমান্যরা রোজ বিকালে একবার করে এখানে এসে হানা দিয়ে যান। আসেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ মিস্টার নটরাজন, ঋষিকেশের ছত্রহীন রাজা শাস্ত্রীজী। আসেন দারোগা পারেখ সাহেব, হাসপাতালের ডাক্তার, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক চন্দ্র। আসেন মাস্টারজী···

আগামী মেলায় কি রকম বন্দোবস্ত করা হবে এখানে বসেই সে আলোচনা হয়। রানী পোখরীতে যে চড়ুইভাতির আয়োজন করা হয়েছে, তার কর্মসূচী নির্ধারিত হয়। এবার যাত্রীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে বেশী কি না, তা নিয়ে তুমুল

তর্ক বাধে। প্রদেশগত হিসাবে যাত্রীদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চুলচেরা বিচার চলে। বাঙালীরা মধ্যবিত্ত—তারা কেনে কিশমিশ, আখরোট, বাদাম ও চুয়িংগাম। মারোয়াড়ী ধনী—তারা কেনে বাসনপত্র, ঘি ও আচার। রাজস্থানীরা স্বল্পবিত্ত—তারা এখান থেকেই সারা পথের রসদ কিনে নিয়ে যায়। পথে দাম বেশী। পাঞ্জাবীরা শৌখিন—যাত্রাপথে মোট বাড়াতে রাজী নয় ওরা। বেশী পাঞ্জাবী এলে, এখানকার দোকানদারদের কোন লাভ নেই। কিন্তু পথের দোকানদারেরা মুনাফা লোটে দ্বিগুণ। মাদ্রাজীরা বিচক্ষণ—তারা আসে দল বেঁধে, প্রয়োজনীয় সব কিছুই সঙ্গে নিয়ে। ওরা নাকি এখানে কিছু কেনে না, পথে তো নয়ই।

কাগজ পড়ছিলাম মনোযোগ দিয়ে। পিঠে একটা স্পর্শ অনুভব করি। ফিরে তাকিয়ে দেখি চন্দ দাঁড়িয়ে হাসছেন। জিজ্ঞেস করেন, ' কবে এলেন ?"

"পরশুদিন। কেমন আছেন ?"

"ভালই।"

"আর সবাই ? মাস্টারজীর কি খবর ? ভাবীজী কেমন আছেন ?"

"মাস্টারজী ?" কিএকটু ভেবেনেন তিনি। তার পর বলেন, "অনেকদিন যাওয়া হয়ে ওঠে নি। তবে যতদূর জানি ভালই আছেন মাস্টারজী। হ্যাঁ, বেশ আনন্দেই আছেন তিনি।"

"সেকি ? দাবার আড্ডা আজকাল আর বসে না ?"

"ঠিক বলতে পারব না ।নানা কারণে আমার যাওয়া হয় না।"

"চলুন না, আজ একবার ঘুরে আসবেন। ঘটনাচক্রে যখন থেকে যেতে হল কয়েকদিন, ভাবীজীর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। নইলে মাস্টারজী মনে দুঃখ পাবেন।"

"ভাবীজীর সঙ্গে দেখা না করলে মাস্টারজী দুঃখ পাবেন ?" চুপ করেন চন্দ, তার পর বলেন, "বেশ চলুন, মাস্টারের মনের পরিচয়ও পেয়ে আসি।"

দুজনে লাইব্রেরি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। রোদের ঝাঁজ অনেক কমে এসেছে।

মাস্টারজী মোরাদাবাদ জেলার লোক। বয়সে প্রবীণ কিন্তু চেহারায় যুবক। চোখ দুটি দেহের তুলনায় ছোট। ছোট ছোট চুল। প্রশস্ত ললাট। উন্নত নাসিকা। আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোককে রসহীন মনে হলেও তিনি বেশ রসিক। প্রথম স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর পিতার পীড়াপীড়িতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বাধ্য হন। সে আজ বহুদিনের কথা। দ্বিতীয়বার বিবাহের অনতিকাল পরেই তিনি ঋষিকেশে

পদার্পণ করেন। বয়সের দিক থেকে দুজনের পার্থক্য বছর পনেরো। রূপের দিক থেকে আরও বেশী। তা হলেও ভাবীজীকে কোনদিন অনুযোগ করতে শুনি নি। বেশ সুখেই আছেন তিনি। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে গোয়ালের কাজ সেরে, উঠানে গোবর-ছড়া দিয়ে প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক গঙ্গার বুকে আছাড় খেয়ে পড়ার আগেই গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরে আসেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে উনুন ধরিয়ে চা হাতে নিয়ে মাস্টারজীর ঘুম ভাঙান।

বেলা দশটার মধ্যে মাস্টারজী স্কুলে চলে যান। তার পরে সংসারের সব কাজ মিটিয়ে দুপুরের আগেই ভাবীজীকে মন্দিরে যেতে হয়। মাস্টারজী মন্দিরের কর্ম-কর্তাদের অন্যতম। মন্দিরের ঝামেলা মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে রোজই বেলা দুটো-আড়াইটে বেজে যায়। হিম-শীতল ডাল তরকারি দিয়ে খানদুয়েক চাপাটি চিবিয়ে আবার বিকেলের জলখাবার তৈরি করতে আসেন। কোনদিন পকোড়া, কোনদিন পরোটা বা কচুরি। শুধু মাস্টারজীর একার জন্য নয়। স্কুল থেকে মাস্টারজী বড় একা ফেরেন না। রোজই তিন-চারজন দাবার সঙ্গী সঙ্গে নিয়ে আসেন। সামনের ঘরে গদীর ওপরে দাবার আসর বসে। চীৎকার হতে থাকে—"কিস্তি"…"মাৎ"। আর রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে খুন্তির শব্দ।

দাবাখেলা আমার কোনদিনই ধাতে সয় না। নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে বড় একটা অংশগ্রহণ করতাম না। তবুও একখানি সোফার উপর চুপচাপ বসে থাকতাম। চোখ দুটি মাস্টারজীদের দিকে থাকলেও কান দুটো পড়ে থাকত বাড়ির ভেতরে ভাবীজীর আমন্ত্রণের অপেক্ষায়।

ও ঘরে মলের শব্দ শুনতে পেতাম। দেখা যেত রূপোর মলপরা দুখানা পা এগিয়ে এসে পরদার পেছনে থেমে গেছে। পরদাটা একটু সরে যেত। ভাবীজী ইশারায় ডাকতেন আমাকে। উঠে দাঁড়াতাম। ভাবীজীর হাত থেকে চা আর জলখাবারের থালা দুখানা নিতাম। ভাবীজী বলতেন, "তোমার খাবার কিন্তু এখানে নেই। তুমি রসুইখানাতে এসো।"

মাস্টারজী বলতেন, "যাও হে। তুমি দেখছি আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান। দাবা না খেলেই স্পেশাল। খেললে না-জানি কী হত।"

সে কথায় কান না দিয়ে ভাবীজী তাগিদ দিতেন, "এসো। ওদিকে আমার কড়া পুড়ে যাচ্ছে।"

ভাবীজীর পেছনে পেছনে এসে ঢুকতাম রান্নাঘরে। আগেই ঠিক করে রাখা চৌকিখানার ওপরে বসতাম। ভাবীজী জিজ্ঞেস করতেন আমার বাড়ির খবর। ওদের দেশ হলে আমি নাকি এরকম বাউণ্ডুলে হতে পারতাম না। আমাকে বিয়ে

করতে হত অনেক আগে। এত বেশী বয়সে বাঙালীরা যে কেন বিয়ে করে, বুঝতে পারেন না ভাবীজী। দেরাদুন জেলাতেই ভাবীজীর বাপের বাড়ি। ওদেশে ছেলে-মেয়েদের খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয় এখনও। ওদের মতে বিয়ে না করলে নাকি নরকবাস করতে হয়। কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমি বলেছিলাম, "তা হলে তো স্বামী বিবেকানন্দের ভাগ্যেও…"

মুখে হাত চাপা দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ছিঃ, তাঁর কথা তুলছ কেন? তিনি হলেন অবতার। ভগবান তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছেন।"

আর কোন যুক্তির অবতারণা করতাম না। ভাব দেখাতাম যেন হেরে গেছি। খুশি হয়ে আমার থালায় আরও কয়েকখানা পকোড়া তুলে দিতেন ভাবীজী।

এমনি নানান কথার মাঝে সেদিন অতর্কিতে উঠে গেলেন। একটু বাদেই ফিরে এলেন। হাতে একটা টর্চ। বললেন, "আচ্ছা দেখ তো এটা তোমার পছন্দ হয় কিনা?" প্রশ্ন করলেও উত্তর দেবার সময় দেন আমাকে। বলতে থাকেন, "আমার ভাইয়ের জন্য কিনেছিলাম। কিন্তু দেওয়া আর হয়ে উঠল না। অকাল-মৃত্যুর কঠিন আকর্ষণে সে চলে গেল আমাদের ছেড়ে। অন্ধকার রাতে রামলীলা দেখে ফিরছিল। গরমের দিন। আলো ছাড়া অন্ধকার রাতে চলাফেরা করা উচিত নয়। বহুদিন বাবা তাকে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তোমারই মত দুরন্ত ছিল সে। বাবার কথায় কান দেয় নি কোনদিন। হেসে বলেছে—'বাবার যত অদ্ভুত ভয়। গাঁয়ের ছেলে আমরা। আমাদেরও আলো নিয়ে পথ চলতে হবে?' রাক্ষুসীর ঠিক মাথার পাশে পা দিয়েছিল সে। এক ছোবলেই চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আর উঠতে পারে নি।" আর কিছু বলতে পারলেন না ভাবীজী। আমিও নির্বাক হয়ে রইলাম। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার জানা ছিল না। খানিক বাদে ডুবে শাড়িখানার আঁচলে চোখ মুছে অনুরোধ করেছিলেন, "এ টর্চটা আমাকে প্রতিমুহূর্তে ওর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিছুতেই বইতে পারি না সে জ্বালা। অথচ বহুযত্নে রেখে দিয়েছি, দেবার মত জনও পাই নি এতদিন। বয়সে সে তোমারই সমান ছিল। মাথায়ও তোমারই মত। মনে হচ্ছে তোমাকে দিতে পারলে আমার মন খুশি হবে। আমার আর কেই-বা আছে বল? কেদার-বদরী যাচ্ছ তুমি। তোমার কাজেও লাগবে। তুমি এটা নাও।" থামলেন তিনি। তারপর কি ভেবে আবার বললেন, "টর্চটা হারিও না কোনদিন। তোমার ভাবীজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দিও চিরকাল।"

টর্চটা আছে আমার সঙ্গে। গতবারে কেদার-বদরীর পথে ও আমার পরম সহায় হয়েছিল। এবারেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

বাস্তবে ফিরে এলাম চন্দের ডাকে। চন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "সেকি! ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? বাড়িটা ভুলে গেলেন নাকি এক বছরে?"

লজ্জা পেলাম। সত্যিই তো, মাস্টারজীর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছি আমরা। চন্দ কড়া নাড়তেই চাকর এসে দরজা খুলে দিল। গতবারে মাস্টারজীর বাড়িতে চাকর দেখি নি। জিজ্ঞেস করলে ভাবী বলতেন, "দুটি লোকের সংসারে চাকরের কি দরকার?" অবাক হলাম ভাবীজীর এই পরিবর্তনে। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবীজীর শরীর খারাপ নাকি? চাকর রাখার প্রয়োজন হয়েছে কেন? কিন্তু সে ভাব গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, "মাস্টারজী বাড়ি আছেন?"

ঘাড় নেড়ে ভিতরে চলে যাচ্ছিল সে। বোধ করি মাস্টারজীকে ডাকতে। বাধা দিয়ে বললাম, "শোন, তোমার মাইজীকেও বলো যে কলকাতা থেকে তাঁর বাঙালী ভাই এসেছে।"

চন্দ কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ভিতরে এসে বসলাম। ঘরখানি আগের চেয়ে অনেক শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। ফরাসটা এত নোংরা ছিল না। পেতলের ফুলদানিটাকে ওরকম ফুলহীন পড়ে থাকতে দেখি নি। চেয়ারের হাতলে এরকম চুনের দাগ ভাবীজীর আসবাবে আশা করা যায় না। ভাবীজীর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা আবার একটু চঞ্চল করে তুলল। জিজ্ঞেস করলাম চন্দকে, "ভাবীজী কেমন আছেন?"

চন্দ কেন জানি না অন্যমনস্ক ছিলেন। ঢোঁক গিলে জবাব দেন, "কে? ভাবীজী? ও মাস্টারজীর স্ত্রী! হ্যাঁ, ভালই আছেন আশা করি।"

আর কিছু বলার সুযোগ পেলাম না। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এ ঘরের দিকে আসছেন। মাস্টারজী ও ভাবীজী। আশ্চর্য হলাম, ভাবীজীর পায়ে মল নেই! হয়তো বা খুলে রেখেছেন। ভাবীজী আমাকে দেখে খুব খুশি হবেন। নিশ্চয় বলবেন, আমার চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। অঞ্জলির মত বাধা দিতে চাইবেন গোমুখী যাত্রায়। একটু চিন্তিত হলাম। অঞ্জলিকে যত সহজে নিবৃত্ত করতে পেরেছি, ভাবীজীকে অত সহজে সম্ভব হবে না।

পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মাস্টারজী সঙ্গে ঘোমটাহীনা বছর কুড়ি বয়সের একটি বিবাহিতা তরুণী। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, ভাবীজী কোথায়? কিন্তু চন্দ বাধা দিয়ে বললেন, "এই যে মাস্টারজী। বসুন ভাবীজী। আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় নেই। ইনি কলকাতায় থাকেন। বেড়াতে ভালবাসেন। গতবারে কেদার-

বদরী ঘুরে গেছেন। এবারে গোমুখী যাচ্ছেন।"

আমি যেন কালা হয়ে গেলাম। এ কি শুনছি! এ কে? চন্দই বা এই মেয়েটাকে ভাবীজী বলে ডাকছেন কেন? এ তো আমার ভাবীজী নয়। আমি তো এর সঙ্গে দেখা করতে আসি নি।

চন্দ আমার দিকে ফিরে বলছেন, "আঁপনিও এঁকে দেখেন নি। আপনার ভাবীজীর মৃত্যুর পরে ইনি আমাদের নতুন ভাবীজী হয়ে এসেছেন, আজ আট-ন মাস হল।"

কি বলছেন চন্দ! ভাবীজী মারা গেছেন! আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছে এক বছরেরও কম। আর মাস্টারজী তাঁর এই কন্যাসমা মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন আট-ন মাস! চন্দের ভাবীজীর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমার ভাবীজী নেই!

কোন রকমে মাস্টারজীর কয়েকটা মামুলী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে এলাম সে বাড়ি থেকে।

রাস্তায় নেমে দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। তার পরে জিজ্ঞেস করি, "এ মেয়েটিকে মাস্টারজী ভাবীজীর আসনে বসালেন কেমন করে?"

চন্দ কোন উত্তর দেন না। আবার খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তার পরে বলি, "আশ্চর্য, মেয়েটাই বা কেন ঐ বুড়োকে বিয়ে করতে রাজী হল!"

এবারে একটু শুষ্ক হাসি হেসে চন্দ জবাব দেন, "এ যুগে অর্থভোগ্যা নারী। মাস্টারজীর টাকাকে বিয়ে করেছে তাঁর ছাত্রী। আগে ওকে পড়াতেন মাস্টারজী, ভাবীজী ওর জন্যই মরেছেন।"

"মরেছেন!"

"হ্যাঁ। গায়ে স্পিরিট ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ভাবীজী।"

॥ নয় ॥

কড়া নাড়তেই বীণা এসে দরজা খুলে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে চুপি চুপি বলে, "প্রায় হয়ে এসেছে, শোবার ঘরে চলুন।"

"শোবার ঘরে রান্না হচ্ছে? কেন রান্নাঘর কি দোষ করল?"

"এখানে রান্নাঘর তো আর ঘরের সঙ্গে নয়, বাইরে। কে কখন এসে পড়বে, মহা বিপদ হবে তা হলে।"

বীণার সঙ্গে শোবার ঘরে এসে ঢুকি। সমস্ত জানালা বন্ধ। স্টোভে মাংস

ফুটছে। ঘরখানা গন্ধে ভরপুর। খালি গায়ে, হাতা হাতে, একটা চামড়া বাঁধাই মোড়ার উপর বসে আছেন ডাক্তার। খাটের উপর আমাদের বসতে বলে বীণা দরজা বন্ধ করে দেয়। হাসতে হাসতে বলি, "আপনারা কিন্তু একটু বেশী সাবধান হয়েছেন।"

ডাক্তার প্রতিবাদ করেন, "আপনি জানেন না এখানকার অবস্থা। বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এখনও অনেকে ঝামেলা বাধাবার পথ খুঁজছে। এ গন্ধ পেলে আর রক্ষে রাখবে না।"

ডাক্তার শেষ করলে বীণা যোগ করে, "নিরামিষাশী লোকের আবার ঘ্রাণশক্তি প্রবল।" হঠাৎ ডাক্তারের দিকে নজর পড়তেই চীৎকার করে ওঠে বীণা, "ও কি করছ তুমি?" এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে হাতাখানা ছিনিয়ে নেয়। আদেশের স্বরে বলে, "ওঠো শীগ্‌গিরি।"

"কেন, তুমিই তো বললে মাঝে মাঝে একটু নাড়তে হয়।"

"বলেছিলাম কারণ তখনও জানতাম না যে তুমি আমার সেই নির্দেশটা এত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করবে। আর নাড়তে হবে না। উঠে এসো তুমি।"

ডাক্তার অপরাধীর মত উঠে এসে আমার পাশে বসেন। তাঁর অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল। তা হলেও হাসি চেপে প্রশ্ন করি, "আপনার শাশুড়ী কোথায়?"

"যেখানে ছিলেন। অনেক বলেছি আমার এখানে এসে থাকতে। কিন্তু মা বা মেয়ে কেউই রাজী নয়।"

মাংসের হাঁড়িটা স্টোভ থেকে নামাতে নামাতে বীণা বলে, "কেন রাজী হব বলুন তো। মা সেখানে ভালই আছেন। দেশের লোকের সঙ্গে হেসে আর গল্প করে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনগুলো। আজকাল আর নিজ হাতে কোন কাজ করতে হয় না। শুধু তদারক করতে হয় ছাত্রের কাজের। কাপড়-চোপড় বা হাত-খরচ যখন যা দরকার, দিয়ে আসি।"

গম্ভীর হয়ে ডাক্তার বলেন, "আসল কথাটা বলছ না কেন? জামাইয়ের কাছে এসে থাকলে মা'র নাকি অসম্মান হয়।"

"হয়ই তো।" রেগে গেছে বীণা।

"জামাইয়ের বাড়িতে এসে থাকলে মায়ের অসম্মান হয়—কিন্তু মেয়ের তো দেখছি সম্মান বাড়ে।" ডাক্তারের কথায় আমি আর রঞ্জন হেসে ফেলি। ডাক্তার বলতে থাকেন, "সত্যি বলছি মশাই। সেই যে দেখে গেছেন ঘাড়ে এসে চেপেছে, একটি দিনের জন্যেও নামবার নামটি নেই।"

আমাদের আসন পাততে পাততে বীণা জবাব দেয়, "ঘাড়ে তোলবার জন্যে

কি রকম কোশিস্ করেছ তা কিন্তু ওনার অজানা নয়। আজও ঘাড় থেকে নামাতে চাইলে তুমি যে সিরিঞ্জ ছেড়ে চিমটা হাতে নেবে তাও উনি জানেন। কাজেই হে বাক্যবীর, সে কথা ছেড়ে এখন খেতে বসে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

বীণার জবাবে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ি আমরা দুজন। শেষের দিকে ডাক্তারও সে হাসিতে যোগ দেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত নটা বেজে গেল। হাসপাতালে একজন ওয়ার্ড-বয়ের সঙ্গে রঞ্জনকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিলাম। আমি আর ডাক্তার দুটো কাগজের ঠোঙায় হরিণের হাড়গুলো পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চন্দ্রভাগার দিকে।

জনবিরল পথ। দোকানপাট বেশীর ভাগই বন্ধ। শুধু দু-একটা দোকানের দরজার ফাঁক দিয়ে এক এক ঝলক আলো অনাহূতের মত রাস্তায় এসে পড়েছে। দোকানী দিনের হিসেব মেলাচ্ছে।

কংক্রীটের পুলের কাছে এসে পৌঁছলাম। এ জায়গাটা একেবারে নির্জন। পুলের ডান পাশ দিয়ে নদীর বুকে নেমে এলাম। রাস্তার আলোর শেষ নিশানা হারিয়ে ফেলেছি। পায়ের নীচে ছোট বড় অসংখ্য পাথর। অন্ধকারে কিছুই দেখছি না। ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি। ডাক্তার সাবধানে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। ডাক্তার আগে আমি পেছনে। অন্ধকারে দৈত্যের মত কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে। থমকে দাঁড়াই। ডাক্তার বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। হাঁক দিয়ে বলি, "ডাক্তারবাবু, ওটা কি?"

"চন্দ্রেশ্বরের মন্দির। বড় অদ্ভুত অবস্থান এই মন্দিরটার। রিভার-বেডের চেয়েও নীচে দাঁড়িয়ে আছে অথচ বর্ষার জল ওকে স্পর্শ করে না!"

"সে কি রকম?"

"চারিদিকে পাথরের একটা প্রাকৃতিক দেয়াল। মাঝখানে মন্দিরটি। দিনের বেলা এলে মনে হবে মন্দিরের একটা চূড়া নদীর বুকে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।"

মন্দিরকে ডান হাতে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। পায়ের স্পর্শ থেকে বুঝতে পারছি পাথরের আয়তন ছোট হয়েছে কিন্তু সংখ্যায় বেড়েছে। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে জোনাকির মেলা। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কয়েকটা আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ ধরে। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লে ওরা জেগে উঠে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোয়। যত দূর দৃষ্টি যায় জোনাকি-জলা অন্ধকার আর আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঋষি পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

ডাক্তার সহসা বলে উঠলেন, "এসে গেছি।"

"কোথায় ?"

"শ্মশানে।"

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ক্ষণেকের তরে আমাকে বিচলিত করে আবার মিলিয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই আঁতকে উঠি, "শ্মশানে ?"

"হ্যাঁ। ঋষিকেশের শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যদিও শ্মশান বলে সরকারী ভাবে কিছু নেই এখানে। সাধু-সন্ন্যাসীদের বাসভূমিতে শ্মশানের দরকারও হয় না বড় একটা।"

"কেন ?"

"সাধুদের মৃত্যুর হার আমাদের চাইতে অনেক কম। তা ছাড়া অনেকেরই সমাধি দেওয়া হয় নিজ নিজ আশ্রমে। তবু গৃহস্থের সংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটাই শ্মশানের অভাব মেটাচ্ছে। যে সব হতভাগ্যদের দাহ করার আনুষঙ্গিক জোটে না, তাদের প্রাণহীন দেহ ফেলে যাওয়া হয় এখানে। শেয়াল শকুনে কাড়াকাড়ি করে সঙ্গতি করে। দিনের বেলা হলে দেখতে পেতেন পাথরের সঙ্গে ওদেরও কিছু হাড় ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। হয়তো আমাদের পায়ের নীচেও পড়ে থাকবে দু-একখানা।"

চমকে সরে যাই আমি।

ডাক্তার বলেন, "লাভ নেই। কোথায় দাঁড়ালে হাড় মাড়াবেন না তা আমরা কেউই জানি না। যাক্, এবার হাড়গুলো ফেলে দিন এখানে। মানুষের অস্থির সঙ্গে মিশে যাক হরিণের অস্থি।"

অন্য সময় হলে প্রশ্ন করতাম মানুষের অস্থির সঙ্গে হরিণের অস্থির তফাত কি। কিন্তু এখন মনের অবস্থা অন্য রকম। নিঃশব্দে ডাক্তারের নির্দেশ পালন করি।

মাংসলোভী দুটি মানুষের এই অপকীর্তির সাক্ষী রইল এই শ্মশান আর এই অসংখ্য জোনাকির দল। সাক্ষী রইল আকাশের ঐ সপ্তর্ষি আর অন্তহীন আঁধারে মগ্ন পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকা ঐ ঋষির পাহাড়। যুগ যুগ ধরে ঋষিকেশের দিকে চেয়ে আছে সে। অনাগত যুগেও ঠিক এমনি করেই চেয়ে থাকবে।

কয়েকটা শেয়াল ডেকে উঠল। ডাক্তারের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিই। আশ্বাস দেন ডাক্তার, "ভয় নেই। মরা মানুষ ওদের কাছে যতই প্রিয় হোক, জ্যান্ত মানুষকে ভয় করে ওরা।"

মাংসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ পশুর চাইতেও প্রকট। অথচ যে দেহের জন্যে এই আকর্ষণ, সে দেহ কত মূল্যহীন হয়ে দেখা দেয় এক দিন। পুড়ে ছাই হয়। পঞ্চভূতে মিশে যায়। শেয়াল-শকুনে টানাটানি করে ছিঁড়ে খায়। আমরা যেমন

করে আজ শ্মশানে একটা হরিণের শেষ চিহ্ন মিশিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, তেমনি আমাদেরও শেষ চিহ্ন এই শ্মশানে মিলিয়ে যাবে এক দিন।

না। দেহ আর সেই দেহের লোভ-মোহ কামনা-বাসনার সমাধি শ্মশান। শ্মশান দেহকে পুড়িয়ে আত্মাকে দেহাতীত করে। শ্মশানই মানুষের সূতিকাগার। মৃত্যুই জন্ম—

'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিলো
তা'রা ম'রে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তা'রা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হয়ে উঠে আজকের মানুষের স্বরে…'

॥ দশ ॥

"দাদা!"

…ঘুম ভেঙে গেল আমার। রঞ্জনও উঠে বসেছে। বললাম, "ভেতরে আয়। দরজা খোলাই আছে।"

অর্জুনের সঙ্গে ঘরে ঢোকে অঞ্জলি। তখনও হাঁপাচ্ছে ওরা। ছুটতে ছুটতে এসেছে। অঞ্জলির অবিন্যস্ত ও অবাধ্য কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো বার বার মুখের উপর এসে পড়ছে। পরনে কমলা রঙের শাড়ি। হাতে একটা পুঁটুলি। অনুযোগ করে, "এখন ঘুম থেকে উঠছেন! শীগ্‌গির করুন! নইলে বাস পাবেন না।"

সত্যিই দেরি হয়ে গেছে। কাল অনেক রাত করে শুয়েছি।

রঞ্জন আমাকে তাড়া দিয়ে বলে, "তুমি চট্ করে স্নান সেরে এস। আমি এদিকে গুছিয়ে নিচ্ছি। তুমি এলে যাব।"

অঞ্জলি বলে ওঠে, "কি কি নেবেন আর কেমন করে গোছাতে হবে বলে দিন। আমরা দুজনে ঠিক করে দিচ্ছি। সময় নষ্ট না করে আপনারা দুজনেই স্নান করে আসুন।"

জানি প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না। রঞ্জনকে সব বুঝিয়ে দিতে বলে কুয়ো-পাড়ের দিকে পা বাড়াই।

ফিরে এসে দেখি বাঁধা-ছাঁদা শেষ। সাধুবাবা ও সাধুমা এসে গেছেন। আমাদের তৈরি হতে হতে, চা আর হালুয়া নিয়ে হাজির হলেন সাধুদি। লজ্জা পেয়ে বলি, "এত সকালে আবার এ সব ঝামেলা করলেন কেন? আমরা তো বাস-স্ট্যাণ্ডেই চা খেয়ে নিতে পারতাম।"

আমার কথায় কান না দিয়ে সাধুদি বলেন, "চা খাবার আগে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে এস।"

বিছানাটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অর্জুন ধমক দেয়, "আপনি লিতেছেন কেন। হামাকে দিন।" বিছানা মানে পাঁচখানা কম্বল ও একটা শতরঞ্জি। ওজন নেহাৎ কম নয়। অক্লেশে সেটাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে, ছড়ি দোলাতে দোলাতে অর্জুন আদেশ করে, "চলিয়ে।"

আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন টুরিস্ট অফিসার। বলেন, "তাড়াতাড়ি আসুন। বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। ড্রাইভারের পাশে মাত্র দুটো সীট। এখনও বসতে দিই নি কাউকে। তবে অনেকেই চেষ্টা করছে দখল করতে।" এক রকম টানতে টানতে এনে আমাদের সীটে বসিয়ে দেন।

মালপত্র ওপরে তুলে দিল অর্জুন। কোথায় কিভাবে সব রেখেছে বুঝিয়ে দিল। অঞ্জলি এসে পাশে বসে সাবধান করতে থাকে, "ক্যামেরা, দুরবীন আর জলের বোতল হাতছাড়া করবেন না। টাকা পয়সা সব সময় কোমরে রাখবেন। এমন কি ঘুমোবার সময়ও।" ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। অঞ্জলি আবার বলে, "ব্যাগ দুটো ছাদে রেখে দিয়েছে। নীল ব্যাগটার ওপরের দিকে একটা পুঁটুলির মধ্যে লাড্ডু আর পুরী-তরকারী আছে। ধরাসুতে খেয়ে নিতে ভুলে যাবেন না যেন।"

হঠাৎ রঞ্জন বলে ওঠে, "কুমার, ঐ যে ডাক্তারবাবু ও তাঁর স্ত্রী আসছেন।"

সস্ত্রীক সাইকেলে চেপে ডাক্তার এসে পড়লেন। বীণার হাতে সাইকেলটা দিয়ে ডাক্তার আমার কাছে এগিয়ে এলেন। একটা বিস্কুটের টিন আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কয়েকটি ওষুধ, কিছু ব্যাণ্ডেজ ও তুলো আছে। রাস্তায় কাজে আসবে।"

"নিশ্চয়ই। আমি কাল একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আপনাকে বলতে।"

সযত্নে টিনটা রেখে দিলাম কাছে। ডাক্তারের নজর পড়ে অঞ্জলির দিকে। মুখে কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলেন, "এ মেয়েটা বাসে চেপে বসেছে কেন? ওকেও কি গোমুখী নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?"

অঞ্জলি সে কথা গায়ে না মেখে অতর্কিতে প্রশ্ন করে, "ডাক্তারদা, বৌদি সাইকেলের পেছন থেকে পড়ে যান না ?"

"আমার পেছন থেকে পড়ে যায় নি কোন দিন। অন্য কারও পেছন থেকে পড়ে থাকবে হয়তো।"

বীণা খানিকটা দূরে সাধুদির সঙ্গে কথা বলছে। ডাক্তার নিরাপদ।

অঞ্জলি বলে, "বৌদি বুঝি অনেকের সাইকেলের পেছনেই চড়েন।"

"তা চড়ে বৈকি। সুযোগ পেলেই চড়ে।"

বীণা এখনও দূরে দাঁড়িয়ে। তা হলে ডাক্তারকেও সে চড়িয়ে দিত।

"আমাকে পেছনে চড়তে শেখাবেন ডাক্তারদা ?"

"কিন্তু অর্জুন কি সাইকেল চড়তে জানে ?"

ঘাড় নেড়ে অঞ্জলি বলে, "জানে তবে পেছনে চড়ায় না। বলে পড়ে যাবে।"

"অর্জুনের যখন আপত্তি তখন আমি তোকে পেছনে চড়াই কি করে ? তবে দেখি, অর্জুনকে বলে-কয়ে যদি রাজী করাতে পারি।"

"ওকে বলার কি আছে ? ও যা বলবে তাই আমাকে করতে হবে নাকি ?" অঞ্জলির কণ্ঠে বিদ্রোহ।

ড্রাইভারের সহকারীর আকস্মিক আবির্ভাবে ডাক্তারকে সরে দাঁড়াতে হয়। আর কিছু বলতে পারেন না অঞ্জলিকে। সহকারী দরজা খুলে হ্যাণ্ডেল নিয়ে যায়। ড্রাইভার গাড়িতে উঠে বসে। ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে দেখি যাত্রাক্ষণ সমাগত। অঞ্জলিও বুঝতে পারে এবারে ওকে নামতে হবে। সহসা স্থির হয়ে যায় চঞ্চল মেয়েটা। আমার একখানা হাত দু হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলে, "সেই কথাটা মনে আছে তো ?"

"কোন্ কথা ?"

"সেই যে বলেছিলাম।" অঞ্জলির কণ্ঠস্বরে প্রার্থনার কাকুতি, "গোমুখী যাবেন না। গাঙ্গোত্রী থেকে ফিরে আসবেন।"

কি বলব ওকে ? কেমন করে বোঝাব এ অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়। চুপ করে থাকতে দেখে আমার হাত ছেড়ে দেয় অঞ্জলি। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে, "দাদা আমার কথা শুনবে না জানি। কিন্তু আপনি ? আপনি তো দাদার মত অশান্ত নন। আপনি আমাকে কথা দিন, আপনারা গোমুখী যাবেন না। গঙ্গোত্রী থেকে ফিরে আসবেন।"

সান্ত্বনার সুরে রঞ্জন বলে, "বড় আশা করে আমরা এসেছি বোন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার দাদাকে ফিরিয়ে আনব তোমার কাছে।"

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। আমাদের মনে করিয়ে দেয় চোখের জলের পালা সংক্ষেপ করতে হবে। বাস থেকে নেমে যায় অঞ্জলি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে আমাদের। ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠকে প্রাণপণ শক্তিতে সংযত করে বলতে থাকে, "বেশ। 'না' বলে আপনাদের অমঙ্গল ডেকে আনব না। অন্তর্যামী জানলেন আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিই নি। তিনি যেন আপনাদের দেখেন। ফিরিয়ে আনেন ভালোয় ভালোর। সোয়া সের দুধ দিয়ে গন্ধশেশ্বর শিবকে স্নান করাব আমি।"

বীণাও এসে অঞ্জলির পাশে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন সাধুদি ও সাধুবাবা জানালার কাছে এগিয়ে এসেছেন। অঞ্জলিকে একটু সরিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার। স্টার্টারের বাঁশির শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে যাত্রীদল মাতৃবন্দনা করে উঠে, "গঙ্গা মায়ীকি জয়।" এক বার দু বার তিন বার। সংসারের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হবার মহামন্ত্র। বৃহত্তর আ◌়র্ষণে ধরা পড়েছি আমরা। জননী জাহ্নবী স্মরণ করেছেন আপন বাহুমধ্যে। পুণ্যসলিলা গঙ্গা আমাদের পেতে চান তাঁর কোলে একান্ত আপন করে। হাজার হাজার বছর ধরে অকৃপণ হাতে তিনি আমাদের দান করে চলেছেন। বন্ধুর গিরি-পর্বত অতিক্রম করে তিনি এসেছেন নেমে, আমার জন্মভূমির প্রাণধারা বয়ে, কোটি কোটি সগর-বংশ-ধরের মুক্তিদাত্রী হয়ে। আমি তাঁর আবাহনকে অবহেলা করব? গঙ্গোত্রী থেকে পালিয়ে আসব?

ড্রাইভার গিয়ার বদল করে এক্সিলেটারে চাপ দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাস চলতে শুরু করল। সজল চোখে পেছনে পড়ে রইল অঞ্জলি, সাধুদি, বীণা। পড়ে রইল অর্জুন ডাক্তার আর সাধুবাবা। পড়ে রইল গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে সঞ্জীবিত, কপিল মুনির শাপমুক্ত, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মর্তভূমির কোটি কোটি মানুষ।

॥ এগারো ॥

অতি পরিচিত পথ। এ ক'দিনেও কতবার যাতায়াত করেছি। ঐ তো ভরত মন্দির। কাল রাতের সেই পাথুরে নদী। সেই পুল পেরিয়ে মুনি-কি-রেতি। কিন্তু আর নয়। এবার থামতে হল। রাস্তা বন্ধ।

একখানা শালবল্লী কাঠগড়ার ওপর মাথা রেখে রাস্তা বন্ধ করে শুয়ে আছে। শালবল্লী এখানকার চেক-পোস্টের প্রচারপত্র। পাথুরে নদী দেরাদুন ও টিহরী জেলার সীমারেখা। আমাদের বাস ঋষিকেশ থেকে রওনা হয়ে চার-পাঁচ মিনিটে মুনি-কি-রেতি পৌঁছেছে। দেরাদুন জেলা পেরিয়ে টিহরী জেলায় প্রবেশ করেছে।

আগের দিন হলে বলতাম বৃটিশ ভারত ছাড়িয়ে টিহরী রাজ্যে ঢুকেছে। ১৯৪৯ সাল থেকে টিহরী উত্তর প্রদেশের ৫০তম জেলায় পরিণত।

বাস থেকে নামতে হল। 'সুই' অর্থাৎ টি এ বি সি ইঞ্জেকশন নিতে হবে আমাদের। আর বাস-কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে চুঙ্গি বা অকট্রয় ডিউটি। বাঁ দিকে একটা ছোট ঘরে চুঙ্গি অফিস। ডান দিকে ডজন খানেক সেপাই নিয়ে গ্লুকোস্ মার্কা সিরিঞ্জ হাতে বসে আছেন কম্পাউণ্ডার। পাশে পরচা মানে সার্টি-ফিকেট লেখার জন্য তাঁর সহকারী। সামনে একটা রং-চটা কাঠের টেবিল। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটা চিৎকার কানে এল, "হেই, উধার কাহাঁ ভাগ্‌তা হায়?"

"ভাগ্‌তা নেহী। জ্যরা ম্যয়দান হোকর আতা হুঁ।"

"জলদী কাম্ খতম্ করো। সুই লেনা হোগা। বচনে কো ফিকির মৎ করো।"

তাকিয়ে দেখি একজন রাজস্থানী তরুণ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একজন সেপাই গোয়েন্দাসুলভ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছে। গতবারেও দেখেছি রাজস্থানীরা তীর্থদর্শনে যেমন সব চেয়ে বেশি আগ্রহশীল, সুই নিতে তেমনি একে-বারেই নারাজ। সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়। ফাঁকি ধরবার জন্যে এই সেপাইদের সমাবেশ। তারা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে আমাদের এই উনত্রিশ জন যাত্রীকে চোখে চোখে রাখছে। বাসে আসন সংখ্যা তিরিশ। একজন ঋষিকেশ থেকে ওঠেন নি। হয়তো এখান থেকে চড়বেন। মুনি-কি-রেতি বা লছমনঝুলার কাছাকাছি যাদের বাস, তারা এখান থেকেই বাসে চাপেন। অনেক সময় বাঁচে। বাস এখানে তিরিশ-চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে। সীট রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা থাকায় অসুবিধা নেই

এক এক করে আমাদের 'সুই' নেয়া হয়ে গেল। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক দেখলাম যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এ লাইনে। কাউকে ভরসা দিলেন, "কোন ভয় নেই। সামান্য একটু ব্যথা হবে। ধরাসুতে বাস থেকে নামবার আগেই দেখবেন যে ব্যথা কমে গেছে।" কাউকে বোঝালেন, "পথে মাছি ভন্ ভন্ করা নোংরা খাবার খেতে হবে। বেমারী না হওয়াই তাজ্জব কী বাত! অথচ বেমারী হলে দেখবার লোক নেই, ওষুধ নেই, পথ্য নেই। সামান্য একটু ব্যথা আর বোখারের ভয়ে এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিয়ে যাবেন?" কেউ বা তাঁর সুইয়ের আকৃতি দেখে অথবা পূর্ববর্তী যাত্রীর কান্না শুনে ছুটে পালাতে চায়। কম্পাউণ্ডার কমাণ্ড করেন, "পাকড়ো উস্‌কো।" সে আদেশ শিরোধার্য করে সেপাইরা। বন্দী হয়ে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানায় যাত্রীটি, "সুই মাত্ ভোকিয়ে ভাগ্‌দার

সাহাব্। মর্ যায়গা। মর্ যায়গা।" ডাক্তারীতে প্রোমোশন পেয়েও নরম হন না কম্পাউণ্ডার। কোন দয়া প্রদর্শন না করে নির্দয় ভাবে সুইটার সদ্ব্যবহার করতে করতে বলেন, "মর্ যায়গা! আরে ভাইয়া ইয়ে সুই কা ইন্তেজাম্ তো শিফ্ মরনেসে বাঁচানেকে লিয়ে।"

সহকারী পরচা দিলেন। পথে দরকার হবে এই পরচার। অনেকে দেখলাম পাগড়ির ভাঁজে গুঁজে শিরোধার্য করল এই অমূল্য বস্তুটি। আমাদের পাগড়ি নেই। স্থান পেল রঞ্জনের বুকে—মানিব্যাগের মধ্যে।

সবাই এসে বাসে উঠলাম। দুজন সেপাই গুনতে লাগল যাত্রীদের। কম্পাউণ্ডার গুনে ফেললেন পরচার কাউণ্টারপার্ট। আশ্চর্য! যাত্রীসংখ্যা উনত্রিশ অথচ পরচা লেখা হয়েছে আটাশখানা। একজন সেপাই ঘোষণা করে, "কে সুই নেন নি বলুন। সকলের সুই না নেয়া হলে আমরা গাড়ি ছাড়তে দেব না।"

কম্পাউণ্ডারের চিৎকার কানে ভেসে আসে, "মিল্ গিয়া। আইয়ে আব্, জলদি কিজিয়ে।"

তাকিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক রিক্শা থেকে নামছেন। কণ্ডাক্টার তাঁর মালপত্র বাসের ওপরে তুলে দিল। পরচাখানা ভাঁজ করতে করতে ভদ্রলোক তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। যাত্রীরা সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সুই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এবারে বাস ছাড়বে। সেপাইরা আবার গুনতে শুরু করে "এক দো তিন···"

গুনুক গে। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। আর আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।

গুনে চলেছে সেপাইরা, "···ঠাইশ্ উনতিশ তিশ্।"

সেপাইদের দিকে ফিরে তাকাই। সে কি? একটু আগে যাত্রীসংখ্যা উনত্রিশ ছিল, এখন তিরিশ হয়েছে? ভেবে দেখি ঠিকই হয়েছে। তাই তো হবে। এ ভদ্রলোক তো হৃষিকেশ থেকে ওঠেন নি। তা হলে তো সমস্যার সমাধান হয় নি। রূপ পাল্টেছে মাত্র। আঠাশ-উনত্রিশ সমস্যা, উনত্রিশ-তিরিশ সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকাই। পঞ্চাশ মিনিট হল বাস এখানে আটকে আছে। বিরক্ত বোধ করছি।

খোদ কম্পাউণ্ডার এসে বাসে উঠলেন এবারে। এক এক করে যাত্রীদের পরচা পরীক্ষা করতে লাগলেন। ক্রমাগত গজ্রাতে লাগলেন ফাঁকিবাজটির উদ্দেশ্যে। একজন আধবয়েসী রাজস্থানীর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কানে পৈতে কেন?"

"জী।" ঢোক গেলে লোকটি, "জী জ্যরা ময়দান গয়া থা।"

"কব ?"

"জী। আব্‌ভি। নেহি। আব্‌ভি নেহি। থোড়া আগাড়ী।" লোকটির উত্তর আর কণ্ঠস্বরে সকলেই তার দিকে তাকায়।

কম্পাউণ্ডার বলেন, "আপ্‌নে সুই লিয়া।"

"সুই ? জী। হাঁ।"

"আপ্‌কা পরচা নিকালিয়ে।"

কান্নার শব্দে চমকে উঠি। রাজস্থানীটি কাঁদতে কাঁদতে বলে, "পয়ের লাগি ভাগ্‌দার সাহাব। হামে ছোড় দিজিয়ে। সুই দেনেসে আদমী মর যাত্‌হ। খাবার চীজ ছুঁয়ব না হাম্‌। কুছ না হোই হামে।"

"নিকাল দিজিয়ে উস্‌কো। ঝুঠা কাহিকা।" কম্পাউণ্ডার কিছু বলবার আগেই কয়েকজন যাত্রী ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছেন। কম্পাউণ্ডার নেমে যান, সুই আনতে। রাজস্থানী যাত্রীরা তাকে বোঝাতে শুরু করে সুই-মাহাত্ম্য। পার্শ্ববর্তী যাত্রীদের দৈহিক সাহায্যবলে কর্তব্য সম্পাদন করেন কম্পাউণ্ডার। কাত্‌রাতে থাকে লোকটি। কাত্‌রানির সে শব্দকে ছাপিয়ে বাসের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। যাত্রীদল জয়ধ্বনি করে, "গঙ্গা মায়ী কি জয়।" নিজের অজ্ঞাতসারে আমিও কণ্ঠ মেলাই ওদের সঙ্গে। সব চেয়ে আশ্চর্যের এই যে 'ঝুঠা কাহিকা'র ঠোঁট দুটোও যেন একবার নড়ে উঠল।

বাস এগিয়ে চলেছে নরেন্দ্রনগরের দিকে। টিহরীর বর্তমান রাজাহীন রাজার স্বর্গীয় পিতা নরেন্দ্র শাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই নগর। গ্রীষ্মকালটা যদিও তিনি চার হাজার ফুট উঁচু প্রতাপনগরেই কাটাতেন, তবুও নরেন্দ্রনগরই ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। টিহরী থেকে এখানে এসে বাস করার পরোক্ষ কারণ যা-ই হোক নরেন্দ্র-নগরকে সর্বতোভাবে নগরে পরিণত করায় কোন কার্পণ্য করেন নি তিনি। বাড়ি-ঘর আপিস-আদালত বাজার-পার্ক সব কিছুই ছবির মত। এমন-কি এই রাস্তাটা। পিচঢালা মসৃণ সর্পিল পথ। এত চওড়া পাহাড়ী রাস্তা এ অঞ্চলে আর নেই। খাসিয়া গড়াধিপতিদের কেউ যদি স্বর্গ থেকে মুখ বাড়িয়ে নরেন্দ্রনগরের দিকে তাকিয়ে দেখেন কোনদিন, তাঁরা তাঁদের হৃতরাজ্যের উন্নতি দেখে পরাজয়ের দুঃখ যাবেন ভুলে। গর্বে তাঁদের বুক উঠবে ভরে। গড়াধিপতিদের কেউ নেই আজ, কিন্তু গাড়োয়াল (বা গড়োয়াল) নামের মধ্যে গড় শব্দটি বেঁচে থাকবে চিরকাল।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। আসামের খাসিয়ারা এসে রাজ্য স্থাপন করলেন এদেশে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের কিন্তু নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে দিল না।

বিদ্রোহ লেগেই রইল সব সময়। নিরাপত্তার জন্যে উঁচু উঁচু জায়গা বেছে বাহান্নটি গড় স্থাপন করলেন খাসিয়ারা। কিন্তু তাতেও নিরাপদ হলেন না। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন করে শান্তিতে রাজত্ব করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা আস্তে আস্তে স্থানীয় জনসমাজের মধ্যে মিশে গেলেন। তাহলেও গড়ের ভগ্নাবশেষের মত খাসিয়া সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা এখনও বেঁচে আছে এ অঞ্চলে। গাড়োয়ালে এখনও ভূত প্রেত উফ্‌রাই্‌ নিরংকার বড়াদেও মুণ্ডন মাসু ভরাড়ী এরাডী ইত্যাদি খাসিয়া দেব-দেবীর পূজো হয়।

খাসিয়াদের সময় বৌদ্ধমত প্রবল হয়ে উঠেছিল এখানে। বুদ্ধগয়া ও সারনাথের পুরনো মন্দিরের রচনাশৈলীর প্রভাব এ অঞ্চলের মন্দিরে বর্তমান। কেদারনাথের মন্দির তো বৌদ্ধমন্দিরই ছিল। মন্দিরের দরজার ওপর বাইরের দিকে বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে একখানা চিত্র খোদাই করা ছিল। শঙ্করাচার্য অশ্লীল মনে করে সেই চিত্রটিকে নষ্ট করে ফেলেন। বদ্রীনাথের মূর্তিকে বৌদ্ধরা মনে করেন বুদ্ধাবতার, জৈনরা পরেশনাথ আর হিন্দুরা নারায়ণ। গাড়োয়ালে অনেক ভাঙা মন্দির ও শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। খাসিয়া আমলে বৌদ্ধরা নাকি এই সব মন্দির ভেঙে ফেলেছে।

তার পর শঙ্করাচার্য এসে বৈদিক মতে দীক্ষা দিলেন বৌদ্ধদের। কেদার-বদ্রীর মন্দিরকে হিন্দু মন্দির বলে ঘোষণা করলেন। যোশীমঠে মঠ স্থাপন করলেন। সমতলভূমি থেকে দলে দলে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় এসে বাস করতে শুরু করলেন গাড়োয়ালে। তীর্থযাত্রাও আরম্ভ হয়ে গেল।

অনার্য খাসিয়াদের অধীনতা স্বীকার করতে সম্মানে বাধল আর্য ক্ষত্রিয়দের। যুদ্ধ লেগে গেল। ক্ষত্রিয়রা চাঁদপুর গড় দখল করে নিলেন। কয়েক পুরুষ পরে রাজা হলেন সোমপাল। তিনি রাধানগরের কনকপালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। কনকপাল সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন। রাজা সোমপাল ছিলেন পুত্রহীন। ৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কনকপাল পনেরোটি গ্রামসহ এই গড়ের মালিক হলেন। তিনিই টিহরীর বর্তমান পাংওয়ার রাজবংশের মূল পুরুষ।

কনকপাল ছিলেন অতি কুশলী রাজনীতিবিদ। গড়াধিপতিদের সঙ্গে মিত্রতা করে ওদের মধ্যেই লড়াই বাধিয়ে দিতেন। এই সময় কুমায়ুনের কাত্যুরী সর্দাররা খাসিয়া গড়াধীশকে পরাজিত করে যোশীমঠ দখল করে নিল। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জাদুকরের মত ক্ষত্রিয় ও খাসিয়াদের একত্রিত করে কাত্যুরীদের আক্রমণ করলেন কনকপাল। পুনরুদ্ধার করে যোশীমঠ ফিরিয়ে দিলেন প্রাক্তন গড়াধীশ-দের। উদ্দেশ্য সফল হল। অনেকেই তাঁকে মুখ্য মেনে কর দিতে শুরু করল। মুখ্য

মানল না চন্দ্রাপুরীর কাছে কাণ্ডারাগড়। কাণ্ডারী সর্দ্দারকে তার সেনাপতি ফেণ্ড আশ্বাস দিল যে কনকপাল স্রেফ কচু-কাটা হয়ে যাবে। তলোয়ার দিয়ে একটা কলাগাছ কেটে সে নমুনাটাও দেখিয়ে দিল। ফেণ্ডর বহ্বাড়ম্বর নিয়ে এ অঞ্চলে এখনও প্রবাদ প্রচলিত আছে—'কাণ্ডারী কে পায়েক, ফেণ্ড কে নায়ক।' সসৈন্যে কাণ্ডারগড় অবরোধ করলেন কনকপাল। ফেণ্ডর চেলারা টিকতে না পেরে খানিকক্ষণের মধ্যেই মন্দিরা বাজিয়ে কনকপালের জয়গান শুরু করে দিল। সে আমলে সাদা পতাকার প্রচলন হয় নি। কাণ্ডারী সর্দার মন্দাকিনীতে ঝাঁপ দিলেন। চাঁদপুর গড় ও পনেরোটি গ্রাম থেকে সমস্ত উত্তর গাড়োয়ালের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল কনকপালের। রাজ্যের নাম হল কেদারখণ্ড।

চাঁদপুরগড় রাজ্যের একপাশে হওয়ায় ৩৭তম বংশধর অজয়পাল দেবলগড়ে রাজধানী সরিয়ে আনলেন। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না দেখে শ্রীনগরে নতুন রাজধানী পত্তন করে দক্ষিণ দিকে নজর দিলেন। প্রথমেই বিতাড়িত করলেন ক্ষত্রিয় সর্দার রুহেলাকে। ভয়ে দক্ষিণ গাড়োয়ালের গড়াধীশরাও কর দিতে শুরু করল। রাজ্যসীমা দেরাদুন পর্যন্ত বিস্তৃত হল। রাজ্যের নতুন নাম হল গাড়োয়াল।

কিন্তু নতিস্বীকার করলেন না উপুগড়ের যুবক সর্দার কফ্‌ফু। বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে অজয়পাল উপুগড় অবরোধ করলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কফ্‌ফু যে ভাবে অজয়পালের সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে লাগলেন তা কেবল শিবাজী ও নেপোলিয়ানের রণকৌশলের সঙ্গেই তুলনীয়। তবু নিয়তির নির্মম বিধানে কফ্‌ফুকেই পরাজিত হতে হল।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে কফ্‌ফুকে অজয়পালের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ভুল ভাবল উপুগড়ের দ্বাররক্ষক দেবু। আর তার দেওয়া ভুল খবর শুনেই কফ্‌ফুর মা গড়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। মেয়েদের নিয়ে জহরব্রত পালন করলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হওয়ায় অজয়পালের সৈন্যরা নতুন উৎসাহে আক্রমণ করে বিস্মিত কফ্‌ফুকে বন্দী করল। আহত কফ্‌ফুকে অজয়পালের দরবারে হাজির করা হল।

অজয়পাল বললেন—তুমি বীর। কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার। তোমার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কি করবে, সবই ভগবানের ইচ্ছা। আশা করি এবারে তুমি আমার অধীনতা স্বীকার করবে। ছোট গড়ধীশ হলেও তোমাকে আমি বড় গড়াধীশের সম্মান দেব।

হেসে উত্তর দিলেন কফ্‌ফু—রাজা, স্বাধীনতা হারিয়ে আপনার ভিক্ষা দেওয়া সম্মানে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

—বীর, তুমি ভুল করছ। তুমি যে এখন সর্বহারা। মাথা নত করে আমার দান গ্রহণ করা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই তোমার।

বীর মস্তক আন্দোলিত করে বীর উত্তর দিলেন—এ শির কোন দিন নত করি নি। আজও করব না।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন অজয়পাল—এত দম্ভ তোর? ঐ শির তোকে নত করতেই হবে।

জল্লাদের দিকে তাকালেন রাজা। মুহূর্তের মধ্যে বীরের চির-উন্নত শির রাজা অজয়পালের দরবারকক্ষের গালিচার ওপর ছিটকে পড়ল। উষ্ণ রক্তে অজয়পালের মণিমুক্তাখচিত রাজপোশাক সিক্ত হয়ে গেল। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। উঠে দাঁড়ালেন অন্যান্য গড়াধীশ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী। নতমস্তকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন অজয়পাল—বীর কফ্‌ফু, তোমারই জয় হল। জীবন দিয়ে পরাজিত করে গেলে আমাকে।

॥ বারো ॥

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা নরেন্দ্রনগরে এসে পৌঁছলাম। ঋষিকেশ থেকে দশ মাইল, কিন্তু সুইয়ের কল্যাণে আমাদের দেড়ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছে। বাসস্ট্যাণ্ড ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নরেন্দ্রনগরের প্রাণকেন্দ্র। বাজার ডাকবাংলো কাছারী হাসপাতাল থানা পার্ক পোস্টাফিস—সবই মোটামুটি কাছাকাছি। রাজপ্রাসাদটি একটু দূরে, অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে একটি উঁচু টিলার ওপরে। নরেন্দ্রনগরের পরে আমাদের রাস্তা সঙ্কীর্ণতর হয়ে যাবে। সে রাস্তায় পাশাপাশি দুখানা বাস চলতে পারে না। বাসস্ট্যাণ্ডটা বেশ বড়। অনেকটা জায়গাকে সমতল করা হয়েছে। বাঁ দিকে অর্ধবৃত্তাকারে চা ও জলখাবারের দোকান। ডান দিকটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গেছে। চায়ের দোকানগুলোর পরেই দোতলা একটা বাড়ি—সরকারী কর্মচারীদের ব্যাচেলার্‌স্ কোয়ার্টার। ওরই একখানা ঘরে বিজয়লাল থাকে। বাস এখানে কুড়ি মিনিট দাঁড়াবে। এই অবসরে একবার বিজয়লালের সঙ্গে দেখা করে এলে হত। এবারে আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। খুশি হবে আমাকে দেখলে। এখানকার এক সরকারী অফিসে কাজ করে সে। আগে মাঝে মাঝে ঋষিকেশ যেত। কিছু দিন থেকে নাকি আর যায় না। হয়তো কাজকর্মের ভিড়ে পেরে ওঠে না।

ঐ তো সেই কল। পাহাড়ের কোলে বিজয়লালের ঘরের প্রায় উল্টো দিকে

আজও তেমনি তৃষ্ণা মেটাচ্ছে—শুধু পথচারীদের নয়, পথের ধারে যারা বাসা বেঁধেছে তাদেরও। বিজয়লালের তৃষ্ণা মেটাত পাহাড়ী কিশোরী সুতারু। প্রতি ঊষা আর গোধূলিতে ঘড়া মাথায় জল নিতে আসত সে। বিজয়লালের সঙ্গে একদিন তার শুভদৃষ্টি হল। সেই হতে প্রতিদিন জল ভয়তে ভরতে সুতারু তাকিয়ে থাকত বিজয়লালের রুদ্ধদ্বারে। তৃষ্ণা মেটাবার তৃষ্ণা তার দু চোখের মণি থেকে ঠিকরে পড়ত। দ্বার উন্মুক্ত হত। ঘড়া ভরে উঠবার আগেই বিজয়লাল বেরিয়ে আসত কলতলায়। ঝরণার মত উচ্ছল হয়ে উঠত সুতারু। ঘড়া থেকে সযত্নে জল ঢেলে দিত বিজয়লালের আঁজলা-করা হাতে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটাত বিজয়লাল। সার্থক হত সুতারুর জলভরা।

বাস থেকে নামলাম। একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসল রঞ্জন। জোরে জোরে হেঁটে চললাম বিজয়লালের ঘরের দিকে। তালা বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি তো অফিসে যায় নি। হয়তো কাছাকাছি কোথাও আছে। পাশের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করছেন। বিজয়লাল কোথায় জানেন কি না জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক বিগ্‌ড়ে গেলেন। বললেন, "জানলে তো পুলিসের কাছেই বলে দিতাম।"

পুলিস? বিজয়লালের খবর নিয়ে পুলিশ কি করবে? তবে কি সে ফেরারী! কিন্তু কেন? অফিসের ক্যাশ গোলমাল করেছে?

ভদ্রলোকের খিঁচুনি নীরবে হজম করে বললাম, "দেখুন আমি কলকাতা থেকে আসছি। সে কি এখানে নেই?"

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন একবার। তার পর বললেন, "বিজয়লালের খোঁজে এসেছেন? একথা আর কাউকে বলবেন না। তা হলে আপনাকেও পুলিসের নজরে পড়তে হবে। পাঁচ-ছ'দিন হল সুতারু নামে একটি নাবালিকা পাহাড়ী মেয়েকে নিয়ে বিজয় পালিয়েছে।"

চোখের সামনে ভেসে ওঠে গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় দেখা সেই ছবি। ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে আঁজলা-করা হাতে পড়ছে। তৃষিত তরুণের মনে বারি সিঞ্চন করছে প্রেমময়ী সুতারু। অনাদি কাল থেকে চলে এসেছে এই আদান-প্রদান। যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে ছড়িয়ে পড়েছে পরিবর্তিত রূপে। সেকালের বিজয়কে পালিয়ে বাঁচতে হত না। ধনুঃশর খড়্গ গদা শূল চক্র তার সম্বল ছিল। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ সাহায্য করতেন তাকে। একালের অর্জুনেরা আইনের প্যাঁচে অস্ত্রহীন। এ যুগের সুভদ্রাদের হাত ধরে তাই তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় পুলিসের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে।

বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম ধীর পদক্ষেপে। দেখি রঞ্জন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখে রঞ্জন বলে, "ইনি হচ্ছেন এখানকার মেডিক্যাল অফিসার। হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল।"

আমি কিছু বলার আগেই ডাক্তার হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ইস্, কুড়ি মিনিটের ছ মিনিট কেটে গেল। আর মাত্র চোদ্দ মিনিট আপনাদের সঙ্গে একটু বাংলায় কথা বলতে পারব। এ পথে বাঙালী খুব কম যায়। যারা যায় তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ বড় একটা হয় না। আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে।"

"কেন, এখানে কি আর কোন বাঙালী নেই নাকি?"

"না। ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। এই বাসস্ট্যাণ্ড ডাক বাংলা স্টাফ-কোয়া-টার্স পার্ক মার্কেট—সবই প্রায় ওঁর তৈরী। আগে আমাদের নেটিভ স্টেটের চাকরি ছিল। রাজ্যের বাইরে বদলি হতে হত না। এখন সরকারী চাকরি। তিনি বদলি হয়ে গেছেন অন্য জায়গায়।"

"ঋষিকেশ গেলে তো বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে পারেন।" রঞ্জন পরামর্শ দেয়।

"পারি না তা নয়। তবে সময় করে যাওয়া বড়ই কঠিন। তা ছাড়া ঋষিকেশের বাঙালী ও আপনাদের মধ্যে তফাৎ অনেক। ওরা এখানে থেকে থেকে বাঙালীত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর বাঙলার ধুলো এখনও আপনাদের পায়ে জড়িয়ে আছে। সে কথা যাক। কলকাতার খবর বলুন।" প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন ডাক্তার. কলকাতায় নাকি মস্ত মস্ত সব স্কাই-স্ক্র্যাপার উঠছে? শহর রোজই বেড়ে যাচ্ছে? ঠিক কথা, বাস্তুহারারা কি এখনও শেয়ালদা স্টেশনে আছেন?"

জবাব দিলাম, "হ্যাঁ।"

"দেখলেন?" হেসে দেন ডাক্তার, "খবর রাখি। ব্যাপারটা কি জানেন?" থামলেন তিনি। আমরা ওঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে থাকেন, "মাঝে মাঝে আমার কম্পাউণ্ডার ওষুধ আনতে দেরাদুন যায়। ফেরার সময় যুগান্তর নিয়ে আসে। বড় ভাল লাগে দাদা বাংলা পড়তে। বাংলার কথা জানতে। আমি বার বার পড়ি। প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়।"

নিঃশব্দে হাসলাম আমরা। সহসা গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করেন ডাক্তার, "ঠিক কথা। রাসবেহারী এভেন্যুর কি খবর দাদা?"

বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকাই আমরা। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন তিনি "শুনলাম নিয়ন লাইট লাগানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখলেন ?" হেসে দেন তিনি, "কি রকম কারেণ্ট খবর রাখ !"

আমরা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করি তাঁকে।

বাসের হর্নে আঁতকে উঠলেন ডাক্তার। যেন পরীক্ষার হলে লেখা বন্ধ করার ঘণ্টা পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলুন এবার বাসের কাছে যাওয়া যাক। আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে।" হাঁটতে হাঁটতে বলেন, "বড় ভাল লাগল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে। কত দিন দেশের লোক দেখি নি। কি করব দাদা, জানেন তো বাংলা দেশে ডাক্তারের ভাত নেই আজকাল। সবাইকে ছেড়ে একা পড়ে থাকতে হচ্ছে এখানে।"

বাসের পাশে এসে দাঁড়ালাম। যাত্রীরা এক এক করে যে যার নির্দিষ্ট আসনে বসছেন। ডাক্তার বলে চলেছেন, "অনেকেই বিয়ে করার পরামর্শ দেন। মাঝে মাঝে সঙ্গহীন জীবনকে দুঃসহ বলে মনে হয়। ভাবি ওঁদের কথা, শুনি। কিন্তু তার পরেই বুঝতে পারি বিয়ে করলেই তো আর এ সমস্যার সমাধান হবে না। সেও এখানকারই একটি মেয়ে হবে। তার ভাষায় আমাকে প্রেম নিবেদন করতে হবে।" থামলেন ডাক্তার।

আমি বলি, "কেন কলকাতায় গিয়ে ভাল দেখে একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনলে পারেন !"

"পারি না তা নয়, পারি। কিন্তু আমি তা চাই না। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি জীবনের অবসান হোক, এ আমি সহ্য করতে পারব না। যে এ্যাসোসিয়েশনের অভাব আমার জীবনকে একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে সেই পরিবেশে আটকে রেখে আর একটি জীবনকে ছন্দহীন করে তোলার মত নির্দয় আমি কোনদিন হতে পারব না।"

চুপ করলেন ডাক্তার। চুপ করে থাকলাম আমি। রঞ্জনও কোন কথা বলছে না। ড্রাইভার এসে বাসে চাপল। বাস বিবেকহীনের মত গর্জন করে উঠে আমাদের ভাবনা-চিন্তার অবসান ঘটাল : হঠাৎ বলে উঠলেন ডাক্তার, "যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা কথা বলি।"

তাঁর বলার ধরন দেখে আশ্চর্য হলাম আমরা। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই।

ডাক্তার বলেন, "কলকাতায় ফিরে 'বাঙালীর ইতিহাস' বইখানা যদি ভি. পি, করে পাঠিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়।"

"এ আর একটা কঠিন কাজ কি। ফিরে গিয়েই পাঠিয়ে দেব।" রঞ্জন কথা দেয়।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "ভারি খুশি হলাম।"

ড্রাইভারের তাগিদে বাসে উঠে বসলাম। ডাক্তার করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে থাকলেন। আমাদের মনের কোণেও বা বুঝি একটু মায়া এসে ঠাঁই নিয়েছে। আধ ঘণ্টা আগেও ছিলেন অজানা অচেনা, এখন তাঁকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। হয়তো যে দেশের জল আর বায়ু আমার এই দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে সৃষ্টি করেছে তার দিক থেকে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে ওঁর সঙ্গে।

॥ তেরো ॥

নরেন্দ্রনগর মিলিয়ে গেছে। আঁকা-বাঁকা উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ। ডান দিকে সীমা-হীন খাড়াই পাহাড়, বাঁ দিকে গভীর খাদ। পাহাড়ের বুকে ঘন শালবন। বানর-দের একচ্ছত্র রাজত্ব। বাসের শব্দ ওদের অবাধ গতিবিধিকে সাময়িক ভাবে ব্যাহত করে। রাস্তার পাশে উঁচু গাছের ওপর থেকে ওরা বিরক্ত হয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। শিশু বানরেরা ভয় পেয়ে কান্না শুরু করেছে।

অধুনা ভারতের শ্রেষ্ঠ জন্তু-সম্পদের মধ্যে বানর অন্যতম। হাজার হাজার বানর প্রতি বছর রপ্তানি করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা আমরা আয় করছি। এ অঞ্চলের বানর-ধরারা বর্ষায় সময়টা বাদ দিয়ে সারা বছর ব্যস্ত থাকত ধরপাকড়ে। বর্ষাকালে বানরদের একরকম পেটের রোগ দেখা দেয়। ছোঁয়াচে ভয়ঙ্কর রোগ। প্রথম যখন ধরা শুরু হয় তখন রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর বংশধরদের ওপর এই অবিচারের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্থানীয় রামভক্ত জনসাধারণ। অত্যাচার ও অসুখের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদকে কমজোর করতে সক্ষম হয়েছেন সরকারী প্রচারকেরা।

হিন্দোলায় এসে থামল আমাদের বাস। নরেন্দ্রনগর থেকে পাঁচ মাইল এগিয়েছি। ডানদিকে পাহাড়ের ওপর কুঞ্জপুরী দেবীর মন্দির।

পেরিয়ে এলাম আগর খাল। সত্যিই একটা খাল রয়েছে। মানুষের কাটা বলে মনে হয় না। তার পর ফাকোট। স্থানীয় বনবিভাগের প্রধান কেন্দ্র। গাছে ছাওয়া কর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলো বাস থেকেই দেখা যায়। জীপ চলাচলের উপযোগী একটি কাঁচা রাস্তাও চলে গেছে ঐদিকে।

অধিকাংশ যাত্রীই দেখছি বাসের উথান-পতনের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিকে হজম করে নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন বলা ভুল, দুলতে দুলতে

পার্শ্ববর্তী যাত্রীর গায়ে ঢলে পড়ছেন। রাজস্থানী যাত্রীদের পাগড়ি থাকায় এই ঢলাঢলিটা তাদের দিক থেকে বেশ নিরাপদ। মাথায় মাথায় ঘর্ষণের ফলে রক্তারক্তি হচ্ছে না, অথচ হেলান দেবার পালাটি বড় সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। হঠাৎ কোন কারণে ঝাঁকুনির মাত্রাধিক্য ঘটলে মাথা দুটি আকর্ষণ মুক্ত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইলে যা একটু অশান্তি।

একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হয়েছেন ঋষিকেশ থেকেই। তিনি দেখছি এসব দৃশ্য প্রাণমন দিয়ে উপভোগ করছেন। চোখকানের দাবি মেনেই ভদ্রলোক তন্দ্রাহীন হয়ে আছেন। আর জেগে আছে দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর দশেক, মেয়েটির আট। মা-বাবার সঙ্গে ওরাও চলেছে যমুনোত্রী। আসছে দিল্লী থেকে। ছেলেমেয়ে দুটি ক্রমাগত গোলমাল করে মা-বাবাকে তন্দ্রাচ্যুত করছে দেখে, ছেলেটিকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। চলন্ত বাসের মধ্যে টলতে টলতে নির্ভয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল সে। আমাদের দুজনের মাঝখানে বসিয়ে নিলাম ওকে। ভদ্রলোক একবার চোখ মেলে দেখে নিলেন ব্যাপারটা। তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

ছেলেটি জানাল সে গুড্ডু। স্কুলে পড়ে। গুড্ডু কিন্তু আমাদের কাছে এসে শান্ত হয়ে বসে থাকল খানিকক্ষণ। এখান থেকে বাইরেটা খুব ভাল দেখা যায়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাইরের জগৎটা দেখল কিছুক্ষণ। তার পরেই নজর দিল রঞ্জনের কাঁধে ঝোলানো বায়নোকুলারটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, "এটা কি?"

না দেখিয়ে রেহাই নেই বুঝতে পেরে রঞ্জন কেস্ খুলে বায়নোকুলারটা বের করে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি নিজের দু চোখের সামনে তুলে ধরে বিজ্ঞের মত ঘোষণা করে, "দূরবীন!"

রঞ্জন মাথা নেড়ে সমর্থন করে। গুড্ডুর কিন্তু আর মাথা নাড়া দেখার সময় নেই। সে দূরবীন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছি বায়নোকুলার ওকে সারা পথ শান্তশিষ্টভাবে বসিয়ে রাখতে সমর্থ হবে।

একটা ঝড়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। তাকিয়ে দেখি ঝড় নয়, বন্দী জলধারা মুক্তি পেয়ে রুদ্ধ আবেগে ফুলতে ফুলতে নেমে চলেছে। যাত্রীদের অনেকেরই তন্দ্রা ছুটে গেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে কয়েকজন বলে উঠলেন, "গঙ্গা মায়ীকি জয়।"

আমাদের ডান পাশে এক বিক্ষুব্ধ পাহাড়ী নদী। একটু আশ্চর্য বোধ করি। মানচিত্রে দেখেছি গঙ্গা গেছে বহু দূর দিয়ে।

ড্রাইভার আমাকে সংকটমুক্ত করে জানালেন, "যাত্রীরা ভুল করেছে। এ নদীর নাম হুইনি। জায়গাটার নাম জাজল। নরেন্দ্রনগর থেকে ষোল মাইল এগিয়েছি আমরা। একটু বাদেই একটা পুল পেরুব। নদী চলে যাবে বাঁ দিকে। রাস্তার পাশে পাশে নাগ্‌নী ছাড়িয়ে কিছুদূর পর্যন্ত থাকবে সঙ্গে। নাগ্‌নী আরও পাঁচ মাইল।"

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সর্দারজী যাই বলুন, যাত্রীরা গঙ্গা বন্দনা করে ভুল করেন নি কিছু। এ অঞ্চলের সব নদী হয় গঙ্গা থেকে শুরু, না হয় গঙ্গায় গিয়ে শেষ। গঙ্গাকে বন্দনা করলে সবাইকে বন্দনা করা হয়। গঙ্গা এদেশের সৃষ্টির উৎস। গঙ্গা না থাকলে হয়তো এদেশে মানুষ বাস করত না কোন দিন। গঙ্গোত্রী তার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে সৃষ্টি করেছে এই দেশ। ঐ বিক্ষুব্ধ নদীর দিগন্ত-বিস্তৃত ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করছে –

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ।'

নাগ্‌নী পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। হুইনি অদৃশ্য হয়েছে। এখন আর তার কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। এতক্ষণ আমরা যেমন উপরে উঠেছি তেমনি আবার নীচেও নেমেছি। মাঝে মাঝে সবুজ সমতল উপত্যকার উপর দিয়ে এসেছি। কিন্তু নাগ্‌নীর পর থেকে আর সমতলভূমি চোখে পড়ছে না। ক্রমাগত উপরে উঠছি। গাছপালা কমে এসেছে। সামনে পেছনে, দূরে কাছে শুধু সারি সারি পাহাড়। কাছের পাহাড়গুলো গাছে-ঘেরা, দূরেরগুলো ধোঁয়ায় ছাওয়া। পাহাড় ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই এখানে। ড্রাইভারের কাছে শুনলাম একটু বাদেই চামুয়া। নাগ্‌নী থেকে পাঁচ মাইল। ধরাসু পথের উচ্চতম স্থান।

চামুয়ায় এসে ড্রাইভার তার রথকে বিশ্রাম দিলেন সাময়িক ভাবে। সূর্য পশ্চিমাচলের দিকে হেলতে শুরু করেছে। ড্রাইভারের সহকারী ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে দিল। যন্ত্রদানব হাওয়া খাবে। বাস থেকে নেমে পড়লাম। হাওয়া খেতে নয়। বেশ একটু শীত-শীত করছে। এখানকার উচ্চতা ৭৫৩০ ফুট। ঋষিকেশ থেকে ৬৩৯০ ফুট উঠে এসেছি। নামলাম হাত-পায়ের জড়তা কাটাতে।

কয়েকটা চায়ের দোকান রয়েছে পাশাপাশি। একটাতে গিয়ে বসে পড়লাম। হিমেল হাওয়ার মাঝে এদের এই চা নামক পদার্থটির সঙ্গে পাতা ভাজা দাঁতে কাটতে বেশ লাগছে। দূরে তুষারাবৃত একটা গিরিশৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। দোকান-দারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওর উচ্চতা ২২৭৭০ ফুট। ওপারেই কেদারনাথ।

প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসপত্তরের কয়েকটা দোকান রয়েছে। বহুদূরের গাঁ থেকে লোকেরা এখানে কেনা-কাটা করতে আসে। এখান থেকে মুসৌরীর একটা

পায়ে চলার পথ আছে। স্থানীয় কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। বুঝতে চেষ্টা করছে ওদের দেশে আবার এমন কি আছে যে আমরা সব 'পাত্লুন পেহেননেওয়ালা' আংরেজীজানা শেঠরা খরচাপাতি করে এখানে এসেছি। কয়েকটি মেয়ে শালপাতার ঠোঙায় পিচ্ফল ফেরি করছে। হৃষিকেশেও পিচ্ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো অনেক বড় ও তাজা।

একটি মেয়ে ঝুড়ি মাথায় আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "পিচ্ফল নেবেন শেঠ? বহুত মিঠা হবে।"

ওর কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারছি পিচ্ফল মিঠে না হয়ে যায় না। তবুও 'না' বলতে যাচ্ছিলাম। পকেটে যে আখরোট বাদাম মিছরী ও টফি নিয়ে রেখেছি তাই শেষ করতে পারি নি। কিন্তু 'না' বলতে পারলাম না—মেয়েটির করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে। মুখখানি যেন বিষাদে বিবর্ণ হয়ে আছে। ছিন্ন নোংরা জামার আবরণ ভরা-যৌবন-দেহটার লজ্জা ঢেকে রাখতে পারছে না, সে দেহটা যেন আর একটু সোজা হয়ে চলতে পারত। অনিদ্রা অন্নাভাব ও অশান্তি যেন ওর চলার গতিকে ব্যাহত করেছে। জিজ্ঞেস করি, "পিচ্ফল বিক্রি করা পয়সা দিয়ে তুমি কি করবে?"

"আমার আদমীকে দেবো শেঠ। দু'দিন ও তাড়ি খেতে পায় নি। ফল বেচতে পারি নি। আজ পয়সা না নিয়ে ফিরলে মার খেতে হবে। আর মারবেই বা না কেন? তাড়ি না খেলে যে ওর শরীর খারাপ হয়।" একটু থেমে মেয়েটি করুণ ভাবে তাকায় আমার দিকে। তার পরে কণ্ঠস্বরে আবেদনের সুর মিশিয়ে আবার বলে, "নেবেন শেঠ, বাসে বসে খাবেন। পিয়াস লাগবে না।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, "ঠোঙা-সুদ্ধ নিলে কত দিতে হবে?"

মেয়েটি ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্মিত হয়ে বলে, "সব?"

"হ্যাঁ।"

"আট আনা দেবেন।"

এবার আমাদের বিস্মিত হবার পালা। হৃষিকেশে অন্তত দু টাকা লাগত। জিজ্ঞেস করি, "আট আনায় তোমার স্বামীর তাড়ির খরচ কুলোবে?"

"জী। তিন দিনের খরচ উঠে যাবে।"

রঞ্জনের নির্দেশে মেয়েটি ঠোঙাটা সীটের পাশে তুলে দেয়। তৃপ্ত চোখে আধুলিটা দেখে নেয় একবার। মিলিয়ে যাওয়া ছন্দ আবার ওর দু চরণে দেখা দেয়। স্মিত হেসে আমাদের অভিবাদন করে। কাঁটাবনের পাশ কাটিয়ে পায়ে চলা সরু পথটি দিয়ে নীচে নেমে যায়। শুধু আজ নয়, কাল নয়, এমন কি পরশুও এমনি

চটুল চরণে ও বিচরণ করতে পারবে ঐ পাহাড়ী পথে। তিন দিনের তরে সে পতি-পরম-গুরুর চরম শাসনের হাত থেকে পেয়েছে পরিত্রাণ।

॥ চৌদ্দ ॥

এবারে লম্বা পাড়ি। বেশ কিছুটা টানা নীচে নামতে হবে। এর আগে যেমন ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছি, এবারে তেমনি ঘুরতে ঘুরতে নীচে নামছি। ইঞ্জিন বন্ধ করে ড্রাইভার স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে। তেল না পুড়িয়ে বাস ছুটে চলেছে টিহরীর দিকে। মানুয়া থেকে বারো মাইল। এর মধ্যে আমাদের পাঁচ হাজার ফিট নেমে যেতে হবে। খরচের দিকে যতই সাশ্রয় হোক, বিপদের দিক থেকে নয়। রাস্তার এক পাশে গভীর খাদ। অনেক জায়গায় বাঁকের মুখেও রেলিং নেই। কিছুদিন আগে এরই কোথাও একটা যাত্রীবোঝাই বাস পড়ে গেছে। স্টীয়ারিং ধরে থাকা ড্রাইভারের হাত দুটি যদি মুহূর্তের তরেও অসতর্ক হয় তবে বত্রিশজন যাত্রী বিনা পরিশ্রমে গঙ্গাপ্রাপ্ত হবে। অথচ ড্রাইভার দেখছি এ অবস্থাতেই পাশে বসে থাকা সহকারীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, যেন বৈঠকী মজলিসে বসেছে। আমার কিন্তু ভয় করছে। মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু টিহরীর পথে মরতে আমি রাজী নই। গোমুখী পৌঁছতে গিয়ে যদি ধসে চাপা পড়ি অথবা তুষারে তলিয়ে যাই, কোন আপত্তি করব না সে মরণকে বরণ করতে।

গাড়ির গতি পাল্‌টে গেল। সমতলভূমির ওপর দিয়ে আমাদের বাস চলেছে। দু'পাশে সবুজ ক্ষেত। মাঝখানে সমতল সোজা রাস্তা। চাষীদের বাড়ি—গরু-বাছুর-হাঁস-মুরগী ছাগল-ভেড়া খড়ের গাদা লাউ-কুমড়ার মাচা। পাহাড় অনেক দূরে সরে গেছে। সমতলভূমি গিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে। পাহাড়ের সঙ্গে আকাশের প্রতিনিয়ত কোলাকুলি। আমার সমস্ত আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে ড্রাইভার নিরাপদে টিহরীতে বাস নিয়ে এসেছে।

টিহরী এ জেলার সব চেয়ে বড় উপত্যকা। পাহাড়ে ঘেরা ছবির মত সুন্দর একটি জেলা শহর। আগে ছিল রাজধানী। ঘণ্টাঘরের ঘড়িওয়ালা গম্বুজটা আমা ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গম্বুজটায় রাজপুতানার শিল্পপ্রভাব বর্তমান। রাজ-মাতা এ খনও টিহরীতে থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিয়ে তিনি আজও টিহরীর রাজ্যহীনা রাজমাতা। অনেকদিন লোকসভার সভ্যা ছিলেন। যে সামান্য কয়েকজন মহিলা সভ্যা লোকসভায় নিঃস্বার্থ দেশসেবার নজির প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাজমাতা তাঁদের অন্যতমা। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের এই

অনুন্নত অংশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

টিহ্‌রী খুব প্রাচীন শহর নয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থদর্শন শাহ এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। করতে বাধ্য হন···

অজয়পাল গাড়োয়ালের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গেলেন। গড়াধীশ নয়, সত্যিকারের রাজা। তাঁরই অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলভদ্রপাল আকবরের কাছ থেকে শাহ উপাধি পেলেন। খাসিয়া করদ গড়াধীশরা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা হারিয়ে রাজকর্মচারী হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে ঐসব পদে ক্ষত্রিয় এমন কি ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত নিযুক্ত হতে লাগলেন। রাজ্যের সীমা সাহারাণপুর ও বিজনোর অবধি বিস্তৃত হল। বিপদ এল ১৮০৩ সালে। রাজা প্রদ্যুম্ন শাহের আমলে। সেনাপতি বিদ্রোহী হলেন তাঁর গুর্খা স্ত্রীর প্ররোচনায়। নেপালে গিয়ে গুর্খাদের ডেকে আনলেন। শান্তির নীড় গাড়োয়ালে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। গুর্খারা গাড়োয়ালের খানিকটা অধিকার করে নিল। রাজা প্রদ্যুম্ন শাহ গুর্খাদের রুখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। তাঁর পুত্র স্থদর্শন শাহ বারো বছর পরে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। খাল কেটে কুমীর আনলেন। ইংরেজ তাঁর রাজ্যকে গুর্খামুক্ত করে দিল। কিন্তু এই সাহায্যের খেসারৎ হিসাবে দেরাদুন শ্রীনগর ও কেদার-বদ্রী সমেত অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী সমেত বাকি অর্ধেক নামেমাত্র স্বাধীন রইল বিনা করে। সৈন্যসংখ্যা তিনশ তিরিশ জনে সীমাবদ্ধ করতে হল।

রাজধানী পত্তন করতে হল টিহ্‌রীতে। গুর্খারা বোধ করি এর এক-চতুর্থাংশ দিলেই আক্রমণ বন্ধ করতে রাজী হত। ইংরেজী বন্ধুত্বের আসল রূপের সঙ্গে পরিচয় ছিল না রাজা স্থদর্শনের। পরিচয় যখন পেলেন তখন তিনি শক্তিহীন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া তাঁর আর কোন সম্বলই ছিল না। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস বুঝিবা আজও টিহ্‌রীর বাতাসে মিশে আছে।

আরও একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি। দেবস্থমন। এ রাজ্যের জননেতা। টিহ্‌রী জেলে দু মাস অনশন করে শহীদ হয়েছেন। সারা ভারত সেদিন এই টিহ্‌রীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরা মাথা নত করেছিল।

আমাদের বাস শহরের সীমানার বাইরে থাকবে। এতে আমাদের বাঁচবে সময়, আর বাস-কর্তৃপক্ষের বাঁচবে খরচ। শহরে ঢুকতে বা বেরুতে চুঙ্গি দিতে হয়।

চেক্‌-পোস্টের সামনে এসে বাস দাঁড়াল। টিহ্‌রীর দুজন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা নেমে গেলেন। সাইকেল-রিক্‌শা চেপে শহরে ঢুকলেন। দুজন নতুন যাত্রী নিয়ে

বাস রওনা হল ধরাসুর পথে। পথ মানে কাঁচা রাস্তা। বাসের পেছনে ধুলোর ঘূর্ণি। গতি কমলেই পেছনের যাত্রীদের নাকে মুখে ধুলো ঢোকে। ছোট একখানা জোয়ান জীপ আমাদের বুড়ো বাসকে অতিক্রম করে গেল। অনেকক্ষণ তার পেছনে নাক বন্ধ করে বসে থাকতে হল। ড্রাইভারের অবশ্য কোন অসুবিধা হল না। গোঁফ আর কালো চশমার বেড়া ডিঙিয়ে ধুলো তাকে কিছুই করতে পারে না।

এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস। কখনও বা কোন বাড়ির গোয়াল আর উঠোনের পাশ দিয়ে। কখনও বা সবুজ ক্ষেতে দোলা দিয়ে। দূরে নদী আর পাহাড়ের রেখা দুটি স্পষ্টতর হচ্ছে। পাহাড় দিক পরিবর্তন করেছে। ডান থেকে বাঁয়ে এসেছে।

প্রখর রোদ। বেশ গরম লাগছে।

গঙ্গা, ভীলগঙ্গা ও ঘৃত তিনটি নদী এসে মিশেছে টিহরীতে। ভীলগঙ্গা আর ঘৃত অন্য কোন দিকে পালিয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গঙ্গা। গঙ্গা-যমুনার দেশে চলেছি আমরা।

আবার পাহাড়ে উঠছি। ক্রমাগত গিয়ার বদল করছে ড্রাইভার। নাকে মুখে রুমাল চাপা দেওয়ার কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে আমাদের হাত। ধুলার ধরণী থেকে পাথরের পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি।

ভলদিয়ান ছাড়িয়ে এলাম। ভলদিয়ানে খাওয়া সেরে নিয়েছি। জায়গাটা ছোট হলেও অনেকগুলো দোকান আছে। পেছনের দিকে যাঁরা বসেছেন তাঁদের অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়। টিহরী থেকে এই এগার মাইল আসতে বাসের চেহারা পালটে গেছে। যাত্রীরা ক্রমাগত বমি করছেন। দুর্গন্ধে ভরে গেছে সারা বাস। আগের চাইতে রাস্তা অনেক খারাপ। উঁচুনীচু আর গর্তে বোঝাই। বাঁ দিকে পাহাড়, ডাইনে খাদ। খাদের নীচে গঙ্গা। বাসের চাইতে সামান্য চওড়া রাস্তা। অনেক সময় চাকার পাশে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে শূন্যে ভেসে চলেছি।

একটা ঝরনার ধারে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। ঠাণ্ডা ও মিঠে জল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। প্রাণভরে জল খেলাম। টিহরীর পর থেকে ঘনঘন পিপাসা পাচ্ছিল। ওয়াটার-বট্‌লের জল অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আরও সাড়ে পাঁচ মাইল ক্রমাগত ওপরে উঠে ছাম্‌-এ এসে বাস থামল বেলা প্রায় চারটার সময়। ছাম্‌ এ-পথে দ্বিতীয় উচ্চতম স্থান। আর গরম লাগছে না। এখান থেকে ধরাসু সাড়ে দশ মাইল। সকলের চা খাওয়া শেষ হলে ড্রাইভার

আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। বড় একটা উঠতে হচ্ছে না। নামছিই বলা যেতে পারে।

নাগুন পেরিয়ে এলাম। আর কোথাও থামতে হবে না। সোজা ধরাসু। যাত্রীদল শারীরিক অবসন্নতাকে অস্বীকার করে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। দিল্লীর ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে মাথা তুলে বসতে বলছেন। ভরসা দিচ্ছেন কষ্টের অবসান আসন্ন। হাসি পেল। এর পর প্রায় একশ এগারো মাইল দুর্গম পথ হাঁটতে হবে তাঁদের। আমাদের দু'শ সাতায় মাইল। সে কষ্টের তুলনায় এ তো নেহাৎ আয়েস। কলের গাড়ি আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে সুগম পাহাড়ী পথ দিয়ে।

গুড্‌ডু কিন্তু বাবার কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করল, "একটু পরেই বাস থেকে নামতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"কাল আমাকে দূরবীনটা একবার দেবেন?"

"শুধু কাল কেন? আমরাও তোমাদের সঙ্গে যমুনোত্রী যাচ্ছি। সারা পথ দূরবীন হাতে পাবে তুমি।"

"ওঃ, খুব মজা হবে তা হলে!"

ইউরোপীয় ভদ্রলোক পকেট থেকে মানচিত্র বের করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন দেখছেন। ছাম্‌-এ চা খাবার সময় আলাপ হয়েছে। অবিবাহিত জার্মান যুবক। নাম কার্ল উল্‌রিখ। মুনেশেন (মিউনিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র। ভারতীয় দর্শন নিয়ে গবেষণা করছে এখন। সংস্কৃত জেনেও যে এদেশের লোকের কথা বুঝতে পারবে না, এ ধারণা ছিল না তার। মহা মুশ্‌কিলে পড়েছে ইংরেজী না জেনে। আমি মোটামুটি ফরাসী জানি শুনে ভারি খুশি হয়েছে।

"আমি তখনই বলেছিলাম এই সুখের পায়রাকে সঙ্গে নিও না। নাও সামলাও এবার!"

পেছন ফিরে তাকাই। আমাদের ঠিক পেছনে কালের পাশেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব দুটি বৈষ্ণবী নিয়ে তীর্থে চলেছেন। বড়টির বয়স চল্লিশের কোঠায় আর ছোটটির নিঃসন্দেহে পঁচিশের নীচে। বাসের ঝাঁকুনিতে ছোট বৈষ্ণবী খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। মাথা উঁচু করে থাকতে পারছে না। বৈষ্ণব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বড় বৈষ্ণবীর কথায় আমল না দিয়ে ছোট বৈষ্ণবীর মাথাটিকে সযত্নে স্থাপন করলেন নিজের কাঁধে। কোমল কণ্ঠে বললেন, "চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর পারুল। ধরাসু এল বলে।"

পারুলের কিন্তু চোখ বুজে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বড় বৈষ্ণবীর দৈহিক

বাণী তার মাথাটিকে বৈষ্ণবীর স্কন্ধচ্যুত করে।

"বলি এটা কি তোমার বেন্দাবনের আখড়া পেয়েছ ঠাকুর? যখন তখন যেখানে সেখানে একটা ছুতো করে ঢলাঢলি শুরু করলেই হল? এ হল গিয়ে সগ্‌গের পথ। এ পথে ওসব করে ভগবানের রোষে না হয় নাই পড়লে!"

"তুই চুপ করবি রজনী?" বৈষ্ণবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, "আর একটা শব্দ করেছিস কি তোকে আমি বাস থেকে ফেলে দেব। মেয়েটার জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে আর উনি আমাকে সগ্‌গ-নরক দেখাচ্ছেন!"

রজনী চুপ করল না বটে, কিন্তু তার সুরের পরদা নেমে গেল, "আমার তো দেহ নয়। আমার শরীরে ব্যথা-বেদনা নেই। বমি আমার আসে না। মাথা আমার ঘোরে না। বয়স বেশী হলে আর ওসব হতে নেই। আমারই অদ্দিষ্ট। যেদিন ও আখড়ায় এল সেদিনই বুঝেছিলাম আমার কপাল পুড়ল। হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ-মুরারী! যমুনোত্রীতে মা যমুনা যেন তাঁর পায়ে আমাকে ঠাঁই দেন। আর যেন ফিরে আসতে না হয় এই কালামুখ নিয়ে।"

বড় বৈষ্ণবীর মুখের রংটা সত্যিই মুকুন্দমুরারীর মত।

॥ পনেরো ॥

"গঙ্গা মায়ীকি জয়" বলে বাস থেকে নেমে পড়লাম। কলের গাড়িতে চড়ার পালা শেষ হয়েছে। এবারে পা-গাড়িকে সম্বল করে কম্বল কাঁধে লম্বা পাড়ি লাগাতে হবে।

ধরাসু এসে গেছি। এদেশে সূর্য অস্ত যায় অনেক পরে। সন্ধ্যে হতে এখনও দেরি আছে। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে রাস্তাটা খানিকটা চওড়া। বোধ করি পাশের পাহাড়টাকে ভাঙতে হয়েছে এজন্যে। দেয়ালের মত খাড়া পাহাড় উঠে গেছে বাঁ দিকে। রাস্তা থেকে ডান দিকে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। সিঁড়ির বাঁ দিকে থরে থরে দোকান। জামা-কাপড় জুতো-লাঠি চাল-ডাল আটা-ময়দা তেল-নুন থালা-বাটি মায় আখরোট-বাদাম-কিশমিশ-চিউয়িংগাম্—এক কথায় পথে যা লাগতে পারে সবই এখানে পাওয়া যায়। সিঁড়ির ডান দিকে কালি-কমলীর ধর্মশালা। একটা বড় ও একটা ছোট দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে বড় বাড়িটার ছাদে গিয়ে পড়া যায়। ধর্মশালার সামনে বালির চর। তার পরেই পুণ্যসলিলা গঙ্গা। যমুনা এখানে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। সরু আর একসারি সিঁড়ি দোকানগুলোর পাশ দিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে যমুনার দিকে।

ধর্মশালার উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে সাধুর বদলে সিরিঞ্জ হাতে চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। যদি কেউ ফাঁকি দিয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারে, তা হলেও সুইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

ড্রাইভারের সহকারী বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামিয়ে দিল। কুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে দেখে মালপত্র নিজেরাই কাঁধে নিলাম। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চললাম ধর্মশালার দিকে। যেমন করে হোক একখানা ঘর দখল করতে হবে। ভাল করে ঘুমিয়ে নিতে হবে আজকের রাতটা।

কিন্তু এ কি! ধর্মশালা লোকে লোকারণ্য। ঘরের কথা মাথায় থাক, বারান্দায় মালপত্র নামাবার মত একটু জায়গা চোখে পড়ছে না। ধর্মশালার বাঁধানো উঠোনে বহুলোক জিনিসপত্রের সীমানা দিয়ে আলাদা ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসেছেন। অনেকে রান্নার যোগাড় করছেন। এত লোক এল কোত্থেকে? ঋষিকেশ থেকে আমাদের আগে মাত্র তিনখানা বাস ছেড়েছে। টিহরি থেকেও শুনেছি একখানা বাস আসে দৈনিক। তবে কি এরা অনেকে মুসৌরী থেকে হাঁটাপথে এসেছে? বাস হবার আগে সকলে ঐ পথে আসত। মুসৌরী এখান থেকে চল্লিশ মাইল। দুটো রাস্তা আছে। একটা লালুরি হয়ে আর একটা ছাপরা ঘুরে। দূরত্ব একই। পায়ে হাঁটা পথ এড়াতে গিয়ে দ্বিগুণ রাস্তা ঘুরেছি আমরা। শুনেছি সে রাস্তায়ও নাকি বাস চলবে অদূর ভবিষ্যতে। তখন ঋষিকেশের মূল্য যাবে কমে। চামুয়ার পাহাড়ী মেয়ে পিচ্‌ফল বেচে তাড়ি যোগাতে পারবে না তার আদমীকে।

কিন্তু সে চিন্তা এখন অর্থহীন। মাথা গোঁজার চিন্তাই আমাদের অস্থির করে তুলেছে। আপাততঃ মালপত্রগুলো ঘাড় থেকে নামাতে পারলে স্বস্তি পেতাম। লক্ষ্য করে দেখি উঠোনের গাছতলার কাছে একফালি জায়গা খালি আছে। সেখানে কোনমতে মালপত্রটুকু রাখা যেতে পারে। পাছে আর কেউ ছুটে এসে দখল করে, তাই তাড়াতাড়ি পা চালাই।

খানিকক্ষণ মালপত্রের ওপর নিঃশব্দে বসে রইলাম দুজনে। অবসন্ন দেহ। রঞ্জন বলে, "এমনি করে সারারাত বসে থাকতে হলে কাল সকালে হাঁটা শুরু করব কেমন করে?"

উত্তর দিতে গিয়ে বাধা পেলাম। একজন মধ্যবয়সী স্থানীয় লোক চীৎকার করে বলছেন, "এ ঘর আমি দিতে পারব না। পথকষ্টের কথা ভেবে যাত্রীরা অপ্রয়োজনীয় মালপত্র এই ঘরে রেখে যায়। যাবার পথে ফেরত নেয়।"

বুঝলাম লোকটি ধর্মশালার চৌকিদার। যাঁরা এই অযৌক্তিক দাবি করেছেন তাঁরা কিন্তু নাছোড়বান্দা, "দেবে না মানে, দিল্লাগী নাকি? দশ টাকা দিয়ে

খাতিরদারী চিট্‌ঠি এনেছি। জায়গা দিতেই হবে।"

"কোথা থেকে দেব? ধর্মশালায় থাকতে পারে বড় জোর শ'খানেক যাত্রী। আর আজ এক দিনেই এসেছে প্রায় দু'শ লোক। সরকার হরিজনদের জন্তে মন্দির খুলে দিয়েছে অথচ তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা করে নি। কোল ভীল সাঁওতাল সব চলেছে গঙ্গোত্রীর পবিত্র মন্দিরে। ওদেরও জায়গা দিতে হবে। না দিলে নোকরি যাবে।"

চৌকিদারের কথা থেকে বুঝতে পারছি এই অস্বাভাবিক যাত্রী সমাবেশের কারণ। চৌকিদার কেমন করে শেষ অবধি সমস্তার সমাধান করল জানি না। আমি যাত্রীদের কথাবার্তা শুনছি আর কাজকর্ম দেখছি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোক এমন কি কয়েকজন অভারতীয়ও ঠাঁই নিয়েছেন উঠোনে। প্রত্যেকেই যে যার ভাষায় কথা বলছেন। কেউ বা গান গাইছেন। ইংরেজী নামের হিন্দী ছবির গান থেকে বিশুদ্ধ ভজন। একজন গেরুয়া-পরা লোক তার বোঁচকার ওপর চেপে বসে রুটিতে আচার মাখাচ্ছেন আর গুনগুন করে গাইছেন—

"সবহী দেশ হায় গোপালকী

ইসমে আটক্ কাহাঁ?

জীসকে মন মে আটক্ হায়

সোহী আটক্ রহা।"

চৌকিদারের কণ্ঠস্বরে আবার ফিরে তাকাতে হয় দরজার দিকে। এবারে কিন্তু স্বরটা অত ঝাঁজাল নয়। হাত জোড় করে বলছে, "না শেঠজী, মাফ কিজীয়ে। খাতিরদারী চিট্‌ঠি থাকলেও কিছু করতে পারব না। কোন ঘর খালি নেই।"

গুড্‌ডুর বাবা কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্তাকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে ধর্মশালায় পৌঁছেছেন। ভাবনার কথা। আমরা না-হয় নীল আকাশের নীচে ব্যাগের ওপর বসে সারারাত নদীর গর্জন শুনলাম, কিন্তু ঐ ভদ্রলোক স্ত্রী আর শিশুদের নিয়ে কেমন করে রাত কাটাবেন? ভদ্রলোক কি বলছেন কানে আসছে না, শুধু দেখলাম একবার স্পর্শ করলেন চৌকিদারের বাঁ হাতখানি। তার পরেই তর্‌তর্ করে চৌকিদার নেমে এল উঠোনে। হাঁটতে শুরু করল ছোট ধর্মশালার দিকে। গুড্‌ডুর বাবা সদলবলে অনুসরণ করছেন তাকে। যাচ্ছেন কোথায়? চৌকিদার কি তাঁকে ঘর দিচ্ছে নাকি? এই না বলছিল কোন ঘর নেই! ভদ্রলোক কি ম্যাজিক জানেন?

কাছে আসতেই আমাকে আস্তে আস্তে ইংরেজীতে বললেন গুড্‌ডুর বাবা, "এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ইশারা করলে মালপত্র নিয়ে চলে আসবেন।"

নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম। কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ নেই। আশেপাশে ইংরেজী-জানা যাত্রী থাকা খুবই স্বাভাবিক।

মিনিট দশেক পরেই ভদ্রলোকের ইশারা পেলাম। চুপি চুপি তাঁর পিছু পিছু মালপত্র নিয়ে দোতলার কোণের দিকে একটা মাঝারি আকৃতির ঘরে এসে ঢুকলাম। ঢোকামাত্র দরজা বন্ধ করে দিলেন গুড্‌ডুর মা। ঘরে একটা জানালা আছে গঙ্গার দিকে। কি রকম একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে বহুদিন ব্যবহৃত হয় নি। চৌকিদারের বিশেষ করুণা না পেলে এ কামরায় কেউ প্রবেশ করতে পারে না। আমরা আজ ধরাসুতে ভি. আই. পি.। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম গুড্‌ডুর জাদুকর বাবাকে।

মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়তে চাই। গুড্‌ডুর বাবা মিঃ অরোরা বাধা দিয়ে বলেন, "একটু দাঁড়ান। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। সেই জার্মান ভদ্রলোক আর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরাও নিশ্চয়ই জায়গা পান নি। ওদের নিয়ে আসি এখানে। একজন বিদেশী আর একজন রোগী। আমাদের না হয় হাত-পা ছড়াতে একটু অসুবিধে হলই। কি বলেন?"

মাথা নেড়ে সমর্থন করি।

আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মিঃ অরোরা।

বড় ধর্মশালার সামনে এসে দেখি ভদ্রলোকের সন্দেহ মিথ্যা নয়। কার্ল দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ের মত। আর বৈষ্ণবকে ধরে কম্পমানা ছোট বৈষ্ণবী। বড় বৈষ্ণবীর চোখের তেজ এসেছে কমে। নির্বাক বৈষ্ণব বুঝিবা মনে মনে মহাপ্রভুকে ডাকাডাকি করছেন। মহাপ্রভুর প্রতিভূ হয়ে দেখা দিলেন অরোরাজী। ওদের নিয়ে চললেন আমাদের ঘরে। কার্ল খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানায়। অরোরাজীকে দেখিয়ে বলি, "আমি ওনারই আশ্রিত।"

ধর্মশালার বাইরে এসে একটা চায়ের দোকানে বসি। অঞ্জলির দেওয়া খাবার রয়েছে। দরকার শুধু চায়ের। তবু রঞ্জন ফরমাস করে পাকৌড়ীর। পাকৌড়ীতে কামড় দিয়ে মনে পড়ছে ভাবীজীর কথা। ভাবীজী আরও ভাল পাকৌড়ী ভাজতেন।

ছোট সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি যুগলগঙ্গার দিকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে অষ্টমীর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় জেগে আছে সীমাহীন পাহাড়। যুগলগঙ্গার ওপর সুন্দর ও শক্ত একটা পুল। ঐ পুল পেরিয়ে কাল সকালে আমাদের যাত্রা করতে হবে যমুনোত্রী। বালির চরে কুলিবস্তি। বস্তি বললে বেশী বলা হয়। নদীতে ভেসে যাওয়া কাঠ আর শালপাতা দিয়ে তৈরি নদীর হাওয়ায় দোদুল্যমান

কতগুলো কুঁড়ে। প্লাবনের হাত থেকে রেহাই পেতে হুঁড়েগুলো তৈরি করেছে প্রায় মানুষ-সমান উঁচুতে। মই বেয়ে ঘরে উঠতে হয়। কোনটির মধ্যেই দাঁড়ানো যায় না। কাঠের পাটাতনের ওপর খড় বিছিয়ে চার-পাঁচটি লোক গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে থাকে কোনমতে।

কুলিবস্তির সামনের চরে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন বহু যাত্রী—যাঁরা পরে এসে পৌঁছেছেন অথচ অরোরাজীর মত চৌকিদারের হাত টিপতে জানেন না।

পুল পেরিয়ে একটা বড় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানকার কুলি এজেন্সীর অফিস। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। আমাদের দেখে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ায় দোকানী। রঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে জানায় এক মণ মাল বইবার মত আর তিনজন কুলি আছে তার হেফাজতে। একশ এক টাকা দিতে হবে জনপ্রতি। ছোট একটি ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাক সাজছিল। তাকে আদেশ করে দোকানী, "মুচ্‌রাকে ডেকে নিয়ে আয় তো। বলবি তার যাত্রী ঠিক হয়েছে।"

একটু বাদেই দুটি পাহাড়ী মেয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে এসে হাজির হল। একসঙ্গেই কথা বলতে শুরু করে দুজনে। দোকানী ধমক লাগায়। বড়টি চুপ করে। ছোট জানায়, তাদের স্বামী অর্থাৎ সেই মহাপ্রভু যিনি আমাদের সৌভাগ্যগুণে এ যাত্রায় পথপ্রদর্শক হবেন, তিনি এখন ধর্মশালায় যাত্রীদের ফরমাস খাটছেন। ঘরের নম্বর বলে আমরা নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারি। মহাপ্রভু কাল প্রত্যূষে যথাসময়ে আমাদের ঘুম ভাঙাবেন।

দোকানী আগাম চাইতেই রঞ্জন দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতে দিল। একখানা নোট কাঠের ছোট হাতবাক্সের মধ্যে রেখে দ্বিতীয় নোটখানা ছোট মেয়েটির হাতে দিতেই অনর্থ ঘটল। বড় মেয়েটি এতক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে একেবারে তেড়ে এল ছোটকে। মনে হচ্ছে নোটটি কেড়ে নিতে। রঞ্জন বাধা না দিলে হয়তো দোকানের বারান্দাটা কুস্তির আখড়ায় পরিণত হত। ওরা দুজনেই মুচ্‌রার অর্ধাঙ্গিনী। স্বামীর রোজগারে সমান অধিকার। দোকানদার ছোটকে বেশী খাতির করতে পারে কিন্তু বড় সে অবিচার মেনে নিতে অপারগ।

রঞ্জন আর একখানা দশ টাকার নোট বড়র হাতে দেয়। খুশিমনে ওরা ফিরে যায় ওদের স্বামীর ঘরে। রসিদ নিয়ে আমরা ফিরে আসি ধর্মশালায়।

ইতিমধ্যে সকলেই বেশ গুছিয়ে বসেছেন। যাঁরা চরে ঠাঁই নিয়েছেন তাঁদের অনেকেরই রান্না হয়ে গেছে। কেউ কেউ খাওয়া সেরে চরের ওপর কম্বল বিছিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। স্থানাভাবে বারান্দার অধিবাসীরা রান্না করে উঠতে

পারেন নি। তাঁরা সঙ্গের খাবার কিংবা দোকানের খাবার খেয়ে শুয়ে-বসে শ্রান্তি দূর করছেন। মানুষের প্রয়োজন কত কম। অথচ এই প্রয়োজনকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তোলে মানুষ। ডেকে আনে কত অশান্তি, কত দুঃখ। ঝরে কত রক্ত।

পুরুষেরা খালিগায়ে। মেয়েরা ঘোমটাহীনা। আর কোন আবরণের দরকার নেই। এমন জায়গায় ওঁরা এসে পৌঁছেছেন যেখানে লজ্জার কোন বালাই নেই। সামাজিকতার নেই কোন প্রয়োজন। নারী-পুরুষে নেই কোন প্রভেদ। এখানে সকলে মানুষ। চরিত্রের কলুষ চিত্তের বিকাশ যদি কারও মধ্যে থেকে থাকে থাক। সেজন্যে সবাইকে তার সহজ রূপটি যেতে হবে ভুলে। ভক্তরা এসে মিলিত হয়েছে তীর্থপথের দ্বারে। সন্তান যাচ্ছে মাতৃসন্দর্শনে। ভয়-ভাবনা লজ্জা-শঙ্কা মন থেকে দূর না করলে তো মায়ের কাছে যাওয়া যায় না। কোথায় কে একজন পাপ মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই বলে সবাইকেই বহুরূপী সেজে অভিনয় করতে করতে মায়ের ঘরে ঢুকতে হবে ?

রাজস্থানী একদল যাত্রী খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠোনে বসেছেন গোল হয়ে মজলিসী চালে। দলনেতা জীর্ণ তুলট কাগজের একখানি বই মেলে রেখেছেন সামনে। বলছেন, "রাজা রোহিত বেরিয়েছিলেন বিশ্বের মুক্তিপথে। বহুকাল ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে পথে। তার পরে একদিন ক্লান্ত অবসন্ন দেহে যখন ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তখন দেবতা ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—

'চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্যপশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রায়তে চরণ ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—'

একবার থামলেন দলনেতা। উপবীতটা কোমরে ঝুলে পড়েছিল, সেটাকে সযত্নে কাঁধের উপরে তুলে নিলেন। শ্রোতারা তাঁর মুখের দিকে অসহিষ্ণু হয়ে তাকিয়ে আছে। গলাটাকে সাফ করে নিয়ে তার পর আবার বলতে শুরু করলেন, "চলাটাই পরম মধু। চলাই তো স্বাদু ফল। চেয়ে দেখ সূর্যের কি অতুলনীয় আলোক ঐশ্বর্য। চলতে আরম্ভ করে সদাই সে জেগে আছে। কখনই ঘুমিয়ে পড়ছে না। অতএব হে রাজা। গৃহপথপ্রত্যাশী না হয়ে চল, এগিয়ে চল।"

॥ ষোলো ॥

কাকলি। কলরব। করাঘাত।

ঘুম ভেঙে গেল। অরোরাজী গিয়ে দরজা খুললেন। ভোর হয়ে গেছে। অনেক যাত্রী জেগেছেন, যাত্রার জল্পনা করছেন। স্বাস্থ্যবান একজন পাহাড়ী যুবক ঘরে ঢুকল। মাথায় মাংকি ক্যাপ। কাঁধে কালো কম্বলের কোট। পরনে শার্ট ও যোধপুরী পায়জামা, পায়ে দড়ির চটি, হাতে লাঠি। মিঃ অরোরা ও বৈষ্ণব বাবাজীর কুলিদের কাল দেখেছি। বুঝতে পারলাম ইনি আমাদের ত্রাণকর্তা শ্রীযুক্ত মুচ্‌রা। কোটের পকেট থেকে একটা স্প্রিংয়ের ওজনযন্ত্র বের করে সে। মালপত্র দেখিয়ে দিলাম। ওজন করে খুশি হল মুচ্‌রা। এক মণের কমই হয়েছে।

বাঁধাছাদা করতে সময় বেশী লাগল না। আধঘণ্টার মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমরা মানে দুজন কুলি আর সাতজন যাত্রী। আমি রঞ্জন কার্ল ও গুড্‌ডুরা। বাবাজী আমাদের সঙ্গে যাবেন না। গঙ্গাস্নান ও তিলকসেবা করে রওনা হতে দেরি হবে তাঁর। খুব না হলেও কলকাতার পৌষ মাসের মত শীত। স্নান করতে ইচ্ছা হল না আমাদের। পারুলের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা যেন সামলে উঠেছে। স্থানের মাহাত্ম্য কিনা বলতে পারি না, পারুলকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলল বড় বৈষ্ণবী।

অনেকে দেখছি পুজোপার্বণে ব্যস্ত রয়েছেন। যাত্রার আগে পুজো, এ যেন শনিপুজো। অনেকটা ঘুষ দেওয়ার মত—তোমার বিপদসঙ্কুল রাস্তা দিয়ে চলেছি। তুমি আমাদের ওপর রুষ্ট হয়ো না। আমাদের সকল অপরাধকে ক্ষমা করো। আমরা যেন নিরাপদে আবার ফিরে যেতে পারি মাটির জগতে, আমাদের ঘরে, আপন আপন সংসারের মাঝে।

বারাম্‌খেলায় এসে থামলাম। ছুটো চটি অর্থাৎ যাত্রীদের বিশ্রাম নেবার জন্য দুখানা ঘর আছে। তারই একটায় মালপত্রের বেড়া দিয়ে কোন রকমে একটু রান্নার জায়গা করা গেল। কুলিরা কাঠ নিয়ে এল। মিসেস্ অরোরা পায়ের ব্যথায় কাহিল। তাঁকে আর রান্নার দিকে ঘেঁষতে দিলাম না। একটা কম্বল পেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে পড়লেন তিনি। রঞ্জন ও অরোরাজী রান্নার যোগাড় করতে লাগলেন। চেহারাতেই মালুম হয় যে অরোরাজী বেশ একটু ভোজনবিলাসী। সারা পথ রঞ্জন তাঁর কাছে খিচুড়ীর প্রশস্তি গেয়েছে। কাজেই খিচুড়ীর ব্যবস্থা হচ্ছে। পরিমাণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে খাবারের দিকে কোন আকর্ষণ নেই আমার। কার্লের কাছে সবই নতুন। পোলাও আর খিচুড়ীতে কোন পার্থক্য

নেই তার কাছে। সে নিরাসক্ত ভাবে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আমিও তোয়ালে নিয়ে চটির বাইরে এলাম।

এ পথে শুনেছি অধিকাংশ চটিতেই জলের অভাব। এই ন মাইল আসার মধ্যেই সে অভিজ্ঞতা হয়েছে খানিকটা। ধরাসু থেকে চার মাইল এসে কল্যাণীতে থামতে চেয়েছিলাম। সেখানেও দুটি চটি রয়েছে। কিন্তু জলাভাবের জন্ত কুলিরা থামতে দেয় নি। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ধরাসু থেকে কিছুটা চড়াই উতরাই পেরিয়ে পাইন বনের মধ্য দিয়ে সুন্দর সমতল রাস্তাটি কল্যাণী পর্যন্ত এসেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে এসেছি। ছেড়ে এসেছি গিউলা। একটা পাহাড়ী গ্রাম। অধিবাসীরা আমাদের উৎসাহ দিয়েছে পথ চলতে। মাঝে মাঝে পথের পাশে সবুজ ক্ষেতও আমাদের যুগিয়েছে পথ চলার প্রেরণা।

হঠাৎ একটা চিৎকারে সেদিকে আকৃষ্ট হতে হল। এগিয়ে গেলাম পাশের চটির দোরগোড়ায়। কপালে চন্দন-তিলক-কাটা একজন বৃদ্ধ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কাউকে ডাকছেন, "এদিকে আয়—এদিকে আয় বলছি!"

ভদ্রলোকের হাতে অর্ধভুক্ত একখানা রুটি। থালা ঘটি বাটি সামনে নিয়ে খেতে বসেছেন তিনি। দুজন তিলক-কাটা লোক খানিক দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। দুজনের একজন বেঁটে ও মোটা। আর একজন রোগা ও লম্বা। লম্বার ওপরই যেন বৃদ্ধের রাগটা বেশী। ডাকার ধরন দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাছে এগোনো বিপজ্জনক। তবুও লোকটি এগিয়ে গেল ভয়ে ভয়ে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা।

লম্বা লোকটি কাছে যেতেই বৃদ্ধ বলেন, "দেখ বুদ্ধু, দেখ্!" বলেই সহসা হাঁ করলেন একবার। অপরাধীর মত লম্বা লোকটি দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। বৃদ্ধ তার পর মুখ বন্ধ করে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখেছিস?"

"জী হাঁ।"

"কি দেখলি?"

"জী।" একবার ঢোক গিলে নেয় লোকটি। তার পরে বলে, "জী নেই।"

"নেই, না? আমার দাঁত নেই, জানতিস্ না?"

"জী।"

"তা হলে? কেন এরকম শক্ত রুটি বানিয়েছিস?"

"জী।" বোধ করি সাহস সঞ্চয় করতে একবার থামে লম্বা লোকটি। তার পরে বলে, "জী হাওয়া চলছিল। জুড়িয়ে শক্ত হয়ে গেছে। আর কোন দিন হবে না।"

"আরে বুদ্ধু, পরের কথা পরে হবে। এখন কি খাব?"

লম্বা কোন জবাব দিতে পারে না। নতুন করে রুটি বানানো সম্ভব নয় এখন। আর বৃদ্ধ তার সময়ও দেবেন না।

বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জমাতে ইচ্ছে হল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। আমাকে দেখেই ক্ষেপে উঠলেন তিনি। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবার কে? কি চাও এখানে?"

"চাই নে কিছু। একটা কথা বলতে এলাম।"

"কি কথা?"

"আমার মনে হচ্ছে, দুধ হলে আপনাকে আজ আর অভুক্ত থাকতে হবে না।"

"কি হলে? দুধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দুধ দিয়ে ভিজিয়ে নিলে হয়তো ঐ শক্ত রুটি কোন রকমে খেয়ে নিতে পারবেন।"

"কিন্তু দুধ এখানে পাব কোথায়?" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যেন অনেক মোলায়েম শোনায়।

"বাইরে চায়ের দোকানে দেখেছি পাওয়া যায়। আমাকে ঘটি দিন' আমি নিয়ে আসছি।"

"তুমি নিয়ে আসবে? আর এই দুই অসুর এখানে বসে বসে গিলবে? তা হলে আমি এই দুই আকাট মূর্খ আপদকে এত খরচা করে নিয়ে এলাম কেন? তুমি বসো এখানে।" বৃদ্ধ আমাকে আদেশ করেন। আমি বসে পড়ি। বৃদ্ধ আবার শুরু করেন, "এই বুদ্ধু রা, যা দয়া করে দুধ নিয়ে আয়। তাতে চটকে তোদের এই পিণ্ডি গিলে ফেলি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটি নিয়ে বেঁটে ছুটল বাইরে। বৃদ্ধ লম্বার দিকে ফিরে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, "তুই এখানে বসে কি এখন আমার স্বর্গের সিঁড়ি সাফ করছিস। তুইও যা। গিয়ে দেখ যাতে গরম দুধ আনে। এক-পো'র বেশী আনতে মানা করিস। বেশী দুধ আমি আবার হজম করতে পারি না।"

লম্বা বেরিয়ে গেলে বৃদ্ধ আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। বাঁ হাত দিয়ে আমার দিকে একটা কৌটো এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খোলো এটাকে।"

খুলে দেখি চুরণ রয়েছে। চুরণ এক রকমের মুখরোচক হজমী গুঁড়ো। ছোট-বেলায় খুব খেতাম।

আমাকে বিস্মিত করে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "খুব ভাল জিনিস বেটা। রাজা-কি মণ্ডির খোদ্ মনোহর পয়সাদের দুকান থেকে নিয়ে এসেছি। খেয়ে নাও একটু।"

খিদের জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করছে। ধরাসুতে সকালে যা খেয়েছি তার বিন্দু-মাত্র অবশিষ্ট নেই এখন। এ অবস্থায় হজমী খেলে নাড়ীভুঁড়ি ছাড়া আর কিই বা হজম হবে। খাওয়া উচিত হবে কি না ভাবতে থাকি। বৃদ্ধ আবার ক্ষেপে গেলেন, "এই হচ্ছে তোমাদের দোষ। তোমাদের—আজকালকার ছেলেদের। ভাল কথা তোমরা শুনবে না। আর তোমাকেই বা কি বলব? নিজের ছেলে—যাকে এত কষ্ট করে মানুষ করলুম সে-ই শুনল না।"

বুঝতে পারছি বৃদ্ধের ক্ষতস্থানে আঘাত দিয়েছি। তাড়াতাড়ি কৌটোটা খুলে বেশ খানিকটা চুরণ হাতে নিয়ে গলার মধ্যে ঢেলে দিলাম। মুখ বন্ধ করে কৌটোটা ফিরিয়ে দিলাম তাঁকে। দন্তহীন মুখে হাসি ফুটিয়ে বৃদ্ধ কৌটোটা রেখে দিলেন যথাস্থানে।···

খিদের জ্বালায় খিচুড়ীর পরিমাণটা বেশী হয়ে গিয়েছে। বেশ কষ্ট হচ্ছে। অনবরত পিপাসা পাচ্ছে। অথচ জল খাবারও জায়গা নেই পেটে। এখন একটু চুরণ পেলে কাজে লাগত। কিন্তু উঠে গিয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে চুরণ নেবার সামর্থ্য নেই।

তা হলেও খানিক বাদে বেরিয়ে পড়তে হল। সন্ধ্যের আগে আরও পাঁচ মাইল চড়াই ভেঙে সিল্‌কিয়ারী পৌঁছতে হবে। দেরি করলে রাত হয়ে যাবে। পথে নাকি বন্য জন্তুর উপদ্রব আছে।

ঘণ্টাখানেক বাদেই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। বেঁটে ও লম্বার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। বেঁটে ও লম্বাকে গালাগালির ফাঁকে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন তিনি। বলতে থাকলেন—আমার চেয়েও কম বয়সে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর হাত ধরে পাঞ্জাব থেকে আগ্রায় এসেছিলেন। সেদিন তাঁকে কেউ লালাজী ডাকত না। সম্বল ছিল পঁচিশটি টাকা। সেই সামান্য পুঁজিকে মূলধন করেই একটা মসলার দোকান দিয়েছিলেন। আর সেই দোকান থেকেই আজ তাঁর আগ্রায় দুখানা বাড়ি, দিল্লীতে একখানা। দু জায়গাতেই আড়ত আছে। এখন অবশ্য আইনত ব্যবসা তাঁর ছেলের। দিল্লীতে হেড অফিস করে ছেলেই সব দেখাশুনা করে। ছেলেকে ব্যবসা শিখে দিয়েছেন লালাজী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকেও আগ্রায় একখানা বাড়ি ও মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগ্রার অন্য বাড়িখানায় তিনি নিজে থাকেন। দিল্লীর বাড়ি থেকে যে ভাড়া আসে তাতেই তাঁর বেশ চলে যাচ্ছে। হয়তো তিনি এ ব্যবস্থা করতেন না, কিন্তু তাঁর ছেলেই তাঁকে করতে বাধ্য করেছে। এমন কি এই তীর্থে আসার কারণও ছেলের ব্যবহার। লালাজী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ তাঁদের পুরোহিত। তাঁদের নমস্য। বয়সকালে কার না

একটু-আধটু প্রেমে পড়তে মন চায়। সত্য কথা বলতে কী, লালাজী নিজেও তো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে···

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে ছেলে শ্যামসুন্দরের জন্মক্ষণে। আঠারো বছর বয়স থেকে যাকে সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে জীবনের সাথী বলে জেনে এসেছেন, তাকে হারিয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন লালাজী। আগ্রাকে আর সইতে পারলেন না। শ্যামসুন্দরের মায়ের নিঃশ্বাস যেন জড়িয়ে ছিল আগ্রার বাতাসে। দোকান তখন অনেক বড় হয়েছে। বাড়িও তুলে ফেলেছেন একখানা। তা থেকে ভাড়াও আসে বেশ কিছু। কর্মচারীদের হাতে দোকানের ভার দিয়ে এক মাসের শিশু শ্যামসুন্দরকে নিয়ে চলে গেলেন দিল্লী।

ব্যবসায়ী লোক। বেশীদিন বসে থাকতে পারলেন না। চাঁদনীচকে সস্তায় একখানা দোকান পেয়ে নিয়ে নিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন পাঁচ-ছ বছর। ছেলে আর ব্যবসার মধ্যে হারিয়ে গেল শ্যামসুন্দরের মায়ের স্মৃতি। সবাই তখন তাঁকে লালাজী বলে ডাকতে শুরু করেছে······

হঠাৎ থেমে গেলেন লালাজী। ওপরে উঠে যাওয়া সরু পথটি দেখে বেঁটেকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাও একটা রাস্তা মনে হচ্ছে—না রে?"

"জী।"

ওদের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান তিনি। ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

"এটাও নিশ্চয় সিল্‌কিয়ারী গেছে। পাহাড়ীদের পায়ে চলার সংক্ষিপ্ত পথ।" বলেই আমাকে ডাকেন, "খোখা!" আমাকে তিনি খোখা বলে ডাকছেন গোড়া থেকেই. "চল আমরা এই পাকদণ্ডী দিয়ে যাই।"

আমি কিছু বলার আগেই প্রতিবাদ করে উঠলেন অরোরাজী, "না না লালাজী, পাকদণ্ডী দিয়ে যেতে সবাই নিষেধ করেছে ধরাসুতে।"

আগেই লক্ষ্য করেছি কোন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না লালাজী। ক্ষেপে গেলেন তিনি, "আপনি ভেবেছেন পাহাড়ী রাস্তা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই আমার? জানেন সিমলাতে জন্মেছি আমি? এ ভাইয়া!" একজন স্থানীয় লোক কুড়ুল কাঁধে পাকদণ্ডীর দিকে যাচ্ছিল, ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল। "এ রাস্তা কোথায় গেছে?"

"গাঁয়ের ভেতর দিয়ে সেই সিল্‌কিয়ারী······"

শেষ করার আগেই লালাজীর অট্টহাসিতে থামতে হয় পাহাড়ী লোকটিকে। দম ফুরিয়ে গেলে অরোরাজীকে লক্ষ্য করে লালাজী বলেন, "আরে মশাই, বহু

বছর পাহাড়ে কাটিয়েছি, বুঝলেন? আপনাদের সুবিধা হবে। চলুন, চলুন এই পাকদণ্ডী দিয়ে।"

মিঃ অরোরা ও রঞ্জন কিন্তু এ পরামর্শ মেনে নিতে নারাজ। অথচ লালাজীও বদ্ধপরিকর। তিনি ঘোষণা করলেন, "আপনারা না যান আমি যাব। আমাকে অসহায় ভাববেন না। খরচ দিয়ে দুটো লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" জলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে, সেই পাহাড়ী লোকটির পিছু পিছু চললেন লালাজী। পাইনের পেছনে, পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তাঁর দুই দেহরক্ষীকে নিয়ে।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা সিল্‌কিয়ারীর কালি-কমলী ধর্মশালায় এসে পৌঁছলাম। চড়াই ভেঙে সকলেরই পায়ের শোচনীয় অবস্থা। আর হাঁটতে হবে না আজ। সারারাত বিশ্রাম পাবে পা দুখানি। ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে। অরোরাজী যথারীতি একখানা ভাল ঘর আদায় করলেন চৌকিদারের কাছ থেকে। আমাদের কারুরই এখন রান্না করার ক্ষমতা নেই। কুলিরাই জল আনবে রুটি বানাবে আর ভাজী ভাজবে। বিনা পারিশ্রমিকে নয়। ওদের খেতে দিতে হবে। সেও অনেক ভাল।

আমি কিন্তু বেশীক্ষণ জিরুতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। ধর্মশালাটা মোটামুটি ঘুরে এলাম একবার। অবাক কাণ্ড! লালাজীকে তো দেখছি না। পাকদণ্ডী দিয়ে এসেছেন। তিনি তো আমাদের আগে আসবেন। চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করি, "আমাদের আগে দুজন লোক নিয়ে কোন বুড়ো লালাজী এসেছেন?"

"না। তিনজনের কোন দল তো আজ ঘর চায় নি আমার কাছে।"

ঘরে ফিরে এসে খবরটা দিতেই সকলে একটু চিন্তিত হল। অজানা অচেনা জায়গা। চারিদিকে জঙ্গল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। কি-ই বা করতে পারি আমরা? তা হলেও লালাজীর জন্যে মনটা খারাপ হয়ে উঠেছে। খাওয়া শেষ হতে আটটা বেজে গেল। আধপোড়া লিট্টি গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না ঐ উদ্ভট স্বাদযুক্ত ভাজীর সঙ্গে। তবু জঠরাগ্নির তাগিদে কোন রকমে সেগুলো গিলে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন সকলে। সমবেত নাসিকাগর্জনের মধ্যে শব্দহীন আমি। জেগে আছি একা, ঘুম নামছে না আমার চোখে।

পাহাড়ের পেছনেই একাদশীর চাঁদ। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। সব জায়গায় তার আলো ছড়িয়ে না পড়লেও বাইরে বেশ ফর্সা। ভালই হয়েছে। লালাজী

যদি পথ ভুল করে থাকেন তবে এই জ্যোৎস্নালোক তাঁকে পথ দেখাবে।...ভুল ভাবছি। পথই যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে চাঁদের আলো কতটুকু সাহায্য করবে? ভুল পথে আলো থেকে লাভ কি? কিন্তু লালাজী পথ ভুল করেছেন কি? সেই পাহাড়ী লোকটিও তো তাঁর সঙ্গে গেছে। সে নিশ্চয়ই তাঁকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তবে লালাজী এখনও এলেন না কেন? এখানে যে আসতেই হবে তাঁকে। আর ভাবতে পারি না। উঠে বসি। মাথার কাছ থেকে জুতো আর পুলওভারটা হাতে নিয়ে রঞ্জন ও কার্লকে ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।

একটা থমথমে ভাব চারিদিকে। নিস্তব্ধ নির্জন। প্রাণের কোন স্পন্দন নেই কোথাও। রাস্তা পাহাড় শাল আর পাইনের বন, সব যেন অসাড় হয়ে আছে। যেদিক দিয়ে এসেছি সেদিকে এগিয়ে চলি। চাঁদের আলোতেও চারিদিক কেমন যেন অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে চাঁদ। তখন এই অস্পষ্টতা আরও প্রকট হচ্ছে। এদিকে আলো ওদিকে অন্ধকার। পাহাড়ের চূড়ায় ছায়া পড়েছে। কি একটা দুর্নিবার আকর্ষণে এগিয়ে চলেছি লক্ষ্যহীন ভাবে। ভয় করছে, ভাল লাগছে। থামবার শক্তি নেই আমার।

কতক্ষণ হেঁটেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। জলের শব্দ কানে আসছে। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে চলি। স্ফটিক-স্বচ্ছ একটা জলধারা অন্ধকারে ছল্‌ছল্ করে বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ঝরনা থেকে সৃষ্ট হয়ে ছুটে চলেছে কোন বৃহত্তর জলধারার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে মিলনের অপার আনন্দ লাভ করতে। বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। হঠাৎ একটা খস্‌খস্ শব্দ কানে এল! কোন প্রাণী জঙ্গলে গা ঘষতে ঘষতে আসছে বা যাচ্ছে। চমকে উঠে চারদিকে তাকাই। এ কি! এ পথে তো আমরা আসি নি। অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে শস্যক্ষেত্রের পাশে একটা জলধারার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কখন বড় রাস্তা থেকে নেমে এসেছি এই ভুট্টাক্ষেতে, মনেই পড়ছে না। ক্ষেতটা ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে পাহাড়ের কোলে মিশেছে।

যেমন করেই হোক এসে পড়েছি। এখন ফিরব কেমন করে? পথ হারিয়ে যদি এই নির্জন প্রান্তরে সারারাত ঘুরে বেড়াতে হয়, তবে...? মনে করার চেষ্টা করছি কোন্ দিক থেকে এসেছি। পারছি না। পেছন ফিরে কিছুক্ষণ হাঁটা যাক তো। কিন্তু খস্‌খস্ শব্দটা আবার কানে এল। জলের ধারে গভীর রাতে শুনেছি হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হয় এসব অঞ্চলে। নিরস্ত্র অসহায় একা আমি এই অপরিচিত প্রান্তরে। কবিত্ব উবে গিয়ে ভয় সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল একটা অজানা আশঙ্কায়। শব্দটা ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছে। পা দুটো মাটির

সঙ্গে গেঁথে গেছে। অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে। তবে কি এই জনহীন প্রান্তরে নেকড়ের হাতে প্রাণ দিতে হবে?

খস্‌খস্‌ শব্দটা আরও জোরে হচ্ছে। হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতে চিৎকার করে উঠি। পাহাড়ে আর পাইন বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুক্ষণ ভেসে বেড়ায় সে চিৎকার। তার পরে মিলিয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা চিৎকারের ধ্বনি আমার কানের পর্দায় আঘাত করে। তবে কি যা দেখেছি ভুল নয়? সত্যিই একাধিক মানুষ ঐ পাহাড় থেকে নেমে আসছে। কে আসছে? লালাজী নয় তো? ভয় মিলিয়ে গেল। জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে চলি। পায়ের দিকে নজর দিয়ে চলার মত মনের অবস্থা নয়। পাথরে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি। মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপের ঘষায় পা ছড়ে যাচ্ছে। তবুও এগিয়ে চলেছি। মানুষের সাড়া পেয়েছি এই প্রাণহীন প্রান্তরে। আমি মানুষের কাছে যাব।

ওরাই আমাকে চিনতে পারল আগে। কিষেণজীকে কৃতজ্ঞ প্রণাম জানায় বেঁটে। অর্ধ-অজ্ঞান লালাজীর মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে হাত ধরাধরি করে লালাজীকে বয়ে নিয়ে আসছিল ওরা। আমি কাছে যেতেই বসে পড়ল দুজনে। আর বইতে পারছে না। সেই থেকে প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা পাকদণ্ডী ভেঙেচে। লালাজী শব্দহীন। লম্বাও কথা বলতে পারছে না। বেঁটে জানায়, সেই পাহাড়ী লোকটি খানিক দূর গিয়ে রাস্তা দেখিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। বেঁটের মনে হয়, লোকটির নির্দেশ ভুলে ডান-বাঁয়ে গোলমাল করে ফেলেছেন লালাজী। ফলে এই ভয়াবহ দুর্গম অরণ্যে পাঁচ-ছ ঘণ্টা ঘুরপাক খেয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে অচল হয়ে পড়েছেন লালাজী।

লালাজীকে পিঠে তুলে নিলাম। মৃদু আপত্তি করে বেঁটে খুশি হয়ে চলতে থাকে আমার পেছনে। লম্বাও কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে বেঁটেকে অনুসরণ করে। পথ আমিও চিনি নে। তবে এদের যখন খুঁজে পেয়েছি, পথও খুঁজে পাব।

॥ সতেরো ॥

পাহাড়ের একটি চূড়াকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে আমাদের পথ। চলে গেছে ডাণ্ডিগাঁওয়ের দিকে। এ জায়গাটাকে বলে রান্নিধার বা খাল। কয়েকটি দোকান ও বিশ্রামের জায়গা আছে। জলেরও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পাহাড়ের চূড়োটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে। সহজেই ওপরে ওঠা যায়। ওপর থেকে বহুদূর দেখা যায়। রাস্তার পরেই ধাপে ধাপে ক্ষেত। এ-পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গিয়ে ও-পাহাড়ের

গা বেয়ে ওপরে উঠেছে। মাঝে মাঝে চাষীদের বাড়ি।

সিল্‌কিয়ারী থেকে খুব সকালে বেরিয়ে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে এই পাঁচ মাইল হেঁটে এসেছি আমি রঞ্জন ও কার্ল। কুলিরা ও দলের সবাই পেছনে আসছে। ঠিক হয়েছে আগে এসে ঘর দখল করব আমরা। ওরা এলে রান্না চড়বে।

পথে বন্দরপুছ্‌ পাহাড়কে নমস্কার জানিয়েছি। হাঁটাপথে এই আমাদের প্রথম তুষারাবৃত পর্বতমালা দর্শন। ঐ পর্বতমালা থেকেই মর্তে নেমে এসেছেন সূর্যকন্যা যমরাজভগিনী যমুনা।

খালা জায়গাটা বেশ জমজমাট। এখান থেকে একটা রাস্তা চলেছে উত্তরকাশী। আর একটি চকরোতা। চকরোতাতে Central Livestock Breeding Research Center আছে। চকরোতা ও দেরাদুনের মধ্যে বাস চলে নিয়মিত।

এসে গেলেন ওঁরা সবাই। লালাজী দেখছি বেশ তাজাই আছেন ব্র্যাণ্ডির গুণে। কাল রাতে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছি। এত যে দলাই মলাই গেছে এ হাড়-সর্বস্ব দেহটার ওপর দিয়ে, দেখে মনেই হচ্ছে না। মিসেস্‌ অরোরা অনেকটা সামলে উঠেছেন। গুড্‌ডু আর তার ছোট বোন মুন্নাও বাবার সঙ্গে সমান তালে হেঁটে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ মারামারি করে নি।

খাওয়ার শেষে ঢেকুর তুলতে তুলতে হাত পাতি লালাজীর সামনে। বালিশের তলা থেকে চুরণের কৌটোটা বের করে দেন লালাজী। বেশ কিছুটা চুরণ হাতে নিয়ে কৌটোটা ফিরিয়ে দিলাম। গুড্‌ডু লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ওদের প্রতি লালাজী সদয় নন। তাঁর ধারণা অরোরাজী বাধা দিয়েছিলেন বলেই কাল রাত্রে অত ধকল সইতে হয়েছে তাঁকে। গুড্‌ডুর জন্য প্রকাশ্যে কিছু করা সম্ভব নয়।

চলে আসি আমার কম্বলে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। পাঁচ মাইল হেঁটে পৌঁছতে হবে গাংনানী। কিন্তু শুতে গিয়েও উঠে বসতে হল।

"খোখা!" লালাজীর কণ্ঠস্বর আবার চড়েছে মনে হচ্ছে।

"জী।" ভয়ে ভয়ে জবাব দিই।

"তোমাদের কম্বলের তলায় জুতো কার?"

পাছে চুরি হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি ও রঞ্জন কম্বলের আড়ালে জুতো রেখে দিচ্ছি গোড়া থেকেই। লালাজীকে দেখেছি দোরগোড়াতে জুতো রাখতে। তাঁকে অনুকরণ না করায় কি অপরাধ হতে পারে বুঝতে পারছি না। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে লালাজীর বিচারবুদ্ধিতে কাজটা ভাল হয় নি। রঞ্জনের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দিতে পারলে এ যাত্রায় হয়তো নিস্তার পাব। লালাজীর সঙ্গে ওর তেমন জমে

ওঠে নি। একটা ভদ্রতার আড়াল রয়েছে এখনও। রঞ্জনকে আশা করি তিনি কোন কড়া কথা বলবেন না। নিঃশব্দে রঞ্জনকে দেখিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের কৈফিয়ত তলব করেন লালাজী, "কম্বলের তলায় জুতো রেখেছেন কেন?"

থতমত খেয়ে জবাব দেয় রঞ্জন, "পাছে চুরিটুরি—তাই…"

"চুরি! চোর আছে কে এখানে? খোকা, তুমি চোর? অরোরাজী, আপনি চোর? মিস্টার কার্ল, আপনি চোর?"

কার্ল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লালাজীর দিকে। আমরাও কিছু বলার সুযোগ পাই না।

লালাজী রায় দেন, "আপনারা যখন কেউ চোর নন, তখন আমিই চোর। বুঝতে পারছি আমার ভয়েই আপনি কম্বলের তলায় জুতো লুকিয়েছেন। জানেন, আপনি আমার ছেলের থেকে ছোট। আমি আপনার পিতৃতুল্য। আপনি আমাকে জুতো-চোর ঠাওরালেন? হায় অদৃষ্ট…" একবার থামলেন লালাজী। তাকালেন শূন্যপানে। বোধ করি তাঁর অন্তর্যামীকে নিজের দুরদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

লজ্জায় ও অপমানে রঞ্জন বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে। কী বলা যেতে পারে ঠিক করতে পারছে না। ফিস্ ফিস্ করে বাঙলায় আমাকে বলে, "এ বুড়োকে থামাবার একটা উপায় কর ভাই। নইলে তো আজ দুপুরে বিশ্রামের দফা রফা!"

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকি।

লালাজী বলে চলেছেন, "আর আজকালকার ছেলেদের কাছ থেকে এর বেশী সম্মান আশা করা ভুল। নিজের ছেলে যখন সেদিন ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের মেয়েটার হাত ধরে আমাকে প্রণাম করে জানাল যে সে তাকে বিয়ে করেছে, সেদিনই আমি বুঝেছি সে কথা। আচ্ছা মেয়েটা না-হয় তোর চেহারা দেখে তোকে ভালবেসে ফেলেছে। তাই বলে তাকে বউ করে ঘরে নিয়ে আসবি? জাত-ধর্মের বিচার করবি না? আমিও তো ওর ছোট-মাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। শ্যামসুন্দরের মায়ের স্মৃতির অসম্মান করে দিল্লীতে সেই পাশের বাড়ির মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলাম। পরে বুঝেছি যে আমার অন্যায় হয়েছে। ব্যাস্। বাড়ি আর মাসোহারা দিয়ে আজ আট বছর তাকে ভিন্ন করে দিয়েছি। নেহাৎ না ডেকে পাঠালে যাইও না তার কাছে। কিন্তু সে যে আমার স্ব-জাতের মেয়ে। আমি তো আর ব্রাহ্মণ বিয়ে করি নি। আচ্ছা তুমিই বল খোকা! ব্রাহ্মণ আর দেবতায় কি কোন তফাৎ আছে?"

চুপ করলেন লালাজী। প্রসঙ্গ পরিবর্তনে খুশি হয়েছে রঞ্জন। মিসেস্ অরোরার অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে হাসি। তাকে

একটা শব্দহীন রূপ দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে পেছন ফিরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন তিনি। তাঁর বিরাট বপুখানাকে আড়াল করার বৃথা চেষ্টা করছেন অরোরাজী। ভাষা-বিভ্রাটের জন্য ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে না পারলেও ঘটনাটা যে হাসির অথচ হেসে দিলে বিপদ, সেটা অনুমান করে গম্ভীর হয়ে ম্যাপ দেখছে কার্ল।

লালাজীর ডাক শুনেও মুখ খুলতে সাহস পাই না। ভয় হচ্ছে পাছে হেসে ফেলি। রঞ্জন কিন্তু সকলকে তাজ্জব বানিয়ে লালাজীর দিকে ফিরে আমার হয়ে অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দেয়, "জী নেই।"

"কি নেই?"

এই রে সেরেছে! ওকে নিয়ে কেত্তন আর ওই কি না ধুয়ো ধরছে! রঞ্জন কিন্তু গদ্গদ কণ্ঠে জ্ঞান দেয়, "তফাৎ নেই কোন। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন শাপভ্রষ্ট দেবতা। এক জন্মে মর্ত্যে বাস করে শাপমুক্ত হয়ে আবার ফিরে যান স্বর্গে।"

খুশিতে ভেঙে পড়লেন লালাজী। তাড়াতাড়ি চূর্ণের কৌটোটা ছুঁড়ে দিলেন রঞ্জনের দিকে। রঞ্জন বেশ খানিকটা ঢেলে নিয়ে কৌটো চালান করে গুড্‌ডুকে। সদ্ব্যবহারের পর গুড্‌ডু লালাজীকে ফিরিয়ে দেয় কৌটোটা। যথাস্থানে ওটাকে রেখে আবার বলতে থাকেন লালাজী, "অথচ আমার ছেলে এই সামান্য কথাটা জানে না। এম. এ. পাস করেছে না ঘণ্টা করেছে। মেয়েটি, মানে আমার বৌমা কিন্তু এসব জানে। আমাকে বলল, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ছেলে আমার পাপমুক্ত হবে। কিন্তু ও করবে প্রায়শ্চিত্ত? তা হলেই হয়েছে। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। অথচ যমরাজ যখন আমায় জিজ্ঞেস করবেন—'বাপ ও মায়ের স্নেহে একা মানুষ করলি ছেলেকে কিন্তু তার এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করেছিস?' তখন আমি কি কৈফিয়ত দেব? তাই তো ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজেই চলেছি যমুনোত্রী।"

হাসি মিলিয়ে গেল খিট্‌খিটে বৃদ্ধের পিতৃস্নেহের পরিচয় পেয়ে। নিজের সংস্কার থেকে বুঝেছেন ছেলে পাপ করেছে। সেই পাপস্খালনের জন্য ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ পিতা দুর্বল শরীর নিয়ে চলেছেন এই দুর্গম তীর্থে।

"বউমা কিন্তু জানে না যে যমুনোত্রী যাচ্ছি আমি। জানলে কি আর আসা যেত! ওকে বলেছি প্রয়াগ যাব।" অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। শ্রান্ত হয়ে এবারে চুপ করলেন লালাজী। ছেলে-বউকে ঠকিয়ে আসতে পারার আনন্দে মশগুল হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

যথাসময় রওনা দিয়ে ডাণ্ডালগাঁও পৌঁছলাম। একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে

লালাজী যেন কাকে প্রণাম করছেন। কাছে গিয়ে দেখি একখানা সাইনবোর্ড—'ওয়ে টু সিমলা'। জন্মস্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন তিনি।

সিমলি পেরিয়ে এলাম। একটা চটি রয়েছে। এখান থেকে উত্তরকাশী যাবার রাস্তা আছে। গাংনানী আরও আড়াই মাইল। পথ চলতে বেশ ভালই লাগছে। পাইনে ছাওয়া পথ। পাইনের পাতা পচে মনমাতানো গন্ধে আকুল করে রেখেছে বাতাস। কেমন যেন একটা নেশা ধরিয়ে দেয় মনে। পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষরা পাশ দিয়ে চলে যায়। কখনও বা ভেড়ার পালের সামনে পড়ে যাই। সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিতে হয় ওদের।

এসে পৌঁছলাম গাংনানী। একটা উপত্যকা। সুপ্রশস্ত না হলেও সুদীর্ঘ। বেশ উর্বরা। এখনও দিনের আলো আছে। ভারি সুন্দর জায়গাটি। বেশ জনবহুল। একটা সরকারী ডিস্পেন্সারী ও কিছু দোকানপাট রয়েছে। মুদি মিঠাই মনোহারী এমন কি দর্জির দোকান পর্যন্ত। জরাজীর্ণ সিঙ্গার মেশিনের শব্দের মধ্যে যন্ত্রের পৃথিবীকে স্মরণ করার চেষ্টা করি।

দোকান থেকে তরিতরকারী কিনে ফেলি কিছু। চৌকিদারের সঙ্গে দেখা করে দোতলায় ভাল একখানা ঘর নিলাম। ধর্মশালার সামনে রাস্তা। রাস্তার পরে সবুজ শস্যশ্যামল প্রান্তর। তার পরে যমুনা। যমুনার সঙ্গে এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

যমুনা যুগে যুগে হোলি খেলার সাক্ষী হয়েছে। শুধু বৃন্দাবনের নয়—এখানেও। কয়েক মিনিটে এখান থেকে পৌঁছনো যাবে তিলওয়ারী। একটা গ্রাম। আটশ যাট মাইল দীর্ঘ যমুনার তীরে অমন তো কতশত গ্রাম আছে। সেসব গ্রামেই হোলি খেলা হয়। কে তার হিসেব রাখে? তবুও সবাই তিলওয়ারীর সেই হোলির কথা মনে রেখেছে আজও। রঙ দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছিলেন তদানীন্তন টিহরীরাজ। উনিশশ তিরিশের তিরিশে মে। আইন-অমান্য আন্দোলনের যে তীব্র প্রবাহে আসমুদ্র হিমাচল মথিত হয়েছিল, সে মন্থন থেকে তিলওয়ারী বাদ পড়ে নি। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে যমুনার তীরে পড়ে থাকা এই ক্ষুদ্র তিলওয়ারীর অধিবাসীরা। তাঁরা আয়োজন করেছিলেন এক মহতী সভার। সভা শেষ করতে দেয় নি টিহরীরাজের রাইফেলধারী সৈন্যরা। দেশপ্রেমিকের রক্তে রাঙা হয়েছিল তিলওয়ারীর মাটি আর যমুনার জল।

টিহরী এখন স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যমুনা আজও বয়ে চলেছে তিলওয়ারীর পা ধুয়ে। পরাধীন ভারতের মুক্তিযজ্ঞভূমি তিলওয়ারী। তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো। ভারত তোমায় ভোলে নি। বাংলা তোমায় কোন দিন ভুলবে না।

॥ আঠারো ॥

ওঁরা সবাই এসে পৌঁছলেন। তরকারী দেখে খুব খুশি হলেন মিসেস্ অরোরা। যখন শুনলেন এর পরে পথে আর তরকারী পাওয়া যাবে না তখন বলে বসলেন, রাতের রান্নার ভার তাঁকেই ছেড়ে দিতে হবে। কুলিরা দুঃখিত হল। অরোরাজী ভরসা দিলেন, রান্না না করলেও খেতে পাবে তারা। এবারে খুশি হল ওরা। কিন্তু যত সহজে খাবার জুটবে ভেবেছিল অত সহজে জুটল না। মিসেস্ অরোরা ওদের অস্থির করে তুললেন ফরমাশের চোটে। শুধু কুলিরাই নয়, অরোরাজী এবং রঞ্জনও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে মিসেসের ফরমাশে। গুড্ডু আর মুন্নাকে নিয়ে কার্ল বারান্দায় লুডো খেলছে। আমাকে আমন্ত্রণ জানায় গুড্ডু। যাচ্ছিলামও সেদিকে। কিন্তু বাধা পেলাম লালাজীর ডাকে।

শয্যাশায়ী লালাজীর শরীর মর্দন করছে বেঁটে ও লম্বা। মাঝে মাঝে চাপের মাত্রাধিক্য ঘটছে। আর লালাজী প্রথমে আর্তনাদ ও পরে চাপদেনেওয়ালার শ্রাদ্ধ করছেন। চাপটা দেখছি লম্বার তরফ থেকেই বেশী সামঞ্জস্যহীন হচ্ছে। আমি সামনে যেতেই উঠে বসলেন লালাজী। চাপাচাপি বন্ধ হল। লালাজী বললেন, "খোখা, তুমি একটু মন্দিরে যাও। পুজো দিয়ে এসো।" তার পর লম্বাকে আদেশ করলেন, "গোসাঁই, তুই আজ মোটেই ভাল মালিশ করতে পারছিস না। খোখার সঙ্গে যা। দোকান থেকে টাটকা ভালো মিষ্টি কিনে পুজো দিয়ে আয়।"

বেরিয়ে পড়লাম। ধর্মশালার পাশেই দোকান। কুলিরা এখনও ছুটোছুটি করছে মিসেসের নির্দেশে। এর চেয়ে রান্না করাই সহজ ছিল ওদের কাছে। একখানা তামার থালা নিয়ে এসেছিল গোসাঁই। মিষ্টি কিনে তার ওপর সাজিয়ে নিলাম। মন্দির এখান থেকে দেখা যায় না। সামনের বাড়িগুলোতে ঢাকা পড়েছে। দোকানদার বলল, খুব কাছেই। বড় জোর মাইল আধেক হবে।

ওপরের রাস্তাটা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না। এক কথায় রাজী হয়ে গেল গোসাঁই। বলল, "চলুন। একটু দেরি হবে, হোক না। আর ভাল লাগে না ঐ বুড়োর গালাগাল শুনতে। আমি খাটিও বেশী আর গালও খাই বেঁটের চেয়ে অনেক বেশী। এবারে বেঁটে বসে মালিশ করুক। ইচ্ছে করেই বুড়োকে ব্যথা দিয়েছি যাতে আমাকেই আপনার সঙ্গে মন্দিরে পাঠায়।"

চাষীদের কয়েকখানা বাড়ি ডিঙিয়ে রাস্তার ওপর এসে উঠলাম। বাড়িগুলো ভারি সুন্দর। তকতকে ঝকঝকে। মেঝেটা কাঠের। সুন্দর একখানি বাড়ির সামনের বারান্দায় কয়েকজন যাত্রী পোঁটলা-পুঁটলি খুলে বসেছেন। ধর্মশালাতে

স্থান না পেয়ে এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। মাথা পিছু কিছু কিছু পয়সা দিতে হবে বাড়িওয়ালাকে।

আমাদের দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন লালাজী। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন গোসাঁইকে, "এত দেরি করলি কেন? খোখা যখন সঙ্গে ছিল তখন তো ভাঙের আড্ডায় গিয়ে বসতে পারিস্ নি!"

ভাঙের প্রতি টান কিন্তু লালাজীরও কম নয়। পথের দুধারে ভাঙের গাছ দেখে তিনি বহুবার থামতে আদেশ দিয়েছেন বেঁটে ও লম্বাকে। ওদের সঙ্গে নিজেও ভাঙের পাতা ছিঁড়ে পুঁটলি বোঝাই করেছেন। নিখরচায় এই মহামূল্য বস্তুটি পেলে ছাড়বেন কেন? এ পথে ভাঙের মূল্য শুধু নেশার জন্য নয়, চড়াই-উতরাই ভাঙতে ভাঙতে দম ফুরিয়ে এলে সবুজ ভাঙের পাতা চিবুলে দম ফিরে আসে।

কি উত্তর দেবে ভাবতে থাকে গোসাঁই। আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলে, "খোখাজী চাইলেন ওপরের ঐ রাস্তাটা দেখতে।"

"ওপরের রাস্তা! সোজা নদীর ধার দিয়ে মন্দিরে না গিয়ে— খোখা!"

লালাজীর কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারছি একটা অঘটন অনিবার্য। কোন রকমে সাড়া দিই, "জী।"

"ওপরের রাস্তায় গেলে কেন?"

"রাস্তাটা বড় সুন্দর।"

"সুন্দর।...কোথায় একমনে একাগ্রচিত্তে সোজা মন্দিরে যাবে। আর তোমরা ...রাস্তা বাছাই করতে করতে, এদিকে সেদিকে দেখতে দেখতে হেলেদুলে সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে এলে? এদিকে ক্ষুধার্ত আমি বসে আছি পবিত্র প্রসাদের পথ চেয়ে!"

এখন যদি ঠিকমত চাল না দিতে পারি তা হলে আর দান রাখা যাবে না। তাই অকম্পিত কণ্ঠে বলি, "সেইজন্যেই তো আমরা ঐ রাস্তা দিয়ে গেলাম!"

বিস্মিত হয়ে লালাজী আমার দিকে তাকালেন।

আমি বলতে থাকি, "নদীর ধারের রাস্তাটা বড্ড নোংরা। পুজো নিয়ে ও-পথে যেতে আমার মন চাইল না। বায়নোকুলার দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম ওপরের রাস্তাটা বেশ পরিষ্কার। মন্দিরে যাব—না হয় ভাঙব একটু চড়াই আর উত্‌রাই। তবু তো পরিষ্কারমত যাওয়া যাবে। তা ছাড়া এই পবিত্র প্রসাদের পথ চেয়ে আপনি এখানে বসে আছেন!"

"তাই বল।"

মুখে একখানা পেঁড়া তুলে নিয়ে বললেন লালাজী, "শুধু ঐ পরিষ্কার রাস্তাটা দিয়ে যাবার জন্য যা একটু দেরি হয়েছে ?"

"জী। মন্দিরে গিয়ে একটুও দেরি করি নি। গঙ্গানারায়ণ কুণ্ডের জলে হাতমুখ ধুয়েই গোসাঁই মন্দিরের ভেতর চলে গেছে।"

"তুমি বুঝি হাত না ধুয়েই মন্দিরে গিয়েছিলে ?"

"জী না। আমি আর ভেতরে যাই নি।"

আবার ফেটে পড়লেন লালাজী, "কি বললে ? হিন্দুর ছেলে হয়ে মন্দিরে ঢুকলে না ?"

এ অবস্থায় যে ভরাডুবি হতে পারে ধারণাও করি নি। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

"কি করব বলুন ? ঢোকার উপায় ছিল না।"

"কেন ?"

"আপনি হাতে করে মিষ্টি নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে বলেছেন। থালাটাকে কি করি ? আপনার পুজোর থালা। বাইরে রেখে গেলে হয়তো মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আর ফিরে পেতাম না। অথচ খালি থালা নিয়েও মন্দিরে যাওয়া যায় না। তাই তো থালা হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল আমায়।"

"সাবাস বেটা! হুঁশিয়ার নওজোয়ান! কিষেণজী তোকে দয়া করবেন। যাক অনেক পরিশ্রম করেছিস, এবারে প্রসাদ নে।"

বেছে বেছে বেশ কয়েকটা মিষ্টি হাতে তুলে নিই। সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে পেঁড়াখানা মুখে পুরলেন লালাজী।

॥ উনিশ ॥

গাংনানী ছেড়ে এসেছি বহুক্ষণ। মিঃ ও মিসেস্ অরোরা মুন্নার সঙ্গে পেছিয়ে পড়েছেন। গুড্ডু কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমানে পা চালাচ্ছে। অবিশ্যি বিনা খেসারতে নয়। সকালে পেট-ভরা খাবার খেয়ে বেরিয়েছি সবাই। তবুও প্রতি আধমাইল যেতে না যেতেই নাকি ওর পেটের 'চুহা'রা ডন মারতে থাকে। ফলে বহু কষ্টে সঞ্চয় করে রাখা আমাদের পেস্তা বাদাম আখরোট আর চকলেট ওর পেটের চুহাদের শান্ত করার চেষ্টা করছে। পাহাড়ী পথ। ওজন যত কমে ততই ভাল। গুড্ডু কিন্তু মোটেই এ নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী নয়।

আর দু বেলা হাঁটব না। সকাল থেকে যতটা সম্ভব একেবারে হেঁটে গিয়ে তার পর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করব। দু দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি তাতে অনেক সুবিধে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটা বড়ই কষ্টকর। তা ছাড়া বিকেলের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি নামে।

লালাজী আর গাংনানী ছাড়তে পারেন নি। কাল শেষরাতে লোটা নিয়ে বেশ কয়েকবার ছুটোছুটি করতে হয়েছে তাঁকে। মিসেস্ অরোরার কড়াপাক বোধ করি তাঁর পাকস্থলী বরদাস্ত করতে পারে নি। বুড়ো মানুষ। পাহাড়ী রাস্তা। সাহস পান নি রওনা দিতে। আমরাও তাঁকে আজকের দিনটা বিশ্রাম করতে পরামর্শ দিয়েছি। যাবার পথে আর আমরা তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারব না। ফেরার পথে হয়তো দেখা হবে। কোথায় কি ভাবে বলতে পারি না। তখন তাঁর সঙ্গলাভের অবসর আমাদের ভাগ্যে হবে কিনা তাও জানি না। না হোক, তবু স্নেহান্ধ ধর্মান্ধ পিতা যমুনোত্রীর মন্দিরতলে দাঁড়িয়ে পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে যান। তাঁর উদ্বিগ্ন ও অশান্ত মন যেন শান্ত হয়।

আজ কার্লই আমাদের পথের প্রেরণা। গাংনানী থেকে প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও যেন নবরূপে আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। এতদিন ওকে গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়েছে। ভেবেছি দার্শনিক মানুষ, কথাবার্তা কম বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ দেখছি ও একটা কথার ফুলঝুরি। এই বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম—নিজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবেও পরিবর্তন আনে। গম্ভীরকে বাচাল করে, বাচালকে গম্ভীর করে তোলে।

কার্ল বলছে, "পৃথিবীর সব পাহাড় একই রকম। পাহাড়ী দেশগুলোর মধ্যেও একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। পাহাড় সমুদ্র আর আকাশ মানুষের একাত্মবোধকে সজাগ করে তোলে।"

কয়েকটি পাহাড়ী মেয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে গাঁয়ে ফিরে চলেছে। টানা টানা চোখ। উন্নত নাসিকা। লালচে গাল। কালো একমাথা চুল। দীর্ঘাঙ্গী। স্বাস্থ্যবতী। ওরা অবাক হয়ে দাড়ি-গোঁফময় বুদ্ধিদীপ্ত কার্লের দিকে তাকায়। কার্লও মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবি এও প্রকৃতির নিয়ম। স্থান কাল নির্বিশেষে পুরুষ এমনি করে নারীকে দেখেছে। সৌন্দর্যের সাধনা করেছে। হাজার হাজার মাইল দূর দেশের এক অধিবাসী আমার দেশের নারীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য তাকে বাচালে পরিণত করেছে। প্রকৃতি আর নারীর বেলায় জার্মানী আর ভারতে কোন তফাৎ নেই।

চলে যায় ওরা ত্বরিত পায়ে, স্খলিত বসনে নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা।

আশ্চর্য দেশ! পুরুষেরা ঘরে বসে আড্ডা দেয়। বড়জোর দোকান করে। আর মেয়েরা ক্ষেতে বীজ বোনে, বনে কাঠ কাটে, রান্না করে স্বামীদের খাওয়ায়। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর আমল থেকে বহুপতিপ্রথা আজও চলে আসছে এদেশে। এদেশে জন্মালে দশটা-পাঁচটা ডেবিট-ক্রেডিট করতে হত না। ঘরে বসে পায়ের ওপর পা রেখে দিনগুলো দিব্যি মন্দাক্রান্তাতালে কাটিয়ে দিতে পারতাম।

কার্ল বলছে তার দেশের কথা। ওর বাবার কথা…। ব্যাভেরিয়ার ওবেরামের্গো গ্রামে তার জন্ম। বাবা ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন চাষী। তাঁর ইচ্ছে ছিল কার্ল বৈজ্ঞানিক হবে। চেষ্টাও করেছিলেন। স্কুল থেকে বেরোবার পর ওকে ভর্তি করে দিয়েছিলেনে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কার্ল কিন্তু বরদাস্ত করতে পারল না বিজ্ঞানকে। পরীক্ষার নম্বর দেখে বাবা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে লুড্‌উইগ্‌স্ট্রাসেতে একটা কাফে খুলে দিলেন ছেলেকে। খুব পসার না হলেও মোটামুটি ভালই চলছিল দোকানটা। এমনি সময় শুরু হল যুদ্ধ। অন্যান্য জার্মান যুবকদের মত কার্লও চঞ্চল হয়ে উঠল। জার্মানী সারা বিশ্বে মুক্তি আনবে। ফুয়েরারের এই মহৎ প্রচেষ্টায় তার কোন অংশ থাকবে না? তার বন্ধুরা যখন একটার পর একটা দেশের ওপর দিয়ে মার্চ করে যাবে, উড়িয়ে যাবে পবিত্র স্বস্তিক, তখন মিউনিকের লুড্‌উইগ্‌স্ট্রাসের কাফেতে বসে হিসেব মিলাবে সে? না—না। তা পারে না। সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্যবাদের নিষ্পেষণে জর্জরিত জনসাধারণের মুক্তির মানসে সেও একদিন বিমান-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে এল। স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা কাঁদলেন। যিশুর কাছে কার্লের মঙ্গল কামনা করলেন। আর কাঁদল পলিন। কৈশোরের সাথী, যৌবনের সাকী। সজল চোখে সে দাঁড়িয়ে থাকল এয়ারপোর্টের ফেন্সিং ধরে। কম্পমানা ঠোঁট দুটি বুঝিবা মাদার মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাল যুদ্ধের আশু অবসানের জন্য। পলিনের কোমল আর সুন্দর দেহের রেখাগুলো ছোট থেকে ছোট হয়ে একটা বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল ওর চোখের সামনে।

কিন্তু এ তো মানুষের মুক্তি নয়। এ যে মনুষ্যত্বের নিধনযজ্ঞ। নিরপরাধ নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। সুখের সংসারকে বোমা মেরে মুছে ফেলা। দেশপ্রেমিককে দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়ে কন্‌সেন্‌ট্রেশান্‌ ক্যাম্পে নিয়ে আসা। বলির পশুর মত হত্যা করা। এ তো সে চায় নি। সে চেয়েছে বিশ্বের শোষিত জনগণের মুক্তি। অভিশাপ কুড়োতে চায় নি কারও। তার দেশকে সবাই দস্যুর দেশ বলে অভিহিত করুক এ যে তার কাম্য ছিল না। এই বর্বরতার আকর্ষণে সে ফেলে এসেছে তার পূজনীয় পিতাকে, ছেড়ে এসেছে তার প্রাণের পলিনকে।

কিন্তু উপায় নেই। নাৎসী সৈনিক মানে যুক্তিহীন হৃদয়হীন একটা প্রাণময় যন্ত্র। শুধু ওপরের হুকুমে ফলাফল না ভেবে কাজ করে যাও। বোমা ফেল, মেশিনগান চালাও, কামান দাগ। কোটি কোটি মানুষের কত সাধে গড়ে তোলা, কত সাধনায় রক্ষা করা এই পৃথিবীর চেহারাটা পালটে দাও। সুজলা সুফলা মাটি হারিয়ে ফেলুক তার শ্যামলিমা। পুড়ে ছাই হয়ে যাক সব। সেই শ্মশানের ওপরেই উড়ুক তোমার নিশান। নাৎসীর বিজয়কেতন।

একদিন রক্তপাত বন্ধ হল। স্বস্তিকের বদলে জার্মানীতে উড়ল হাতুড়ী ও কাস্তে, রেখা ও তারা, ইউনিয়ান জ্যাক আর তেরঙা ফরাসী নিশান। বন্দী হয়ে আমেরিকান সৈন্তদের করুণা ও নজরের মধ্যে গাঁয়ে ফিরল কার্ল।

ফিরে এসে আর বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। তাদের বাড়িঘর এমন কি কিছুটা ক্ষেত-খামারও বোমায় ধ্বংস হয়ে গেছে। দেখা হয় নি পলিনের সঙ্গে। এক গভীর রাতে তাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে। আর সে ফিরে আসে নি।

দোকানটা কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে ছিল অক্ষত দেহে। ব্যবসার মধ্য দিয়ে কার্ল ভুলতে চাইল তার ব্যথা আর বেদনাকে, বাবা আর পলিনকে, জন্মভূমির দুর্দশার কথাকে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিজের মানসিক দৈন্ত কিছুতেই তাকে সুস্থ মনে ব্যবসা করতে দিল না। একদিন দোকান বেচে দিয়ে ফিরে এল নিজের গাঁয়ে। সেখানে আরও অশান্তি। বোমা-বিধ্বস্ত বাড়িখানার দিকে তাকালে কেবলই বাবার কথা মনে হয়। ওবেরামের্গোর পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে যেন পলিনের পায়ের শব্দ পায়। বাবা আজ কোথায়? কোথায় গেলে দেখা পাবে পলিনের? এক দিন তার সব ছিল। আজ কিছু নেই। থাকা-না-থাকার কোন স্থিরতা নেই এ জগতে। তবে কেন এই রক্তপাত? কেন এই দ্বন্দ্ব? কেন এই স্বার্থপরতা? বাবা কত পরিশ্রম করে এই জোতজমা বাঁচিয়েছেন। আজ তাঁর কি কাজে আসছে এসব? কত ভালবাসত তাকে পলিন। একবার কার্লের খুব অসুখ হয়েছিল। তার মাথার কাছ থেকে সে উঠতে চাইত না সারাদিন। কি সাহায্য করতে পেরেছে কার্ল পলিনের সেই চরম লাঞ্ছনার রাতে? কতটুকু সাধ্য মানুষের? কিসের আকর্ষণে মানুষ তবে এই তাসের ঘর বাঁধে?

গ্রামেও টিকতে পারল না কার্ল। জলের দরে জোতজমা বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শান্তির আশায়। দু বছর ঘুরে বেড়াল ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের পথে পথে। তার পর আবার সে স্থায়ী হল মিউনিকে। ভর্তি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশুনা শুরু করল দর্শন নিয়ে। ভাল লাগল। ডক্টরেট পেল। চাকরির আমন্ত্রণও এসেছে। কিন্তু রাজী হয় নি। স্বাভাবিক জীবনের প্রতি সব মোহ তার ঘুচে গেছে। সে বেরিয়ে

পড়েছে বিশ্বপর্যটনে। পায়ে হেঁটে ভারতে এসেছে আজ ছ মাসের ওপর। এখান থেকে তিব্বত হয়ে চীনে যাবার ইচ্ছে আছে। তার পরে কি করবে, কোথায় যাবে, সে নিজেই জানে না।

"শেঠজী, জ্যরা শুনিয়ে তো!"

একজন কুলি আমাদের ডাকছে। হয়তো অনেকবার ডেকেছে। কিন্তু এর আগে কানে যায় নি। কার্লের কাহিনী শোনায় তন্ময় ছিলাম।

সে আবার বলে, "আপ সুই দেনে সকতা?"

সুই? সে তো সবাই দিয়ে এসেছে। এখানে বসে কার আবার সুই দেবার শখ হল? রাস্তার পাশে ঝরনার ধারে ডাণ্ডিতে বসে আছে একটি মেয়ে। রোগপাণ্ডুর মুখশ্রী। যন্ত্রণায় সর্বশরীর সংকুচিত।

ছোটবেলায় বাবার তত্ত্বাবধানে ইঞ্জেকশান দিতে শিখেছিলাম। বহুদিন চর্চা করি নি। ঠিকমত দিতে পারব কিনা জানি না। তবুও এগিয়ে গেলাম মেয়েটির কাছে। জিজ্ঞেস করি, "কি হয়েছে আপনার?"

"বড্ড যন্ত্রণা, এই ইঞ্জেকশানটা দিয়ে আমাকে বাঁচান।"

মেয়েটি আমাকে ডাক্তার ভেবে বসল নাকি? ভাবুক গে। তীর্থের পথ। ভাবনা চিন্তার স্থান নেই এখানে। পারলে মানুষের কাজে আসো। সহযাত্রীকে সাহায্য কর। হাত বাড়িয়ে বললাম, "দেখি কি ইঞ্জেকশান?"

লেবেলটা পড়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ইণ্টারভেনাস্ নয়। মেয়েটি ততক্ষণে সিরিঞ্জ স্পিরিটের শিশি আর তুলো বের করে ফেলেছে। বুঝতে পারছি ইঞ্জেকশান দিয়ে ওকে এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই না দিলে আমারও রেহাই নেই।

কার্ল রঞ্জন আর গুড্‌ডু ততক্ষণে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেরি হবে বুঝতে পেরে ওদের আর আটকে রাখি না। ওরা চলে গেল। আমি পড়ে রইলাম অপরিচিতা সেই মেয়েটির পাশে। আত্মীয়া-অনাত্মীয়া পরিচিতা-অপরিচিতার কি পার্থক্য এ সংসারে। পরমাত্মীয় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেয়েছিল। অপরিচিতা শবরী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সারাজীবন পথের পাশে প্রতীক্ষা করেছেন। হাওড়ায় যখন রেলে চেপেছিলাম তখন তো অনেককেই চিনতাম না। চিনতাম না লালাজীকে, জানতাম না কার্লকে, পরিচয় ছিল না অরোরা পরিবারের সঙ্গে। অথচ তাঁদের চাইতে আজ আমার আপনার জন কে আছে?

দ্বিধাজড়িত ভাবে আমাকে সিরিঞ্জটা নাড়াচাড়া করতে দেখে মেয়েটি বলে, "কোন রকমে ওষুধগুলো আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিন। না-হয় একটু ব্যথা লাগবে। আর সইতে পারছি না এ যন্ত্রণা।" মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন ক্রমেই খাদে নেমে

যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গভীর খাদ। তার পরেই যমুনা। কুলনাশিনী রাধার ব্রজলীলার সাক্ষী যমুনা।

ইঞ্জেকশান দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ল মেয়েটি। এলোখোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলের বন্যা নেমে এল মাটিতে—ধূসর প্রস্তরময় পথে। যতদূর জানি এ ইঞ্জেকশানের এই ধর্ম। তবু ভয় করছে। যদি খারাপ কিছু হয়? এর চেয়ে রঞ্জনদের যেতে না বলাই ভাল ছিল। ওরা থাকলে একা এই দুশ্চিন্তার বোঝা বইতে হত না।

তবুও বিচলিত হলে চলবে না। মেয়েটির একখানা হাত হাতে তুলে নিই। নাঃ, নাড়ীর অবস্থা খারাপ নয়। ডাণ্ডিওয়ালারা এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। এবারে শঙ্কিত ভাবে কাছে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এ সময় ওর জানাশোনা কেউ কাছে থাকলে ভাল হত। জিজ্ঞেস করি ডাণ্ডিওয়ালাদের, "এর সঙ্গে আর কে আছেন?"

"এক মাইজী ও তার বড় ভাই। ওঁরা এগিয়ে গেছেন।"

"মাইজীটি কে?"

"এই মাইজীর দোস্ত।"

"কেমন লোক? দাদাটিরও কাণ্ডজ্ঞানে বলিহারি। অসুস্থকে নিয়ে তীর্থে এসে নিজেরা পা চালিয়ে এগিয়ে গেছেন!"

"তাঁদের কোন গলতি নেই শেঠজী। মাইজী তাদের এগিয়ে গিয়ে যমুনা চটিতে জায়গা নিতে বলেছেন। পথে হঠাৎ ব্যথাটা বেড়ে যায়।"

"জল—একটু জল।" জ্ঞান ফিরে এসেছে মেয়েটির। একজন ডাণ্ডিওয়ালা ফ্লাস্কের দিকে হাত বাড়ায়। তাকে নিষেধ করে আমার ওয়াটারবটল্ থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে মেয়েটির সামনে ধরি। আস্তে আস্তে জলটা নিঃশেষ করে সোজা হয়ে উঠে বসতে চায়। কিন্তু ঠিক পেরে উঠছে না দেখে সাহায্য করতে হয় আমাকে। ভাবলেশহীন চোখে একবার চারিদিক দেখে নিয়ে তারপর দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "যমুনা চটি আর কতদূর?"

"মাইল দুইয়ের বেশী হবে না।"

"দু……মাইল!"

"চড়াই বোধ করি শেষ হয়ে গেছে। কতক্ষণ লাগবে আর যমুনা চটিতে পৌঁছুতে! তা ছাড়া দুর্গম তীর্থে এসেছেন। যমুনোত্রীর পবিত্র মন্দির দর্শন করে পরম পুণ্যার্জন করতে চলেছেন। অল্পের জন্য ধৈর্য হারাবেন না।"

ডাগর চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকায় মেয়েটি। তার পরে বলে, "ধৈর্য

আমি হারাই নি। যমুনোত্রী আমাকে পৌঁছুতেই হবে। পুণ্যার্জন নয়, প্রাণের মায়ায়। যমুনোত্রীতে পুজো দিলে রোগমুক্ত হব আমি। আমাকে যেতেই হবে। লছমিনারায়ণ, ডাণ্ডি উঠাও। জল্‌দি চল।"

॥ কুড়ি ॥

ওয়াজিরী পেরিয়ে এলাম একটু আগে। যমুনা চটি থেকে রওনা হতে আজ অন্য দিনের চেয়েও দেরি হয়ে গেছে। কাল গভীর রাত অবধি আমাদের শরীর মালিশ করতে হয়েছে। না করলে বোধ করি আজ হাঁটতেই পারতাম না। তাই আজ সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য রোজই সবার শেষে রওনা হয়ে সকলের আগে গিয়ে পরের চটিতে পৌঁছই। অনেকে তাই আমাদের পাঞ্জাব মেল বলে ডাকতে শুরু করেছে। দুর্গম তীর্থপথে মানুষের পরিচয় তার চলৎশক্তি।

ওয়াজিরী যমুনা চটি থেকে দু মাইল। রওনা হয়েই পেরুতে হয়েছে কাঠের একটা ঝুলন্ত সাঁকো। কাজটি সহজ নয়। তারপরে পাহাড়ের গা কেটে চড়াই ও উত্‌রাই। ওয়াজিরীতে দুটি চটি আছে। আর আছে চায়ের দোকান। কয়েক মিনিট থেমে চা খেয়ে নিয়েছি। বেশ একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। ওয়াজিরীর উচ্চতা ৫৬৬০ ফুট। আজ আমরা তিনজন শুধু একসঙ্গে চলেছি। পায়ের অবস্থা খারাপ বলে গুড্‌ডু মায়ের সঙ্গে পেছনে আসছে। ওর পেটের 'চুহা'রা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে এতক্ষণে। গুড্‌ডুর দুরবস্থার কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে।

আজ অপেক্ষাকৃত আস্তে চলা যেতে পারে। সবসুদ্ধ আট মাইল হাঁটতে হবে। এখন আমরা চড়াই ভাঙছি। যতই উঠছি কার্ল ততই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। বলেছে ওর দেশের কথা। পাহাড়ী প্রদেশ ব্যাভেরিয়ার কথা। আল্‌প্‌সের কোলে শুয়ে থাকা ওবেরামের্গোর কথা। চলতে চলতে হঠাৎ কথা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ায় সে। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠসঙ্গতের রেশ। আমার কাছ থেকে বায়নোকুলারটা নিয়ে চোখে লাগিয়েই চীৎকার করে ওঠে কার্ল, "পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি।"

"কি ?"

বায়নোকুলারটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে দূরের পাহাড়টা দেখিয়ে দেয় সে। পাহাড়টা মোটেই খাড়া নয়। খুব বেশী উঁচুও নয়। ধীরে ধীরে উঠে গেছে। ঘন জঙ্গলে ঘেরা। তারই মাঝে সরু একটি পথ—আঁকাবাঁকা—ছায়াছন্নিবিড়। কয়েকটি মেয়ে চলেছে যে পথে-গান গাইছে—কাঠ কুড়োচ্ছে। মাঝে মাঝে

হারিয়ে যাচ্ছে—আবার দুরবীনে ধরা দিচ্ছে। ওদের যৌবন-সমৃদ্ধ অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পদাঘাতে পাহাড়ের বুকে সৌন্দর্যের প্রস্রবণ সৃষ্টি করছে। গানের কথা শুনতে পাচ্ছি না। তবে অপরূপ মুখভঙ্গিমা থেকে বুঝতে পারছি জীবনের সুরকে প্রিয়তমের উদ্দেশে উৎসর্গ করছে ওরা। আরও হয়তো দেখতাম খানিকক্ষণ। কিন্তু রঞ্জন কেড়ে নেয় বায়নোকুলার। দু চোখ ভরে দেখতে থাকে সেই স্বর্গীয় লীলা।

কার্ল বলতে শুরু করে, "শুনলে অবাক হবে, এদেশের মেয়েদের পোশাক অনেকটা আমাদের দেশের মত। এরাও আমার ব্যাভেরিয়ার মেয়েদের মতই সুন্দরী।"

প্রতিবাদ করার কিছু নেই। এদের কয়েকজনকে যদি আম্বেরী বা টলিউডে নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে বোধ করি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকাদের আসন টলে উঠবে।

কার্ল বলে চলে, "এরাও দেখছি নাচ-গান খুব ভালবাসে। আমার ব্যাভেরিয়ার মেয়েদের মতই। ব্যাভেরিয়ার লোকসঙ্গীত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতের অন্যতম। প্রতি দশ বছর অন্তর আমাদের গাঁয়ে একটা সঙ্গীত সম্মেলন হয়। সারা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় তিনশ বছর ধরে চলে আসছে এই সম্মেলন। পলিনকে নিয়ে আমিও একবার যোগ দিয়েছিলাম।" থেমে যায় কার্ল। যাকে ভোলার জন্য দর্শনের চর্চা করে চলেছে, বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছে, তার হারিয়ে যাওয়া মুখখানাই কি খুঁজে পেয়েছে এই পাহাড়ী মেয়েদের মাঝে? তার চলার ছন্দটি আবার সজীব হয়ে ওর চোখে ধরা দিয়েছে ঐ কিন্নরীদের মধ্যে? কয়েক মিনিট নীরবে কেটে যায়। তার পরে কার্ল বলে, "এখানকার মেয়েরাও দেখছি আমার দেশের মেয়েদের মতই পরিশ্রমী। মনে হয় এদেশের ছেলেমেয়েরাও আমাদের মত মদ খেতে ভালবাসে।"

কাঁধের ব্যাগ থেকে হুইস্কীর বোতলটা টেনে বার করে কার্ল। ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢেলে দেয় খানিকটা। সুরাই ওর বিগত ও বর্তমান জীবনের যোগাযোগের সেতু।

একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে যমুনার অপর পারে এলাম আমরা। খানিকটা হেঁটেই আর একটা সেতু। সেতু পেরিয়েই 'রানা'—একটা গ্রাম। এখানে একটা জুনিয়র হাই স্কুল আছে। মাঝারি গোছের ধর্মশালাও রয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে থামব না। আরও দু মাইল হেঁটে হনুমান চটিতে গিয়ে রাতটা কাটাব।

রানার পর বেশ কিছুটা সমতল। তার পর প্রথমে চড়াই পরে উত্‌রাই।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু পায়ে-চলা-পথ। একটা বাঁকের মুখে যমুনা। ওপারে যেতে হবে। পুল পেরিয়েই হনুমান চটি। নামের ইতিহাস জানি না। তবে হনুমান দেখতে পাচ্ছি না। সাত হাজার ফুট ওপরে উঠেছি। বেশ শীত-শীত করছে।

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ অরোরা আঁতকে ওঠেন, "বড় খোখা। দেখি তোমার গা!" লালাজী আমার খোকা নাম চালু করে দিয়েছেন। রঞ্জন আপ্‌সে বড় খোকা হয়ে গেছে। রঞ্জনের কপালে হাত দিয়ে মিসেস্ বলেন, "হ্যাঁ, যা ভেবেছি! জ্বর হয়েছে।" তার পর মিস্টারের দিকে ফিরে বললেন, "মায়নে কাহা, একবার জ্যরা শুনো তো!"

'মায়নে কাহা' কথাটা মিসেস্ অরোরার 'ওগো শুনছো'র হিন্দী-রূপ।

"কি বলছ?"

"তোমাকে হাজার দিন বলি নি যে চীৎকার করে আমি কথা বলতে পারি না?"

"চীৎকার করবে কেন? এই যেমন আস্তে আস্তে বলছ, তেমনি আস্তেই বল।"

"মায়নে কাহা, নজ্‌দীক আওগে?" মিসেসের কণ্ঠস্বর নিঃসন্দেহে বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। তা হলেও মিস্টার আর তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পান না। একান্ত অনুগতের মত মিসেসের কাছে এসে দাঁড়ান। খুশি হয়ে মিস্টারকে হুকুম করলেন মিসেস্, "শিগ্‌গীর একটা বিছানা পেতে দাও। বড় খোকা শুয়ে পড়বে। আর কুলিদের বলে দাও, রুটি বানানো হয়ে গেলে যেন উনুন নিভিয়ে না ফেলে।"

লজ্জা পাই আমি, "অরোরাজীকে আবার কষ্ট দিচ্ছেন কেন? আমি বিছানা করে দিচ্ছি।"

"তুমি চুপচাপ বসে থাকো দেখি।" ধমকে দেন মিসেস। দোটানায় পড়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মিস্টার মিসেসের আদেশ পালন করতে প্রবৃত্ত হন। মুন্না এসে বাবাকে সাহায্য করতে থাকে। গুড্‌ডুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে আমাকে বলেন মিসেস্, "কষ্ট দিচ্ছি মনে করছ কেন? ভারী তো একটা বিছানা পাতা। হাতীর দেহটা রয়েছে কি করতে?"

উচিত না হলেও না বলে পারছি না, মিস্টার ও মিসেস্‌কে একটা দাঁড়ি-পাল্লার দু'দিকে দাঁড় করিয়ে দিলে নিঃসন্দেহে মিসেসের দিকটা মাটি স্পর্শ করবে।

বিছানা পাতা শেষ করে অরোরাজী কুলিদের উদ্দেশে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মিসেস্ ফরমান দিলেন, "মায়নে কাহা।"

থামতে হল অরোরাজীকে।

স্বস্থান থেকে মিসেস্ একখানা গামছা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

"একবার দোকানটাও ঘুরে এস। বড় খোকা আজ রাতে রুটি খাবে না। ওকে খিচুড়ী রেঁধে দেব।" কথা শেষ হবার পরেও মিস্টার গামছা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে আবার ক্ষেপে উঠলেন মিসেস্, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এই সামান্য কাজটুকু করতে অত ভাবার কি আছে?"

"দেখছি তোমাকে। আর ভাবছি লালাজীর কথা।"

"লালাজীর ভাবনা আবার এর মধ্যে এল কি করে?"

"ভেবে দেখলাম লালাজী আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। তিনিও দুবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে আসেন নি।"

মিসেস্ যে মিস্টারের দ্বিতীয় পক্ষ এ খবর আমরা আগেই যোগাড় করেছি। প্রথমার মৃত্যুর পর অরোরাজী মিসেস্‌কে গ্রহণ করেছেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে এখন বিলেতে পড়াশুনা করছে।

মিস্টারের সাহস দেখে আশ্চর্য হই। কিন্তু এখনও আশ্চর্য হবার পালা শেষ হয় নি। কোমলকণ্ঠে মিসেস্ বলে উঠলেন, "লালাজীর দ্বিতীয় পক্ষে আর তোমার দ্বিতীয় পক্ষে তফাত আছে জনাব।" বিপাকে পড়ে সন্ধিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি, "লালাজীর বুদ্ধির তারিফ করে সময় নষ্ট না করে এবারে যা বললাম তাই কর গে। তা না হলে তোমরা যখন গোগ্রাসে গিলবে, বড় খোকাকে তখন তোমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে।"

বেরিয়ে গেলেন অরোরাজী। মিসেস্ রঞ্জনকে বললেন, "এবারে শুয়ে পড় দেখি। মাথা ধরেছে নিশ্চয়ই।"

রঞ্জন ঘাড় নেড়ে তাঁর অনুমান সমর্থন করে।

"মুন্না! তুমি তো সুন্দর মাথা টিপতে পার। দাদার মাথাটা একটু টিপে দাও তো।"

কাজ করতে খুব ভালবাসে মুন্না। মার কথায় উৎসাহিত হয়ে রঞ্জনের মাথার কাছে এসে বসে। ছোট হাত দুখানির কোমল আঙুল কটি দিয়ে রঞ্জনকে যন্ত্রণা-মুক্ত করতে চায় সে।

চোখ বুজে শুয়ে আছে রঞ্জন। হয়তো ভাবছে কোথাকার সে, কোথাকার মিসেস্ অরোরা আর কোথায় বসে মাথা টিপছে মুন্না। নারীর পরিচয় সে জননী, সে স্নেহময়ী সেবিকা—সে মানবী।

॥ একুশ ॥

আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। দুপুরেই আমরা পৌঁছব যমুনোত্রী।

আজ আর তেমন জোরে পা চালাই নি। রঞ্জনের শরীর ভাল নয় বলে মিসেস্ অরোরা আজকের দিনটা হনুমান চটিতে বিশ্রাম নেবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রঞ্জন রাজী হয় নি। ঈপ্সিত বস্তু নাগালের মধ্যে এসে গেছে। এখন আর এক মুহূর্তও তর্ সইছে না। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দিগন্তপ্রসারী শুভ্র হিমবাহের এক প্রান্ত গলে সৃষ্ট হয়েছে এক শব্দময়ী সুনীল জলরেখা। দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নেমে এসে যমুনোত্রীর মন্দিরেব পাদস্পর্শ করে ধেয়ে চলেছে অবিরাম—যুগ থেকে যুগান্তরে। এই দৃশ্য চোখে দেখতে পাব। সেই মন্দিরতলে দাঁড়াতে পারব। ঐ জলধারায় ধুয়ে ফেলতে পারব জীবনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ।

আজ সবাই একসঙ্গে চলেছি। যে কোন সময়ে একের সাহায্য অন্যের লাগতে পারে। ঋষিকেশ থেকে একসঙ্গে রওনা হয়েছি। লক্ষ্যেও পৌঁছব একসঙ্গে।

খরশালীতে বিশ্রাম করলাম কিছুক্ষণ। এখানকার উচ্চতা ৮১০০ ফুট। চার মাইলে এগারশ ফুট উঠে এসেছি। এখান থেকে ঝালার একটা অতি দুর্গম পাকদণ্ডী আছে। সে পথে ঝালার দূরত্ব কত জানি না। জানলেও লাভ নেই কিছু। সে পথ সাধারণ যাত্রীর অগম্য। কাজেই আমাদের আশি মাইল ঘুরে ঝালা পৌঁছতে হবে। ঝালা থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র ষোল মাইল।

আজ সকাল থেকেই হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে ফুলপ্যাণ্ট পরে নিয়েছি।

আর মাত্র চার মাইল। আমাদের বেগ গেল বেড়ে। মুন্নাও ওর ছোট ছোট পা দুটিকে যথাসাধ্য দূরে দূরে ফেলছে। কিন্তু দু পায়ের দূরত্ব সংক্ষেপ করতে হল। শুধু মুন্নার নয়, আমাদেরও। ধস নেমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আসল রাস্তা। পি ডাবলু ডি-র কুলিরা কাজ করছে। কোন রকমে ফুটখানেক চওড়া জায়গাকে দুরমুশ করে দিয়েছে। মুহূর্তের অসাবধানতায় পাশে পা পড়লে তলিয়ে যাব ঝুরঝুরে মাটি আর কাঁকরের মধ্যে। সার বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। একে একে আবার রাস্তায় এসে উঠলাম। মুন্নাকে ঘাড়ে করে কার্ল পৌঁছল সবার শেষে। মুন্নার সারা গায়ে মাটি। জিজ্ঞেস করতেই কার্ল সহাস্যে জানায়, "পড়ে গিছল।"

"কোথায়?"

"ঝুরো মাটির মধ্যে। সুন্দর একখানা পাথর দেখে লোভ সামলাতে পারে নি।" কার্লের কণ্ঠস্বর অকম্পিত। যেন কিছুই হয় নি। জিজ্ঞেস না করলে হয়তো বলতই না। অথচ আর একটু হলে কি বিপদ ঘটে যেত! স্বল্পভাষী জাতি। বিপদে অধীর হয় না। পরাজয়ে হারায় না আত্মবিশ্বাস। তাই তো বোমাবিধ্বস্ত খণ্ডিত দেশ

আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিজয়ী দেশসমূহের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মুন্নাও কিন্তু কার্লের মত নির্বিকার। হাতে একটুকরো সুন্দর বাদামী রঙের পাথর। তলিয়ে যাবার সময়ও পরমপ্রিয় পাথরখানি হাত থেকে ছাড়ে নি।

ভৈরবঘাটিতে এসে থামলাম। আর মাত্র দেড় মাইল। কিন্তু সব সময় মাইল মেপে দূরত্ব ঠিক করা যায় না। মন্দিরের সামনের একটা দোকানে চা খেয়ে জিরিয়ে নিলাম। যাত্রীরা অনেকেই পূজো দিয়ে নিচ্ছেন। এরপর একটানা ওপরে উঠতে হবে। দেড় হাজার ফুটেরও বেশী।

খাড়া চড়াই ভাঙছি। বহু জায়গায় ধস নেমে আসল রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সরু পথ। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। বন্দরপুছ পর্বতমালা এগিয়ে এসেছে। তার মাথায় মেঘের শিরস্ত্রাণ, গায়ে তুষারের পোশাক। অনবরত রঙ পালটাচ্ছে সে পোশাকের।

যাত্রীরা সংঘবদ্ধ হয়ে চলেছে। ছোট ছোট দলগুলো মিলেমিশে বড় বড় দলে পরিণত হয়েছে। কোন ভেদাভেদ নেই। পোশাক ছাড়া নেই কোন পার্থক্য। ভাষা ধর্ম অর্থ সব মিথ্যা। একই উদ্দেশ্যে চলেছে সবাই। উদ্দেশ্যই ঘটিয়েছে মিলন।

আর কত দূর? পা দুখানি যে শরীরের ভার আর বইতে চাইছে না। কুলিরা পেছিয়ে পড়েছে। আমরাও কয়েক পা হাঁটছি আর বিশ্রাম করছি। বিশ্রামের জায়গা নেই। পথের ওপরেই বসে পড়ছি। মুন্নাকে পালা করে কাঁধে নিতে হচ্ছে। ক্যামেরা আর দূরবীন বয়ে নেওয়াই প্রাণান্তকর। তার ওপরে মুন্না।

বন্দরপুছকে দেখতে পাচ্ছি না। ধোঁয়ার মত মেঘ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। দূরের যাত্রীরা মেঘের আবরণে ঢাকা পড়েছে। ক্রমাগত ওপরে উঠছি। আরও কত উঠতে হবে কে জানে?

রাস্তাটা দেখি আবার নীচের দিকে নেমে গেছে। সর্বনাশ! ভুল হয় নি তো? এরকম ক্ষেত্রে নীচের রাস্তা সাধারণত ভুল হয়। একবার ভুল পথে গেলে যমুনোত্রী পৌঁছবার আশা ত্যাগ করতে হবে। দিনের পর দিন দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াতে হবে পাহাড়ে পাহাড়ে। কিন্তু আর যে কোন রাস্তাও দেখছি না। দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই। দূরবীন দিয়ে চারিদিকটা দেখে নিলাম একবার। লাভ হল না কিছুই। কুয়াশা আর মেঘের জন্ত দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি পেছনের যাত্রী-দের জন্ত অপেক্ষা করব?

শেষ পর্যন্ত কার্ল বুদ্ধি যোগায়, "এ রাস্তা দিয়েই এগিয়ে যাওয়া যাক। ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যেও যদি বন্দরপুছকে না দেখতে পাই, তা হলে আবার

ফিরে আসব এখানে·।" পকেট থেকে আখরোট ও বাদাম বের করে পথে ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলল কার্ল।

পা ঘষতে ঘষতে অতিকষ্টে তাকে অনুসরণ করি—আর কত দূর ?

এ কি! কুয়াশা কোথায় গেল ? কার নির্দেশে অদৃশ্য হল ? কোন্ মন্ত্রবলে অপসৃত হল সব আবরণ—সকল বাধা ?

ঐ তো আকাশছোঁয়া বন্দরপুছ—তার বিশ হাজার সাতশ বিশ ফুট উঁচু সুবিশাল রূপালী দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে আমাদের। কাছে—আরও কাছে। ওরই দুটি চূড়ার মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে এক ধবলরেখা। ঐ রেখাই কি তবে চম্পাসার হিমবাহ ? আমরা কি যমুনোত্রী এসে গেছি ?

"যমুনা মায়ীকি জয় !"

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল সেই বন্দনা। সামনের যাত্রীরা পৌঁছে গেছেন উঁচু জায়গাটার ওপর।

আমরাও জয়ধ্বনি করে উঠি। যমুনার জয় নয়। আমাদের জয়। যমুনাকে জয় করেছি আমরা। দুর্গম গিরিপ্রাচীরের পরপারে প্রকৃতি তোমায় আড়াল করে রেখেছিল। সকল বাধা-বিপত্তি জয় করে আমরা তোমার কাছে এসেছি। ভগীরথের বংশধর আমরা।

প্রাণহীন হিমবাহ প্রাণময়ী ঝরনাধারায় বিকশিত। মর্ত্যের সঙ্গে মিলনের আকুলতায় স্বর্গের অচল রেখা সচল হয়েছে। ক্ষিপ্তবেগে পূব থেকে পশ্চিমে ধেয়ে চলেছে স্বচ্ছ ক্ষীণকায়া অশান্ত উত্তাল যমুনা। পিতামহ গুরু ও ভ্রাতৃহত্যা ভূমি কুরুক্ষেত্রের পাশ দিয়ে প্রবাহমানা যমুনা, শাজাহানের মর্মর-স্বপ্নের প্রতিবিম্বকে বুকে ধরে রাখা যমুনা, হাজার হাজার পুণ্যার্থীর রক্ত দিয়ে উদযাপন করা পূর্ণকুম্ভের পূর্ণতীর্থ প্রয়াগের যমুনা।

বিঘে দুই জমি। তাও ছোট-বড় পাথরে বোঝাই। অসমতল। ত্রিভুজাকৃতি। দুদিকে পাহাড়—চম্পাসার হিমবাহের পদপ্রান্তে একযোগে প্রণতি জানাচ্ছে।

ঝরনার খানিকটা ওপরে একটা ছোট্ট পাথরের মন্দির। মন্দিরের নীচে পাঁচ-ছটা উষ্ণ কুণ্ড। যমুনার ওপরে একটা কাঠের পুল। পুলের আগে কয়েকটি দোকান ও পোস্ট-অফিস। আলাদা পোস্ট-অফিস এখানেই দেখছি। পথে দেখেছি নির্দিষ্ট এক একটা দোকানই পোস্ট-অফিসের কাজ করে। দোকানী পোস্টমাস্টার হয়েছে, না পোস্টমাস্টার দোকানী হয়েছে—জিজ্ঞেস করি নি। দোকানগুলোর সামনে পাথর আর কাঠের তৈরি দুখানা দোতলা বাড়ি। কালি-কমলী ও সিন্ধু-পাঞ্জাব ধর্মশালা।

কালি-কমলীর ধর্মশালায় ঘর নিয়েছি আমরা। স্যাঁতস্যাঁতে ছোট একখানা ঘর। একটি করে দরজা ও জানলা। সারাদিনে তিন চার ঘণ্টা রোদ যেখানে একমাত্র সম্বল, বছরে কয়েক মাস সব সময় বরফ পড়ে যেখানে, সেখানে ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হবে না কেন?

কম্বল বিছিয়ে, কম্বল জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁপছি। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। খিদেও পেয়েছে খুব। অথচ দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। আগে জিরিয়ে নিই। পরে খাবার কথা ভাবা যাবে। কিন্তু এ জিরোবারই বা কি মানে হয়? ঘরে একটা কুপি জ্বলছে। তারই আলোয় একে অন্যের কাঁপুনিকে পরখ করছি। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। অথচ ঠিক অন্ধকার হচ্ছে না। ঘড়ির দিকে তাকাই। অবাক কাণ্ড। মোটে দুটো বাজে। হায় মা যমুনা! এই তোমার দেশে দুপুরের চেহারা! আমরা যখন আপিস পালিয়ে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মাঠে ছুটি, তোমার দেশের লোকেরা তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে আঁধারের প্রতীক্ষা করে!

চৌকিদার এসে চড়াও হয়, "শেঠজীরা স্নান সেরে নিয়েছেন?"

স্নান? বলে কি লোকটা! এই প্রচণ্ড শীতে গোল্লায় যাবার পরিকল্পনা পেশ করতে এসেছে? কিন্তু তার যে কোন কারণ নেই। ঘরে ঢোকার আগেই ওকে নগদ এক টাকা নজরানা দিয়েছি। আদর-যত্ন করলে ফেরার সময় আরও কিছু দেবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এই কি তবে ওর আদর-যত্নের নমুনা? রক্ষা কর বাবা! তোমার যত্ন মাথায় থাক্! ঐ স্নান শব্দটি উচ্চারণ করে তুমি আর আমাদের হাড় কাঁপিও না। লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। আবার সেই একই প্রশ্ন করে। ওর রাজত্বে এসেছি—জবাব না দেওয়াটা ভাল দেখায় না। বললাম, "না।"

"তা হলে আর দেরি করবেন না। কুণ্ডে স্নান করে নিন। তবিয়ত আচ্ছা হবে।"

এই শীতে স্নান করলে তবিয়ত আচ্ছা হবে? বললাম, "আমাদের সারা শরীর ব্যথায় টন্‌টন্ করছে।"

"তা তো করবেই। তাই বলছি তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিন। ব্যথা ও শীত দুই-ই কমে যাবে।"

চৌকিদার ঠিকই বলেছে। বদ্রীনাথের অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলে বসে আছি। বুঝিয়ে বলতেই সকলে কম্বল ছেড়ে উঠে পড়ে। শীত আর বেদনার হাত থেকে রেহাই পেতে যমুনোত্রীর কুণ্ড তো ছাড়, নরককুণ্ডে গিয়েও ডুব দিতে রাজী আছে ওরা!

স্নান করে সর্বাঙ্গ গরম হল আমাদের। বেশ ঝরঝরে লাগছে। স্নানের কুণ্ডটির জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। তিনটে কুণ্ডের জল খুবই গরম। উনুনের কাজ করে। রুটি ডাল চাল আলাদা আলাদা করে রেঁধে কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে বসে আছে অনেকে। মাঝে মাঝে চেখে দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিজে সিদ্ধ-রুটি, ডাল ও ভাত রান্না হয়ে যাবে। আমরা আজ রান্নার হাঙ্গামা করব না। খাওয়াটা দোকানেই সেরে নেব। এখানে কয়েকটি খাবারের দোকান আছে। ফুলকা (রুটি), সবজি ও লাড্ডু পাওয়া যায়।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। ছোট মন্দির। পাথরের ওপর পাথর গেঁথে তৈরি, কারুকার্য ও শিল্পচাতুর্যহীন ছোট্ট একটি ঘর। ভেতরে শুনেছি যমুনার একখানি কল্পিত প্রতি-মূর্তি আছে। বরফ পড়ে প্রতি বছর মন্দির ভেঙে যায়। পরের বছর গ্রীষ্মকালে সুবিধামত জায়গায় আবার গড়ে ওঠে নতুন মন্দির। গত চার পাঁচ বছরের ভিত-গুলো এখনও দেখলে চেনা যায়। কোন প্রাচীনতার বড়াই নেই যমুনোত্রীর মন্দিরের। প্রয়োজনও নেই কিছু। ধর্ম যেখানে গতিশীল, ভক্তি যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত, মন্দির সেখানে অবান্তর। গুপ্তযুগের আগে এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের আগে পর্যন্ত মন্দির নির্মাণের খুব প্রচলন হয় নি ভারতে। মহেন্‌জোদড়োতেও কোন মন্দির পাওয়া যায় নি। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে উপাসনার পদ্ধতি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। নীল আকাশের নীচে প্রজ্বলিত করা হত হোমাগ্নি। চলত স্তোত্রপাঠ। মন্দিরের ছিল না কোন প্রয়োজন।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে তখন মন্দির-শিল্প একটা আর্টে পরিণত। বিরাট ভবনের সঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থার অবলুপ্তির একটা সহজাত সম্পর্ক রয়েছে। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যকে গ্রাস করল গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যবাদ। আবার রোম যখন সৌধমালা শোভিত বিশাল নগরীতে পরিণত, ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে পোপ তখন অস্তাচলগামী। ব্যাসিলিকা ও ভ্যাটিক্যান যখন তৈরি হল, পোপের প্রবল প্রতাপ তখন ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। আড়ম্বর হচ্ছে পতনের সূচনা। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের সময় বাড়ি তৈরি হয় প্রয়োজন অনুসারে। সৌন্দর্য ও বিলাসিতার মোহে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় হল সভ্যতার শেষ কথা।

তাই তো ছুটে এসেছি আমরা—কলকাতা-বম্বে দিল্লী-আগ্রা হাজার হাজার মাইল দূরের ব্যাক্টেরিয়া থেকে। ধর্মনির্বিশেষে জাতিনির্বিশেষে অবস্থা নির্বিশেষে মানুষ ছুটে এসেছে এখানে। এসেছে অন্ধ, এসেছে খঞ্জ, এসেছে রোগী, ভোগী আর যোগী। জরা আর শোক, ব্যথা আর বেদনা, লোভ আর মোহকে সমর্পণ করতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এখানে। সভ্য জগতে জীবন-সংগ্রামের হাত থেকে সাময়িক

পরিত্রাণের জন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছি এই মন্দিরতলে।

দরজা বন্ধ হলেও বারান্দা যাত্রীতে বোঝাই। কেউ চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুঁজে। কেউ বা দেশের লোকের সঙ্গে গল্প করছেন, ছেড়ে আসা ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের কথা বলছেন। কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। কানে যেন বাংলা শব্দ ভেসে এল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। একজন বৃদ্ধা মহাভারত পড়ছেন সুর করে। উচ্চারণ থেকে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে। পাঠান এক ভদ্রমহিলা পাশে বসে অভিনিবেশ সহকারে পাঠিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি কি শুনছেন অমন করে? উনি তো বাংলা বোঝেন না! অথচ চোখে মুখে তো কোন কৃত্রিমতার ছাপ দেখতে পাচ্ছি না। ভাষা জানেন না তবু ভাব বুঝছেন—ভাল লাগছে। পরম শ্রদ্ধাভরে শুনে চলেছেন—

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।'

॥ বাইশ ॥

ক্যাঁচ, কোঁচ, ক্যাঁচ,।

দরজার আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। অয়োরাজী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সূর্য-প্রণাম করছেন। মানে সূর্যের উদ্দেশে প্রণাম করছেন। যমুনোত্রীর সূর্যকে দর্শন করা ভাগ্যের কথা। বেলা দশটার আগে বড় একটা দেখা দেন না। এখানকার আপিস শুরু হয় বেলা এগারোটায়। কাজেই লেট্ হবার ভয় নেই। কেদারবদ্রীর মন্দিরে দেখেছি পুজো আরম্ভ হয় খুব সকালে। অতএব সূর্য বেচারাকে সেখানে সকাল সকাল হাজিরা দিতে হয়। যমুনোত্রীর পুজো শুরু হবে খরশালী ও ভৈরব-ঘাটি থেকে রওনা দেওয়া যাত্রীরা এসে পৌঁছলে।

আমাদেরও কোন তাড়া নেই। উঠেই বা কি করব এই হিমের মধ্যে। তার চেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলে কাজ দিত। রাগ হচ্ছে ঘুম ভাঙার জন্তে। অয়োরাজীর ওপরে নয়—দরজার ওপরে। যদিও জানি এখানে পছন্দমত জিনিসপত্র বয়ে আনা সম্ভব নয়। স্থানীয় কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি হয় এখানকার বাড়িঘর। দরজার প্রয়োজন এখানে বরফ আর হিমেল হাওয়া রুখবার জন্ত। এখানে শব্দহীন দরজা আশা করা ভুল।

আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি। কিন্তু হয়ে ওঠে না। চৌকিদারের গলা শুনে কম্বল গায়ে উঠে বসতে হল। গতকাল সেই স্নানের পরামর্শের পর থেকে ওকে

আমরা শুভাকাঙ্ক্ষী বলে স্বীকার করে নিয়েছি।

"শেঠজী আজ পূর্ণিমা। পাহাড়ীরা আসতে শুরু করেছে। এরপরে আরও ভিড় বাড়বে। তখন কুণ্ডে নামতেই পারবেন না, আরতিও দেখতে পাবেন না। কাজেই চট্‌ করে স্নানটা সেরে মন্দিরে চলুন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর অমত করতে পারলাম না। নটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

সমস্ত গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে কুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করি। পাড়ে রেখে স্নান সেরে নেব। আমরা কেউই তালা আনি নি। টাকাপয়সা ক্যামেরা ও বায়নোকুলারের বোঝা সঙ্গেই নিতে হল। একবার ভাবি এখানে এসেও মনের দৈন্য ঘুচল না। পরক্ষণেই অভিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ স্মরণ করি—তীর্থে যত পুণ্য তত পাপ। যত সৎ তত অসৎ। যত সাধু তত চোর।

পুলের ওপর এসে উঠি। নড়ে উঠল। শুধু পুল নয়—আকাশ—পাহাড়—নদী—মন্দির। চোখের সামনের সমস্ত জগৎ। নড়ে উঠল আমাদের সভ্য মন। কেবল নড়ল না আমাদের পা।

দশ-পনেরোটি পাহাড়ী যুবতী কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে খুলে ফেলছে ওদের দেহাবরণ। বিবসনা হয়ে টুপ্‌ টুপ্‌ করে কুণ্ডের জলে লাফিয়ে পড়ল। শুরু হল জলকেলি। কুণ্ডে তুফান উঠল। তুফান উঠল আমাদের মনে। শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত বনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চাইছে। তাকিয়ে আছি কুণ্ডের জলে। সেখানে ওদের মেঘের মত কালো চুল পড়েছে এলিয়ে, মোমের মত নরম দেহ থেকে থেকে উঠছে নেচে। ডুবছে—ভাসছে। নেমে এসেছে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। যৌবনের ছন্দ। মানুষের দেহ—যে দেহ বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছেন মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে—যে দেহ প্রকৃতির কোলে হয়েছে পুষ্ট ও প্রস্ফুটিত। শিক্ষা ও সভ্যতার কারাগারে যাদের সাবলীল বিকাশ হয় নি ব্যাহত। ঐ দেহের জন্য সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ট্রয় নগরী শ্মশান হয়েছে। রাজা রাজ্যহীন হয়েছেন। মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছে। সংসারী সন্ন্যাসী হয়েছেন। মানুষের সেই শাশ্বত দেহ কুণ্ডের উষ্ণ জলে ভাসছে। মোহ নয়, বিকার নয়, মানুষ মানুষকে দেখছে। যমুনা মানুষকে দেখছেন। আমরা মানুষকে দেখছি।

চৌকিদারের অনুরোধে এগিয়ে চলি। পাড়ে এসে দ্বিধা করি। কতটুকুই বা জায়গা। তার মধ্যে দশ-পনেরোজন ওরাই। কোথায় দাঁড়াব? আর কেমন করেই বা ওদের স্পর্শ বাঁচিয়ে স্নান করে উঠব? চৌকিদার আবার তাগিদ দেয়। জলে নেমে পড়ি। জলকেলি ব্যাহত হল। কিন্তু তা সাময়িক। শীতের দেশ। হয়তো

বহুদিন স্নান করে নি ওরা। শরীর আর মনের আশ মিটিয়ে স্নান করে নিচ্ছে। একে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ছাট মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে এসেও লাগছে। মনে করার কিছুই নেই। একে অন্যকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। ভুল করে দু-একবার আমাদের পা ধরেও টানাটানি করছে। পরে বুঝতে পেরে ছেড়ে দিচ্ছে। উন্মুক্ত আকাশতলে যমুনোত্রীর কুণ্ড। মাটির সন্তান আমরা। মায়ের স্নেহবারি-রূপ কুণ্ডে শ্রান্তি দূর করছি। শক্তি সঞ্চয় করছি। পুণ্যস্নান করছি।

পুজো দিয়ে ধর্মশালার দিকে এগিয়ে চলেছি। পুলের গোড়ায় পাহাড়ী মেয়েরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায়, "শেঠজী! আমাদের দেশে এসেছেন, আমরা বড় গরীব, আমাদের কিছু সাহায্য করুন। আজ পূর্ণিমা—মা যমুনার পুজো দেব।"

একটি টাকা সামনের মেয়েটির হাতে গুঁজে দিতেই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওরা সবাই। যেন রাজৈশ্বর্য পেয়েছে। এই ওদের দেশ—গঙ্গা-যমুনার দেশ।

পুল পেরিয়ে এপারে আসা গেল। ওপরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। আর সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। সোজা গিয়ে দোতলায় উঠব।

ঘরে ঢুকেই আঁতকে উঠলেন মিসেস্, "মালপত্র সব লণ্ডভণ্ড করল কে?"

কে আবার করবে? আমরা তো কেউই ঘরে আসি নি। কুলিরাও কুণ্ডের ধারে রান্নায় ব্যস্ত। অথচ সত্যই মিসেসের জামাকাপড় বিছানার ওপর ছড়ানো। সুটকেসটাও খোলা। তবে কি চোর ঢুকেছিল? চোর! গিরিতীর্থ যমুনোত্রীতে চোর! মিসেস্ নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। স্নান করতে যাবার সময় নিজেই সব বের করে রেখে গিয়েছিলেন। এখন মনে করতে পারছেন না।

ভাল করে দেখে নিয়ে মিসেস্ জানালেন, "কিন্তু কিছুই তো নিয়ে যায় নি। টাকার থলি অবিশ্যি সঙ্গেই ছিল।"

যাক্—চোর আসে নি তা হলে।

"তোমরা আমার ব্যাগটা দেখেছ কেউ?"

কার্লের প্রশ্নে ফিরে তাকাই। খোঁজাখুঁজি করে লাভ হল না কিছু। উধাও হয়েছে। বুদ্ধিমান চোর। মিসেসের সুটকেসের বদলে কার্লের ব্যাগ পছন্দ করেছে। টাকা-পয়সা কাগজ-পত্র ক্যামেরা-কলম জামা-কাপড় সবই ছিল ওর ব্যাগে। কার্লকে নিঃস্ব করে রেখে গেছে। ছিঃ ছিঃ! বিদেশী সত্যান্বেষী—এসেছে আমার দেশে—সিদ্ধার্থের দেশে। ধুতি পরে যমুনোত্রীর মন্দিরে পুজো দিয়েছে। আর আমার দেশের লোক তার সর্বস্ব অপহরণ করে নিল। এ কলঙ্ক আমরা বয়ে বেড়াব কেমন করে? কেমন করে তাকাব কার্লের মুখের দিকে?

"তোমার চিরুনিটা একটু দাও তো !" মাথা আঁচড়ানো শেষ করে চিরুনিখানা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে কার্ল বলে, "চলো, চা খেয়ে আসা যাক্ ।" অবিচলিত কণ্ঠস্বর । যেন কিছুই হয় নি ।

"কিন্তু চোরটার একবার খোঁজখবর করবে না ?"

"না ।"

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই । কার্ল বলে চলে, "কারণ তাতে লাভ হবে না কিছু । সে এতক্ষণে ভৈরবঘাটি পেরিয়ে গেছে ।"

"কেমন করে জানলে ?"

"আমি তাকে যেতে দেখেছি ।"

"যেতে দেখেছ ?"

"হ্যাঁ । স্নান করার সময় একজন যাত্রীকে একটা ব্যাগ কাঁধে করে ফিরে যেতে দেখেছি । ব্যাগটা দেখে সন্দেহ হয়েছিল । কিন্তু ভাবলাম, ওরও তো আমার মত একটা ব্যাগ থাকতে পারে ।" একটু থামে কার্ল । তার পর বলে ওঠে, "টাকা-পয়সার জন্য দুঃখ করি না । যেমন করে হোক চলে যাবে । মুশকিল হল কাগজ-পত্রগুলো খোয়া গিয়ে । পাসপোর্ট আর ওয়ার্ল্ড লেটার অভ্ ক্রেডিটও ঐ ব্যাগেই ছিল ।"

॥ তেইশ ॥

এবারে ফেরার পালা । আমরা কিন্তু অন্য সবার মত শেষরাতে রওনা হতে পারি নি । ঘুম ভেঙেছিল অনেক আগেই । অন্যান্য যাত্রীদের কোলাহলে । বাঁধাছাঁদা, পুজো-আহ্নিক আর ঝগড়াঝাঁটিতে নিদ্রাদেবী যমুনোত্রী ছেড়ে পালিয়েছিলেন শেষরাতেই । তবু আমাদের কম্বলের মোহমুক্ত হতে সময় লেগেছে ।

যমুনোত্রীর মায়া কাটিয়ে আমরা চলেছি ফিরে । যে কৌতূহল নিয়ে এসেছিলাম তা মিটেছে । অবসান অবসাদ আনে । যমুনোত্রী কেমন, এ প্রশ্ন আর কোন দিন মনে জাগবে না । যে মন যমুনোত্রীতে এসেছিল, সে মন যমুনোত্রী থেকে ফিরে যাচ্ছে না ।

দূর থেকে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল । কতটুকু সময় বা কাছাকাছি ছিলাম ! কাজেই নিঃসন্দেহ হতে পারি নি । কাছে আসতেই স্নিগ্ধ হাসি হাসল মেয়েটি । আশ্চর্য ! অসুস্থ দেহে ডাণ্ডি চেপে যমুনোত্রী পৌঁছেছে কোন রকমে । আর সে

কিনা পায়ে হেঁটে একা একা নেমে যাচ্ছে ! জিজ্ঞেস করি, "ডাণ্ডি কোথায় ?"

"ছেড়ে দিয়েছি।"

"সে কি ! হেঁটে হেঁটে ফিরে যেতে চান নাকি ?"

"চাই মানে ?" মেয়েটি আবার আমার মুখের দিকে তাকায়, "অবাক হচ্ছেন ? আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, জানেন ? হবেও না। মা যমুনা আমাকে ভাল করে দিয়েছেন। আমি ভাল হয়ে গেছি।" মেয়েটির কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

"ডাণ্ডিটা না ছেড়ে দিলেই পারতেন।" না বলে পারি না।

"মা যমুনা যে আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন, এটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, না ? আমিও করতাম না। কিন্তু আজ করি। তাই তো ভাল হয়ে গেছি।"

কার্ল ও রঞ্জন ইশারায় এগিয়ে যাবার অনুমতি চায়। আমি সম্মত হই। মেয়েটি ওদের অনুরোধ করে, "সামনে আমার বান্ধবী ও তার দাদা যাচ্ছেন। তাদের বলে দেবেন যে সুমনের জন্য পথে অপেক্ষা করার দরকার নেই। একেবারে ফুল চটিতে গিয়ে দেখা হবে।"

ওরা এগিয়ে গেল। আমরা দুজনে ধীরে ধীরে পথ চলছি। নির্জন পাহাড়ী পথ। চারিদিকে স্বর্গীয় শান্তি। অপরিচিত এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তে নির্জন পথ চলছে এক মারাঠী যুবতী।

সুমন যাদের সঙ্গে এখানে এসেছে, পুনায় তারা ওর প্রতিবেশী। মেয়েটির সঙ্গে কলেজে পড়ত মেয়েটি। ওর নাম সাবিত্রী। গত বছর স্বামীর সঙ্গে সাবিত্রী বেড়াতে গিয়েছিল এলাহাবাদ। বাবার অনুমতি নিয়ে সুমনও ওদের সঙ্গী হয়েছিল। জন্‌স্‌টনগঞ্জে একটা হোটেলে ঠাঁই নিয়েছিল ওরা। সঙ্গম আধ ঘণ্টার রাস্তা। তবু সাত দিন থেকেও সঙ্গম দর্শন করে নি। সারা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। দুপুরের পর দুপুর কাটিয়েছে খোশবাগ আর মতিলাল নেহেরু পার্কের বৃক্ষছায়াতলে। বিকেলের পর বিকেল কাটিয়েছে আনন্দ-ভবনে আর মিউজিয়ামে। সাবিত্রী স্বামীকে তাগিদ দিত সঙ্গমে গিয়ে পুজো দেবার জন্য। ভদ্রলোক হাসতেন আর বলতেন, 'আমি তো তীর্থ করতে আসি নি। তোমার গঙ্গা-যমুনার পুজোর জন্য নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের। কি বল সুমন ?"

সুমন সাবিত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দিত, "আমরা বেড়াতে এসেছি। সময় পেলে সঙ্গম দেখব। পুজোর ঝামেলা আবার কেন এর মধ্যে ?"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতেন সাবিত্রীর স্বামী। তাঁর সঙ্গে গলা মেলাত সুমন। আর কানে আঙুল দিত সাবিত্রী।

সেদিন এক সাধু নাকি সাবিত্রীকে বলেছেন, 'প্রয়াগে এসে গঙ্গা-যমুনার পুজো

নারকেল দিয়ে পুজো দিবি।'

গম্ভীর স্বরে স্বামী জিজ্ঞেস করেছিলেন সাবিত্রীকে, 'আচ্ছা তোমার নিশ্চয় গল্প লেখার অভ্যেস আছে?'

'ছিল বই কি। কলেজজীবনে এক-আধটা গল্প অনেকেই লেখে। মনের গোপন কথা ভাষাবদ্ধ করতে চায়। পরে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সেসব কথা ফুরিয়ে যায়। কল্পনার মৃত্যু ঘটে।'

'তোর কল্পনা কিন্তু আজও মরে নি। আর সেইখানেই আমাদের আপত্তি!' সুমন ঠাট্টা করে।

'কেন বল্ তো?'

'এই যে সাধুর নামে গল্পটা শোনালে সেজন্য তোমার কল্পনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না!'

স্বামীর কথায় অসন্তুষ্ট হয় সাবিত্রী, 'বেশ। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তা হলে আমি যেন পুনায় ফিরে যেতে না পারি। আর সত্যি হলে মা গঙ্গা ও মা যমুনা যেন তোমাদের উপযুক্ত প্রমাণ দেন্!'

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল ওরা। কেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে সঙ্গম দর্শন করেছে। কিন্তু জলে নেমে স্তুতি করে নি গঙ্গা-যমুনার। নৌকো করে সঙ্গমে গিয়ে নারকেল-অঞ্জলি দেয় নি। হাসতে হাসতে স্বামী বলেছিলেন সাবিত্রীকে, 'ঐ দেখো, অঞ্জলি দেওয়া নারকেল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে পাণ্ডাদের সহকারীদের মধ্যে। বহু বার অঞ্জলি দেওয়া নারকেল ওরা আবার বিক্রি করবে তোমার মত পুণ্যার্থীর কাছে। যারা এইভাবে যুগ যুগ ধরে সরল ভক্তদের ঠকিয়ে চলেছে, তাদের কিন্তু কোন সাজা দেন নি তোমার মা গঙ্গা-যমুনা!'

ওরা নির্বিঘ্নে ফিরে গিয়েছিল ভি. টি.। বম্বেতে গাড়ি রেখে গিয়েছিলেন সাবিত্রীর স্বামী। পরদিন ওরা রওনা হয়েছিল পুনা। এ পথে বহুবার যাতায়াত করেছে সুমন। তা হলেও পথের সৌন্দর্য দেখে আশ মেটে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাইরে তাকিয়ে ছিল সে। ভাবছিল দূরের পাহাড়ের চূড়ার ওপর ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ বাড়িটার কথা। একদিন হয়তো ওটা দুর্গ ছিল। কোন এক মধ্যাহ্নে ছত্রপতি শিবাজী হয়তো ওখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন গঙ্গা-যমুনা হিংগল-সিন্ধু কৃষ্ণা-কাবেরীর দেশকে এক সূত্রে গেঁথে দেবার। সে স্বপ্ন সফল হয় নি। সে দুর্গও ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে পড়ে সুমন। বাইরের দিকে তাকাতে

চেষ্টা করে সে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায়। তার পরে আর কিছু মনে করতে পারে না। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পরে হাসপাতালে তার জ্ঞান ফিরে আসে। ক্ষতগুলো সেরে যেতে মাসখানেক লেগেছিল। তারপর থেকেই হাঁটুর ব্যথাটা দেখা দিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েছে, কিন্তু সারে নি। সাবিত্রীর স্বামীও সেই থেকে অচল। ডান হাতটা অসাড় হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে স্বপ্ন দেখেছে সাবিত্রী, গঙ্গোত্রী গিয়ে সে যদি তার স্বামীর হয়ে পুজো দিতে পারে তবে মা গঙ্গা তাকে ভাল করে দেবেন। কথাটা শুনে অবধি স্থমনেরও মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। কেবলি মনে হতে থাকে, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী গিয়ে গঙ্গা-যমুনার পুজো দিলে সেও ভাল হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে তাকাই স্থমনের মুখের দিকে। তার ব্যথা যে কমে গেছে তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। ডাণ্ডিতে চেপে যে সারাপথ এসেছে, সে কোন্ মন্ত্র-বলে পায়ে হেঁটে এই উত্‌রাই ভাঙছে? তবে কি মোটর-এক্সিডেণ্ট নাস্তিক স্থমনকে অন্ধবিশ্বাসী করে তুলেছে? কিন্তু শুধু বিশ্বাসই কি তাকে এত বড় যন্ত্রণা থেকে দিয়েছে মুক্তি?

অনেকক্ষণ হেঁটেছি। ক্লান্তি লাগছে। অথচ বলতেও পারছি না বিশ্রামের কথা। ঝরনার শব্দ শুনে স্থমনই বলে ওঠে, "চলুন না, একটু বসি ওখানে গিয়ে।"

চলে এলাম ঝরনার পাশে। স্বচ্ছ শীতল মিঠে জলে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে একখানা পাথরের ওপর বসলাম দুজনে। নীচের জগতে এখন রোদের হাসি পড়েছে ছড়িয়ে। এখানে কুয়াশার কান্না আর মেঘের মাতামাতি। এতক্ষণ আমরা খাড়া উত্‌রাই বেয়ে নেমেছি। কিন্তু এখানে রাস্তাটা কিছুদূর উর্ধ্বগামী হয়ে যমুনার তীর পর্যন্ত প্রসারিত। তার পরে আবার নিম্নগামী। যমুনাকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে তার গম্ভীর গর্জন শুনতে পাচ্ছি। দুদিকে পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ঝরনা। গিয়ে মিলেছে যমুনার সঙ্গে। কোথায় কত দূর জানি না। এখান থেকে সে মিলন দেখা যায় না। তবে ঝরনার যৌবন-চঞ্চল অভিসার-উচ্ছল উতরোল আমাদের বিহ্বল করে তুলেছে।

স্থধাভরা স্বরে স্থমন শুধায়, "আমার কথা তো শুনলেন, এবারে বলুন আপনি কেন এলেন এই দুর্গম তীর্থে? যা পাবার জন্ম এসেছিলেন তা পেয়েছেন কি?"

"পেয়েছি।"

"কি?" স্থমন আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।

"আপনাকে।"

কোথা থেকে এক পশলা লজ্জা এসে স্থমনের সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে। কোন

কথা বলতে পারে না সে। শুধু আমার কাছ থেকে দূরে সরতে সরতে পাথরখানার প্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়।

"আর দূরে যাবেন না, পড়ে যাবেন তা হলে!"

নিরুত্তর সুমন। একটু আগের সেই উচ্ছলতার অবসান ঘটিয়েছে আমার একটি কথা। এভাবে আর বেশীক্ষণ থাকলে পাছে সেই ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে, তাই বলতে শুরু করি, "তীর্থ করতে আসি নি আমি। এসেছি চক্ষু-কর্ণের সাধ মেটাতে। আর আপনার মত এই যে শত শত তীর্থযাত্রী—অমানুষিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এসে মিলিত হয়েছেন এখানে—তাঁদের দেখতে, জানতে ও একান্ত আপন করে পেতে। ঠিক এই যেমনটি পেয়েছি আপনাকে। পূর্বাচলের কুমার, পশ্চিম ঘাটের সুমনের সঙ্গে বসে আছে একাসনে—উত্তরতম প্রান্তের অতি অনাদরের এই পাথরখানার বুকে।"

॥ চব্বিশ ॥

সিমলি থেকেই উত্তরকাশীর রাস্তা ধরেছি। এই সাড়ে পঁচিশ মাইল আসতে তিন দিন লেগেছে। যাবার সময়ও তাই লেগেছিল। শুধু সিমলি থেকে গঙ্গানী না নেমে সিংগোটের রাস্তা নিয়েছি।

আশা ছিল নামার পথে লালাজীর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু হল না। কেন বুঝতে পারছি না। তবে কি এখনও তিনি গঙ্গানীতে? বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে? কিন্তু সেদিন তো তার কোন লক্ষণ দেখি নি। মামুলী পেটের অসুখ। না, না। এ সব মিথ্যা আশঙ্কা আমার। বোধ হয় যে কয়েকটি চটিতে আমরা থামি নি তারই কোনটায় তিনি তখন বেঁটে আর লম্বাকে দিয়ে মালিশ কিংবা ভাঙের শরবৎ তৈরি করাচ্ছিলেন। তাঁর সেই সুখবিহ্বল মুহূর্তে আমরা তাঁকে 'মিস' করেছি। আর কোন দিন দেখা হবে না লালাজীর সঙ্গে।

সিমলি থেকে সিংগোট নয় মাইল। অন্য দিনের তুলনায় সকাল সকাল রওনা হয়েছি আজ। সিংগোটের চড়াই ভাঙা নাকি অত্যন্ত কষ্টকর। প্রথম দেড় মাইল কিন্তু আমরা হাসতে হাসতেই পেরিয়ে এলাম। দু দিকে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। রাস্তার ধারে ফুলের মেলা। নানা রঙের নানা ধরনের পাহাড়ী ফুল। পথচারীদের জন্য প্রকৃতি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সৌন্দর্যের পসরা।

ফুল শেষ হয়ে গেল। দু দিকে শুরু হয়েছে পাইন বন। দু ধারে পাইন বন বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণত পাহাড়ী রাস্তায় এক দিকে পাহাড়ের বুকে জঙ্গল

থাকে। আর এক দিকে ধাপে ধাপে খাদ।

পাইন বন ঘনতর হচ্ছে। আমরা যে পাহাড়টার ওপর দিয়ে চলেছি, একটা নালা তাকে দু টুকরো করে কেটে বয়ে গেছে। নালার জল অনেক নীচে। ওপরে একটা কাঠের সাঁকো। পেরিয়ে এলাম। যেন একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়ে। ওপরে উঠছি। আরও ওপরে।

পাইন বন পাতলা হচ্ছে ধীরে ধীরে। এক দিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, আর এক দিকে পাতালপ্রসারী খাদ।

পাইন বন শেষ হয়ে গেছে। তবু সবুজহীন হয় নি পাহাড়। পথের পাশে ছোট ছোট ঝোপ। অতি সন্তর্পণে সরু সর্পিল পিচ্ছিল পথ বেয়ে ওপরে উঠছি আমরা। আমি রঞ্জন ও কার্ল, পেছনে মিস্টার ও মিসেস অরোরা। রঞ্জনের হাত ধরে গুড্‌ডু, আর কার্লের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে মুন্না। কার্ল ইতিমধ্যে দু'একটা হিন্দী শব্দ শিখে ফেলেছে। সেগুলো যথেচ্ছ বর্ষণ করছে মুন্নার কানে। সে শব্দ-লহরী মাঝে মাঝে মুন্নার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। ফলে দুজনেই হচ্ছে আমার শরণাপন্ন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কার্ল হাসিতে ভরে তুলছে চারিদিক। পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে হাসি বহুক্ষণ শব্দময় করে রাখছে নির্জন পথকে। প্রাণখোলা নির্মল হাসি। ব্যথা-বেদনাহীন আনন্দের হাসি। যতই শুনছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি। যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। সর্বস্ব চুরি গেছে ওর। আমাদের সাহায্যে জীবনধারণ করে আছে। উত্তরকাশী গিয়ে চিঠি লিখবে ব্যাঙ্কে, ডুপ্লিকেট ওয়ার্লড্ লেটার অব ক্রেডিটের জন্য। যতদিন না আসে ততদিন ছত্রের ডালরুটি খেয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় ওকে অপেক্ষা করতে হবে উত্তরকাশীতে। অথচ দেখে মনে হচ্ছে না, এত বড় বিপদ ঘটে গেছে ওর। সর্বস্ব হারিয়েও মনের আনন্দ-টুকু হারায় নি কার্ল। আমাদের দেওয়া বাদাম ও চুইংগাম চিবুতে চিবুতে মুন্নার হাত ধরে পরমানন্দে এগিয়ে চলেছে সে।

ইতিমধ্যেই অনেক ওপরে উঠে এসেছি। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে সারা শরীরে। হাত পা যেন সব কুঁকড়ে আসছে। গায়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল বৃষ্টি। ঠাণ্ডা ও ঘন জলের বর্ষণ। অবশ করে ফেলছে আমাদের। কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আঁধার-ছাওয়া আকাশ-মাটি। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে অজ্ঞান হয়ে যাব। জোরে জোরে পা চালাবার পরামর্শ দেয় কার্ল। কিন্তু পা যে চলতে চাইছে না। কুলিরা পেছিয়ে পড়েছে। ওদের কাছে আমাদের রেনকোট। কাল থেকে আবার আমরা হাফপ্যান্ট ও তোয়ালে গেঞ্জি ধরেছি।

মাথার ওপর মেঘের আস্তরণ। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে কেবল বর্ষণমুখর মেঘ। মেঘের দেশে এসেছি আমরা।

হঠাৎ বৃষ্টি কমে এল। আঁধার মিলিয়ে গেল। ওপরে নীল আকাশ। শুধু আকাশ। আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। নিজের ক্লান্ত পা পর্যন্ত নয়। আমার পা-দুখানি তলিয়ে গেছে মেঘের মধ্যে। রাস্তা নেই, পাহাড় নেই, পৃথিবী নেই—শুধু আকাশ আর মেঘ। পায়ে হেঁটে মেঘের ওপর উঠে এসেছি। আমরা আধুনিক মেঘনাদ।

স্বর্গে এসেছি কি? তেত্রিশ কোটি দেবতার কাউকেই যে দেখতে পাচ্ছি না। শুনছি না ঐরাবতের পদশব্দ। পেলে তার পিঠে চেপে ঘুরে আসা যেত দেবতাদের সভা থেকে। এগোতে সাহস হচ্ছে না। কোন দিকে যেতে কোন দিকে যাব। দাঁড়িয়ে আছি নীল আকাশের নীচে। দেখছি মেঘদলের অপূর্ব লীলা।

কিন্তু পায়ে মাটির স্পর্শ পাচ্ছি। তবে তো স্বর্গ নয়। এও তাহলে পৃথিবীরই একটা অংশ। যে পৃথিবীতে এত স্বার্থপরতা আর বিদ্বেষ—মানুষে মানুষে এত বিরোধ, হানাহানি আর রক্তপাত। আমরাও যে সেই পৃথিবীরই মানুষ। তবু কেন আমাদের মন ভরে উঠেছে এক স্বর্গীয় সুষমায়! কেন মনে হচ্ছে নীচতা বলে কিছু নেই এ জগতে। আমরা কি ওপরে উঠে এসেছি?

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছি বলতে পারি না। ঘড়ি দেখতে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি সহযাত্রীদের কথা। ভুলে গেছি নিজেকে।

"শেঠজী!" মেঘের পরপার থেকে ভেসে এল একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। বুঝি বা স্বর্গ থেকে ডাক এল আমাদের। কিন্তু শেঠজী বলে ডাকবে কেন? যমরাজের দারোয়ানও শুনেছি আমাদের নাম জানে।

"কৌন হ্যায়? কিধার?" রঞ্জন চিৎকার করে ওঠে।

"সামনে চলা আইয়ে।"

না, এ তো মানুষের কণ্ঠস্বর। আনন্দে দুলে উঠল আমাদের মন। পৃথিবীতে মানুষ মানুষের যত বড় শত্রুই হক, স্বর্গে এসে মানুষের ডাক শুনতে পেলে আনন্দ হয়। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে রঞ্জনের পেছনে এগিয়ে চললাম। বেশী দূর এগোতে হল না। পাতায় ছাওয়া ছোট একফালি চালা। আবছা দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা একটু চওড়া। একজন মানুষ সেই চালের নীচে বসে আছে।

রঞ্জন প্রশ্ন করে, "বুলায়া কেঁও?"

"চায়—চায় পিজিয়ে শেঠজী।"

গোটা স্বর্গরাজ্য দিতে চাইলেও এর চেয়ে বেশী খুশি হতাম না। ভাল করে··

তাকিয়ে দেখি একটা কাঠের উনুন জলছে। পেতলের হাঁড়িতে গরম জল ফুটছে। পাশে কয়েকটা গ্লাস ও চা তৈরির সরঞ্জাম। উনুনের চারিদিকে বসে পড়লাম। মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে ফেলছে আমাদের। দোকানদার অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছি দোকানদারের কথা। মানুষ কোথায় এসে ব্যবসা করছে! কজন যাত্রীরই বা দেখা মেলে রোজ! একটু আগে মনে হয়েছে পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশা বলে কিছু নেই। নির্মল আনন্দময় এ জগৎ। যাত্রীদের সেবায় রত এই লোকটি যেন পৃথিবীর সকল দুঃখ আর দুর্দশার প্রতীক হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সিংগোট চড়াইয়ের ঐ উচ্চতম মেঘময় ভূমি পৃথিবীর পরিচয় নয়। পৃথিবীর পরিচয় নীচে। মাটির বুকে। যেখানে মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য। সেই অনাদি অনন্ত কাল থেকে। ভগবানের অভিশাপ—'To eat bread in the sweat of his brow is the original punishment of mankind.'

দোকানীর পয়সা মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ জিরিয়ে নিয়েছি উনুনের ধারে। পায়ের অবশ ভাবটা কমে গেছে। দোকানীর কাছ থেকে জানতে পারলাম প্রায় দু মাইল হাঁটলে আমরা সিংগোট ধর্মশালায় পৌঁছব। আঁতকে উঠি, এখনও দু মাইল!

দোকানী হেসে বলে, "আমি তো রোজ এই সব জিনিসপত্র ঘাড়ে করে সিংগোট থেকে এখানে আসি চা বেচতে।"

লজ্জা পেলাম।

দোকানী বলে, "তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যান। সাধুদের একটা মস্ত দল গেছে। ওদের আগে না পৌঁছলে আজ আর ধর্মশালায় জায়গা পাবেন না।"

মেঘ মিলিয়ে গেছে। মিলিয়ে গেছে বলতে পারি না। এখানে মেঘ নেই—মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। মেঘের দেশে মেঘ রয়েছে। চূড়ায় মেঘের মেলা ঠিকই চলেছে। উতরাই পথ—যেন একটা অজগর তার সুবিশাল আঁকাবাঁকা দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। নীচে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা। সিংগোট উপত্যকা। জোরে জোরে পা চালিয়ে চলেছি।

হঠাৎ আঁধার ঘনিয়ে এল। কোথা থেকে এক দল মেঘ আমাদের মাথার ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসল। শুরু হল বর্ষণ। সেই অবশ ভাবটা আবার মূর্ত হয়ে উঠল সারা শরীরে। অতি সাবধানে নামতে হবে। সকলকে সাবধান করার আগেই একটা শব্দ কানে এল। ধরাশায়ী হয়েছেন মিসেস্। ধরা মানে কঠিন পাথর।

সর্বশক্তি দিয়ে মিস্টার তাঁকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। আমিও এসে হাত লাগাই। দুজনে মিলে সফল হই অতি কষ্টে।

অরোরাজীকে ধরে ধরে এগিয়ে চললেন মিসেস্। জীবন-সঙ্গিনী তিনি। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে কি দূরে থাকতে পারেন? পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়ে সারি বেঁধে নামছি আমরা। পিচ্ছিল উত্‌রাই। আছাড় খেলে কেউ যেন সামনের লোককে নিয়ে না পড়ে।

"মুঝে ছোড় দো। মেহেরবানি করকে মুঝে ছোড় দো।"

স্কেটিং করছেন মিসেস্! টল্‌তে টল্‌তে আছাড় সামলাবার চেষ্টা করছেন যথাসাধ্য। অরোরাজী তাঁর বন্দী হাতখানাকে মিসেসের মুঠিমুক্ত করার চেষ্টা করছেন শরীরের সকল শক্তি আর গলার সমস্ত জোর দিয়ে। রিংক্ স্কেটিং উপভোগ করার মত সময় এ নয়। একটু এদিক-ওদিক হলে গুড্‌ডু ও মুন্না একসঙ্গে পিতৃ-মাতৃহীন হবে। ছুটে যাই ওঁদের দিকে। জানি না কতটা সাহায্য করতে পারব, তবুও চেষ্টা করতে হবে।

কিছুই করতে হল না। আর বেশীক্ষণ নাচতে পারলেন না ওঁরা। মিস্টারকে সঙ্গে নিয়ে পথের বুকে গড়িয়ে পড়লেন মিসেস্। অনেক পরিশ্রমের পরে টেনে তুললাম দুজনকে। খুব আস্তে আস্তে না চললে মিসেস্ পৌঁছতে পারবেন না সিংগোট। অথচ গতি না বাড়ালে গৃহহীন করবে গৃহত্যাগী সাধুরা।

গুড্‌ডু আর মুন্নাকে নিয়ে এগিয়ে যাই আমি ও রঞ্জন। মিসেস্‌কে সামলাতে অরোরাজীর সঙ্গে পিছিয়ে রইল কার্ল। মিস্টার কিন্তু আর মিসেস্‌কে ধরা দিচ্ছেন না। কার্লকে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছেন মিসেস্। এবারে হয়তো তাঁর দুরবস্থার কিছুটা লাঘব হবে। বরফের দেশে জন্মেছে কার্ল। স্কেটিং করা অভ্যেস আছে ওর।

আবার সেই পাইন পাতা পচা গন্ধে মাতাল-হওয়া-পথ। আগে পাইনের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছি। এবারে পাইনের পা ছাড়িয়ে নীচে নামছি। এক দিনে এতটা চড়াই উত্‌রাই করি নি আর। হাঁটু দুটো বিষের টুকরো হয়ে গেছে। পা ঘষে ঘষে পিচ্ছিল পথে যথাসাধ্য বেগে এগিয়ে চলেছি। যেমন করে হোক সাধুদের আগে পৌঁছতে হবে ধর্মশালায়। মুন্না আর গুড্‌ডু সমানে হাঁটছে আমাদের সঙ্গে। কার্লকে ছেড়ে আসতে রাজী হচ্ছিল না মুন্না। কিন্তু কার্ল পরে বাবা-মা'র সঙ্গে আসবে শুনে আর আপত্তি করে নি।

মুন্না ও কার্ল। দুজনে দুজনের ভাষা জানে না। অথচ উভয়ে উভয়কে ভালবেসে ফেলেছে। ভালবাসার ভাষা শুনেছি ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশের অপেক্ষা

রাখে না। চোখের দৃষ্টিতে বয়ে পড়ে। হাতের পরশ জানিয়ে দেয় ভালবাসার গোপন সত্য।

॥ পঁচিশ ॥

ফোটো ফিনিশে হেরে গেলাম। চৌকিদার জানাল একটু আগে সাধুর দলটি ধর্মশালায় পৌঁছে গেছেন। শিষ্য-প্রশিষ্য মিলে জনা বিশেক। বাছাই করে তিন-খানা ঘর দখল করে নিয়েছেন। অতএব—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ বাড়ি, সাধুদের ভুঁড়িতে যে গিয়েছে ভরি।

অরোরাজীকে স্মরণ করে চৌকিদারের গা ঘেঁষে দাঁড়াই। চারদিকটায় একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে একখানা এক টাকার নোট আমার পকেট থেকে বের করে চৌকিদারের পকেটে রেখে দিই। নিজের অসহায় নিরুপায় অবস্থা সম্পর্কে তৈরি করে রাখা বক্তৃতাটা শুরু করার মুখে থেমে গেল চৌকিদার। আড়চোখে নিজের পকেটটা দেখে নিয়ে, ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল। ঘর পেলাম আমরা।

ঘর পাওয়া কঠিন। রক্ষা করা আরও কঠিন। খিল লাগিয়ে বসে আছি। ক্লান্ত দেহ। বসে থাকলে ভালই লাগছে। কিন্তু এদিকে যে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যেতে বসেছে। সঙ্গের আখরোট ও বাদাম অনেক আগেই শেষ হয়েছে। গুড্ডুর পেটের চুহারা নাকি ক্ষেপে উঠেছে। দোকানে গিয়ে খাবার কিনে আনা অসম্ভব। আমরা সাধু নই। চারজনে একখানা ঘর নেবার অধিকার নেই আমাদের। ইতিমধ্যে আরও কয়েকদল যাত্রী এসে গেছেন। চৌকিদারের উদ্দেশে তাঁদের নিবেদন ও নির্দেশ এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় খিল খোলা আর ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া একই কথা।

ঘন্টাখানেক বাদে এসে পৌঁছলেন ওঁরা। শুধু ওঁরা তিনজন নয়। সঙ্গে এল সুমনরা। সুমনও নাকি আগাগোড়া হেঁটে এসেছে এই চড়াই উতরাই। ঘরে ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল সবাই। রঞ্জন আর গুড্ডু চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে অরোরাজী বেরিয়ে গেলেন রান্নার ব্যবস্থা করতে। সাবিত্রীর ধমক খেয়ে তার দাদাও গেলেন ওদের সঙ্গে। গুড্ডুর ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যাবে। খেতে যে অত ভালবাসে, খাবার তৈরি দেখতে তার তো ভাল লাগবেই। কিন্তু তার যাওয়া হল না। থাকতে হল মিসেসের হাত-পা টেপার জন্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাতৃসেবা করতে হচ্ছে গুড্ডুকে।

ঘন্টা দুয়েক পর আমাদের ডাক পড়ল। ঘর বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কুয়াশা-ঘেরা আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। মুক্তোর মত জোছনা ছড়িয়েছে সবুজ উপত্যকায়। একটা ঝরনার পাশে খানিকটা পরিষ্কার সমতল জায়গায় যাত্রীরা রান্না করছেন। ওপারে কয়েকটি প্রাণী ঝরনা থেকে জল খাচ্ছে। চৌকিদার যাত্রীদের তদারক করছিল, জিজ্ঞেস করায় জবাব দিল, "হায়না কিংবা নেকড়ে হবে হয়তো। তবে এপারে আসে না ওরা।"

বাঘ আর মানুষের এলাকার সীমারেখা ঝরনা। একই ঝরনায় বাঘে মানুষে জল খাচ্ছে।

খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এলাম। এবার শোবার পালা। পুত্রের সেবা ও স্বামীর চাপাটির দৌলতে মিসেস্ বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। যথারীতি অয়োরাজী তাঁর বিছানা পেতে দিলেন। মুন্নাকে নিয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন মিসেস্। দাদার সঙ্গে সাবিত্রী ও সুমন বিছানা নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। মিসেস্ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

"বারান্দায়। এইটুকু ঘর, আপনাদের কষ্ট হবে।"

"এ পরামর্শ কে দিয়েছে তোমাদের?"

সুমন দাদাকে দেখিয়ে দেয়। মিসেস্ ফারমান দিলেন দাদাকে, "আপনি বাইরে যান। মেয়েরা ঘরেই থাকবে।"

"কিন্তু আপনাদের যে অসুবিধে হবে।"

"অসুবিধে হবে না সে কথা আমি বলছি না, তবু ওরা থাকবে। যদি একান্তই না কুলোয়, ছেলেরা দু-একজন বারান্দায় গিয়ে আপনার সঙ্গে শোবে।"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন দাদা, মিসেস্ হাঁক দিলেন, "শুনুন।" এবারে কণ্ঠস্বরটা একটু চড়া শোনাচ্ছে, "মেয়েছেলে নিয়ে তীর্থে এসেছেন বলে তো নিজে মেয়েছেলে বনে যান নি। কাল থেকে ছেলেদের সঙ্গে আগে গিয়ে ধর্মশালায় জায়গা নেবেন। মেয়েরা আমার সঙ্গে পরে যাবে।"

ঘাড় নেড়ে লম্বা দিলেন দাদা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। যাক্ তেমন কিছু কড়া বুলি ছাড়েন নি মিসেস্।

ইতিমধ্যে দেয়াল ঘেঁষে নিজের বিছানা বিছিয়েছে কার্ল। তার পাশে অয়োরাজী ও গুড্ডু। উল্টো দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে মিসেস্ সুমনকে তাগিদ দেন, "তোমরা বসে রইলে কেন? বিছানা করে নাও। তোমাদের বিছানা পেতে জায়গা না থাকলে খোকাদের বাইরে ব্যবস্থা করতে হবে।"

তবুও সুমন নড়ছে না দেখে আমি ওদের বিছানা খুলতে শুরু করি। এইবার আমাকে সরিয়ে মাঝখানের জায়গায় কম্বল বিছায় সুমন। সাবিত্রী সাহায্য করে

তাকে। এখনও হাত-দুই জায়গা খালি রয়েছে। খালি জায়গাটুকুতে কোন রকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে শোওয়া যেতে পারে। এ রকম ঘরে লালাজীদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি আমরা। কণ্টক-শয্যা আর কোমল-শয্যায় কোন পার্থক্য নেই এখন। তা হলেও সুমনদের শান্তির প্রয়োজনে ঘর ছাড়তে হবে আমাদের। তীর্থের পথ হলেও নিশুতি রাত। আমরা মানুষ।

বলতেই রাজী হয় রঞ্জন। বিছানাটা দুজনে ধরাধরি করে দরজার দিকে নিয়ে চলি। অতর্কিতে সুমন এসে পথরোধ করে, বলে, "আমাদের কি ভেবেছেন আপনারা?"

বিছানাটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বলি, "ঠিক জায়গা হচ্ছে না তাই।"

"তাই বারান্দায় শুয়ে চাঁদের আলোয় সিংগোটের শোভা দেখবেন—কেমন? সরুন দেখি ওদিকে।"

সরে দাঁড়াতেই বিছানাটা টানতে টানতে নিয়ে আসে ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

"আহা, কি করছেন? দিন না আমরা করে নিচ্ছি?"

"চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন।" হুকুম করা ওঁর জন্মগত অধিকার। আমাদের অসহায় অবস্থাটা মিসেস্ উপভোগ করছেন সব চেয়ে বেশী।

লণ্ঠনটা নিবু নিবু করে শুয়ে পড়েছি। ডাইনে রঞ্জন, বাঁয়ে সুমন। স্পর্শ পাচ্ছি দুজনেরই। ভেবে চলেছি আজ রাত্তের কথা। জানালা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে। সুমনের কয়েকগাছি অবিন্যস্ত চুল আমার গালের উপর এসে পড়ছে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস থেকে বুঝতে পারছি ঘুমিয়ে পড়েছে। চুল ক-গাছি থাক। সরিয়ে দিতে গেলে ওর ঘুম ভেঙে যাবে। ঘুমোক সুমন। রাত ঘুমের আধার। ঘুম আমাদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিক। স্বপ্নহীন নিষ্কলুষ ঘুম। শান্ত সুন্দর নির্মল ঘুম।

। ছাব্বিশ ।

উত্তরকাশী। পথে তেমন কোন কষ্ট হয় নি। বিশেষ করে গতকালের তুলনায়। শীত আজ নেই বললেই চলে। বেশ আরাম লাগছে। সিংগোট থেকে উত্তরকাশী দশ মাইল। প্রথম দিকে মাইলখানেক রাস্তা পাইনবনের মধ্যে দিয়ে একটু উঁচুনীচু। তার পর গঙ্গার পাশ দিয়ে—প্রায় সমতল। কিছুদূর এসেই নাকোরি। সিংগোট উত্তরকাশী ও ধরাসু থেকে তিনটি রাস্তা গিয়ে মিলেছে নাকোরিতে। ঠিক মোড়েই একটা চায়ের দোকান। সেখানে জিরিয়ে নিয়েছি আমরা সবাই—এমন কি দাদাও।

কায়মনে অনাত্ত করে দাদা আজ সবার শেষে বেঁটেছেন। মিসেস্ ধমক লাগান নি —ভেবেছিলেন উত্তরকাশীতে স্থানান্তর হবে না। আজ তাই সকলে একসঙ্গে চলেছি। ফেরার সময় এ পথ দিয়েই ধরাসু যাব। ঐ চায়ের দোকানে বসব। আজকের সঙ্গীরা তখন কে কোথায় থাকবে জানি না। কার্ল ও অরোরাজী এখান থেকেই বিদায় নেবেন। দাদা সাবিত্রী ও সুমন গঙ্গোত্রী গেলেও গোমুখী যাবে না। ফেরার পথে ওরা আমার সঙ্গে থাকবে কি? কিন্তু সে কথা এখন থাক। নাকোরিতে কপিলমুনির আশ্রম দেখেছি। একটা ধর্মশালা আছে। দেখেছি বরুণা-সঙ্গম। ব্রাহ্মণী ময়ূরাক্ষী বরাকর দামোদর অজয় কাঁসাই রূপনারায়ণের মিলনতীর্থ গঙ্গায় বিলীন হয়েছে বরুণা।

তেরো দিন বাদে নাগরিক সভ্যতার মধ্যে ফিরে এসেছি। পাহাড় আমাদের ভাল লাগে। প্রকৃতিকে আমরা ভালবাসি। তবুও নাগরিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ মিশে আছে আমাদের সত্তায়। তারি আনন্দ হচ্ছে এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরটিতে এসে।

কার্লকে নিয়ে আমি ও রঞ্জন শহরের প্রান্তে মাধবানন্দজীর আশ্রমে ঠাঁই নিয়েছি।

আশ্রমটি ছোট। সবসমেত চার-পাঁচখানা ঘর। ঘর মানে বারান্দার পরে এক-একখানা মাঝারি আকৃতির কামরা। সঙ্গে একটি করে ছোট্ট খুপরি—সাধনভজনের জন্ত। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ঘরগুলো। রাস্তা থেকে নীচে নেমে ভাগীরথীর ধার দিয়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। এরই একখানা ঘরে লাইব্রেরি। অনেক বাংলা বই আছে। অর্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ আসে নিয়মিত। আছে কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থ। দেখে কার্ল খুব খুশি।

সুমনরা উঠেছে কালিকমলী ধর্মশালায়। অরোরাজীও ঠাঁই নিয়েছেন সেখানে। কয়েক দিন বিশ্রাম করে তিনি জীপ ধরে ফিরে যাবেন ধরাসু। আমাদের সঙ্গে থাকবে না জেনে গুড্ডুর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। মুন্না তো কেঁদেই ফেলেছে। অনেক বুঝিয়ে শান্ত করতে হয়েছে ওদের। কথা দিয়েছি রোজ গিয়ে দেখা করে আসব।

উত্তরকাশীতে শহরের উপাদান সবই রয়েছে। বিমানক্ষেত্র সেনানিবাস ডাকঘর থানা কাছারী হাসপাতাল ও হাইস্কুল। রয়েছে দুটি ধর্মশালা কালিকমলী ও বিড়লা। কালিকমলী আয়তনে বিশাল। বাটটি ভারি সুন্দর। বিড়লার ধর্মশালা গঙ্গার তীরে নয়। পাহাড়ের কাছে শৌখিন একটা দোতলা বাড়ি। আয়তনে কালিকমলীর চেয়ে ছোট হলেও কৌলীন্যে বড়। মেঝেটা মার্বেলের। ঐ পাথর

এখানে বয়ে আনার কথা ভেবে আশ্চর্য হয়েছি। আর আছে সিন্ধু-পাঞ্জাব ও যোধপুর মহারাজের ছত্র। শুধু সাধুরা নয়, প্রয়োজনে যাত্রীরাও খাবার পায়। জেনে আশ্বস্ত হয়েছে কার্ল। সরকারী ও ব্যাঙ্কের চিঠির জন্য ওকে দিন পনেরো এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা চলে গেলেও ওর কোন অসুবিধা হবে না।

একটু শোবার চেষ্টা করছিলাম। অনেক দিন দুপুরে বিশ্রাম করি নি, আজ ঠিক করেছিলাম কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেব। কিন্তু কড়ানাড়ার শব্দ পাচ্ছি। কে আবার এল এই ভরদুপুরে! দরজা খুলতেই সুমন আর সাবিত্রী ঘরে ঢুকে ঝুপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়েছে ওরা। সুমন অনুযোগ করে, "জানি পুরুষমাত্রেই দয়ামায়াহীন।"

"বুঝতে পারছি অভিমতটা আপনার অভিজ্ঞতাপ্রসূত।"

"অভিজ্ঞতাটা আপনাকে দিয়ে। সে যাক গে। ধর্মশালার তুলনায় শান্তিতে আছেন এখানে।"

"ও, আপনি বুঝি শান্তিতে নেই?"

"না থাকলেই বা আপনার কি বায় আসে? কেমন আছি সে খোঁজটাও তো একবার করলেন না!"

"দরকার মনে করি নি।"

"কেন?"

"জানতাম আপনারাই খুঁজতে আসবেন।"

"নিজের ওপর বিশ্বাসটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?"

"আত্মবিশ্বাস যত বেশী থাকে ততই ভাল।"

সুমনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সন্ধি করে সাবিত্রী, "আমরা কিন্তু আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত করতে এসেছি।"

"সেজন্যে মোটেই দুঃখিত নই। দিবানিদ্রার প্রতি কোন মোহ নেই আমার।" ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, "বলুন কি করতে হবে? তবে হ্যাঁ, তাস কিন্তু খেলতে পারি না। আর য়্যাকাডেমিক আলোচনা আমার দ্বারা হবে না।"

সাবিত্রী একটা জুতসই জবাব দেবার তালে ছিল, কিন্তু সুমন বলে, "বেশ আপনার কথাই থাকবে। তাস খেলা বা য়্যাকাডেমিক আলোচনা নয়। আপনাকে বেরুতে হবে।"

"কোথায়?"

"রাস্তায়। নতুন জায়গা। থাকব দুটো দিন। একটু ঘুরে দেখব না?"

"নিশ্চয়ই।" উৎসাহিত হয়ে ওঠে রঞ্জন।

"ঐ দেখুন। উনি আপনার থেকে অনেক বেশী এনারজেটিক্ !"

"বেশ তো, যান না ওকে নিয়ে।"

"যাবই তো। তবে আপনাকে আর মিস্টার কার্লকেও যেতে হবে।" একটু থেমে কার্লের দিকে ফিরে সুমন জিজ্ঞেস করে, "Would you mind having a stroll with us in this beautiful resort of the Pandavas ?"

ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে কার্ল। উত্তর না পেয়ে রেগে যায় সুমন, "লোকটা তো অভদ্র কম নয়।"

"অভদ্র না হয়ে ওর উপায় কি ? আপনার কথা বুঝতেই পারে নি !"

"কেন ?"

"ও ইংরেজী জানে না।"

"তবে আপনার সঙ্গে অত বক্‌বক্ করে কোন্ ভাষায় ?"

"ফ্রেঞ্চ-এ। অবশ্য ফরাসী ভাষায় জ্ঞান আমাদের দুজনেরই সমান। কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।"

"একেবারে বিনয়ের অবতার। কোন রকমে যৎসামান্য ফরাসী শিখে ওঁর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। ভারি বিধ্যুক আপনি।"

কণ্ঠস্বরে কোন নতুন পরিচয়ের ছোঁয়া নেই। যেন অনন্তকাল ধরে ওর সঙ্গে আমার জানাশোনা। আশ্চর্য মেয়েরা! কত সহজে এরা আপনার করে নিতে পারে। অঞ্জলি ভাবীজী মিসেস্ অরোরা সুমন—এক সূত্রে গাঁথা।

কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বারান্দাতেই মাধবানন্দজীর সঙ্গে দেখা। বললেন, "আমাকে এক্ষুনি ধরাসু যেতে হবে। তিন-চার দিন দেরি হবে। ফেরার পথেও এখানে উঠবে, কেমন ? ভারি আনন্দ হয় তোমাদের দেখলে। ভারতমাতার ভবিষ্যৎ তোমরা।"

"ধরাসুর কোন গাড়ি এখন আর পাবেন কি ?"

"গাড়ি ? গাড়ি-ঘোড়ার দরকার হয় না আমার।"

"এই আঠারো মাইল পথ হেঁটে যাবেন ?" রঞ্জন প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, আমি তো হেঁটেই যাতায়াত করি।"

"আর কাউকে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন।"

"না না, আর কাউকে দিয়ে হবে না। অত্যন্ত জরুরী কাজ কিনা। তা ছাড়া অনেক খরচা করে ফেলবে।"

"খরচা ?"

"কিছুদিন আগে এক মহারাজ তীর্থে এসেছিলেন। তাঁকে বলেছিলাম

এখানকার গ্রামবাসীদের শীতকষ্টের কথা। অনেকেরই একখানা আস্ত কম্বল পর্যন্ত নেই। তাই তিনি এক শ ভাল কম্বল পাঠিয়েছেন ধরাসুতে। জীপ বা আলাদা কুলি করলে অনেক খরচ। দু-চারখানা করে যাত্রীদের কুলিদের মাথায় দিয়ে নিয়ে আসতে হবে।"

ধন্য তুমি পরমপুরুষ। তোমার অন্তিম মুহূর্তের বাণী 'শিবে সেবা' আজ সার্থক রূপ পেয়েছে হাজার হাজার মাধবানন্দজীর মধ্যে।

চলে গেলেন মাধবানন্দজী। চলার বেগ দেখে ধারণাই করা যায় না যে তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। তিরিশ বছর আগে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী হিসেবে তিনি কাশী থেকে উত্তরকাশীতে আসেন, নিতান্তই সাময়িক ভাবে। কিন্তু আর ফিরে যেতে পারেন নি। এখানকার দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি থেকে গেছেন এখানে। তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে আশপাশের গ্রামে ঘুরে সেবা করে বেড়াচ্ছেন সেই থেকে। প্রয়োজন হলে তীর্থযাত্রীরাও বাদ পড়েন না। ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন এই আশ্রম। অনেকে অবশ্য একে রামকৃষ্ণ আশ্রম বলেন। গণ্ডগ্রাম উত্তরকাশীকে তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে রূপান্তরিত করেছেন। তিনিই চেয়ারম্যান। উত্তরকাশীর পথিকৃৎ।

॥ সাতাশ ॥

পরিষ্কার ঝকঝকে রাস্তা। কেরোসিনের আলোর বন্দোবস্ত আছে। দুপাশে দোকানপাট। পথচারীদের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। একটা মনোহারি দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমন আর সাবিত্রী। নানা রকমের পাথরের মালা আর কাচের চুড়ি রয়েছে। সুমন আমাকে বলে, "কিনব ?"

"কি হবে ? বম্বে থেকে এখানে এসে এসব কিনলে লোকে হাসবে যে !"

"এই জন্যই আপনাকে আমি দেখতে পারি না।" রেগে গেছে সুমন।

সাবিত্রী ওকালতি করে, "এসব জিনিস বম্বেতে পাওয়া যায় না।"

রঞ্জন ওদের বলে, "কিনুন না।"

দোকানী ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখেই বুঝেছে শাঁসালো খদ্দের। অথচ আধুনিকা একটি পাহাড়ী মেয়েকে সে জিনিসপত্র দেখাচ্ছে। সে মেয়েটি কিন্তু অনুমতি দেয় সুমনদের একই সঙ্গে দেখাতে। মালাগুলো দেখে নিয়ে রঞ্জন সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করে, "এরকম মালা বম্বেতে পাওয়া যায় না ? কলকাতায় তো পাওয়া যায়।"

সাবিত্রী কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

বাছাবাছি করতে খুব দেরি হল না ওদের। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটাছয়েক মালা আর ডজনছয়েক চুড়ি কিনে আসার জন্ত পা বাড়ায়। কিন্তু পারে না। আধুনিকাটি এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল আমাদের। এইবারে আলাপ জমাতে চায়, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন ?"

"হ্যাঁ।" আমার দিকে তাকিয়ে স্মরন বলে।

"কোথায় যাবেন ?"

"গঙ্গোত্রী। এখন আপনাদের উত্তরকাশী দর্শনে বেরিয়েছি।"

মেয়েটি হেসে ফেলে। বলে, "এখানে কি আছে দেখার ? তবে দেখবেনই যখন চলুন একসঙ্গে বেড়ানো যাক।...আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না তো ?"

"না না। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের সুবিধাই হবে।"

উত্তরকাশীর পথের তুলনায় দলটা একটু বড় হয়ে গেছে। পাশাপাশি চলা সম্ভব নয়। দুই সারিতে চলেছি আমরা। মেয়েরা চলেছে আগে। স্মরনকে ব্যস্ত করে তুলেছে পাহাড়ী মেয়েটি। বলছে নিজের কথা। ওর নাম হ্যাপি। অবাক কাণ্ড। রাজাইয়ের মেয়ের ইংরেজী নাম। কথাটা সাবিত্রীরও মনে আসে। জিজ্ঞেস করে ফেলে সে। হ্যাপি উত্তর দেয়, "বাবা নাম দিয়েছিলেন শিবুলী। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার আগে নামটা পাল্টে দিয়েছি আমি।"

শিবুলীরা উত্তরকাশীর স্থায়ী বাসিন্দা। বছর দুই আগে লাখ্নৌ থেকে বি. এ পাশ করেছে। এ অঞ্চলের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট সে। এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করছে। দেরাদুন বা মুসৌরিতে চাকরি করতে পারত। কিন্তু ওর বাবার ইচ্ছে উত্তরকাশীর মেয়ে উত্তরকাশীতে শিক্ষার আলো জ্বালাবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। খেয়াল হতেই শুনি মেয়েলী আলোচনা ততক্ষণে বাস্তবিক পরিণতিতে এসে ঠেকেছে। সাবিত্রী প্রশ্ন করছে, "সে কি, এখনও বিয়ে করেন নি ? আপনাদের শুনেছি খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয় ?"

আমতা আমতা করতে থাকে মেয়েটি।

স্মরন প্রশ্ন করে, "লোক পাচ্ছেন না বুঝি ?"

"লোকের অভাব কি ?" মেয়েটি এতক্ষণে সামলে নিয়েছে, "আমাকে যারা পছন্দ করে তাদের কাউকেই আমার ঠিক মনে ধরছে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, লেখাপড়া না শিখলেই ভাল করতাম। পছন্দ-অপছন্দের কোন বালাই থাকত না।"

সাধ আছে সাধ্য পাচ্ছে না। লেখাপড়া শিখে চাওয়ার পরিধি বেড়ে গেছে।

শিক্ষাও মানুষের জীবনে সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তার পর গিদ্‌নীই প্রথম কথা বলে, "আমার কথা তো শুনলেন। এবারে আপনাদের কথা বলুন। কলকাতার গল্প করুন। জানেন এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা লাখ্‌নৌর গল্প বললে দুষ্টুমি বন্ধ করে। আমরা আবার লাখ্‌নৌতে বসে কলকাতার কথা শুনে অবাক হতাম।"

"বলুন না কলকাতার কথা!" সুমন আমার বিকেলটা মাটি করতে চায়। উত্তরকাশীর উদার উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে কলকাতাকে স্মরণ করা…।

রঞ্জন আমাকে রক্ষা করে। অতর্কিতে হ্যাপিকে প্রশ্ন করে বসে, "এটা কি মন্দির?"

"বিশ্বনাথের মন্দির।"

"কে তৈরী করেছেন?"

"টিহরী-রাজ।"

হ্যাপি ভুলে যায় কলকাতার কথা। বলে চলে মন্দিরের ইতিহাস, "ঐ শিবলিঙ্গটি এখানে ছিল অনন্তকাল থেকে। শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করে একটি মন্দির তৈরী করে দেবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হলেন টিহরীরাজ। তৈরী শুরু হল। বেদী যত উঁচু হয়, শিবলিঙ্গের মাথাও ততই উঁচু হতে থাকে। এক ফুট দু ফুট করে দশ ফুট উঁচু হবার পর আবার স্বপ্ন দেখলেন টিহরীরাজ। আর উঁচু হবে না শিবলিঙ্গ। হলও না।"

মন্দিরের চারিদিকে কয়েকজন সধবাকে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করি, "এঁরা কি করছেন?"

"ধর্না দিচ্ছেন। প্রবাদ আছে এখানে ধর্না দিলে সন্তানলাভ হয়।"

"সত্যি হয়?" প্রশ্ন করে সাবিত্রী।

"তুই গিয়ে বসে পড় না ওদের মধ্যে। আমরা পরখ করি।" সুমন সাবিত্রীকে ঠাট্টা করে।

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় সাবিত্রী। নিজের ভুল বুঝতে পারে সুমন। কুমারী হলেও সে নারী। নারীজীবনে মাতৃত্বের মূল্য তার অজানা নয়। অসুস্থ স্বামী সাবিত্রীর। নিঃসন্তান সে। সাবিত্রীর একখানা হাত ধরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, "আমাকে মাপ কর্ ভাই, ঠাট্টা করতে গিয়ে তোকে দুঃখ দিয়েছি। জানিস তো, ভেবে কথা বলার অভ্যাস নেই আমার।"

বিশ্বনাথের মন্দির দেখে আমরা এসে দাঁড়ালাম শক্তিমন্দিরের সামনে। সাত ফুট চওড়া ও পনেরো ফুট উঁচু অষ্টধাতুর একটি ত্রিশূল আছে এখানে। হ্যাপি বলে,

"প্রবাদ আছে দেবাসুরের যুদ্ধের সময় স্বর্গ থেকে পড়েছে এই ত্রিশূল। তাই একে আমরা পুজো করি।"

শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে আছে। ওদের মনোযোগের অবসান ঘটাতে বলি, "এর একটা ইতিহাসও আছে। লক্ষ্য করে দেখুন এর মধ্যে পালিতে কিছু খোদাই করা আছে—দুই রাজা যাঁরা পিতা-পুত্র ছিলেন, এটা তাঁদের বিজয়-স্তম্ভ। নামগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মনে হয় তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে এ পর্যন্ত এসেছিলেন।"

আমার কথায় ওরা আহত হয়। বিশেষ করে হ্যাপি। ওর এতদিনের সংস্কারের মূলে আঘাত করেছি। বেচারী বহুক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে চক্কর মারছে, ওকে ব্যথা দেওয়া ঠিক নয়। বলতে থাকি, "দু'শ বছর আগে নেপালরাজ টিহরী রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তরকাশী জয় করলেন তিনি। বিজয়ের স্মারকস্বরূপ এই ত্রিশূল নিয়ে যেতে চাইলেন দেশে। শত শত লোক দিনরাত মাটি খুঁড়েও ত্রিশূল তুলতে পারল না। ধর্মভীরু নেপালরাজ দিগ্বিজয়ের মোহ ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। অসুররূপী আক্রমণকারীর কবল থেকে স্বর্গসম উত্তরকাশীকে রক্ষা করেছে যে ত্রিশূলরূপী দুর্গা—আসুন আমরা তাঁকে প্রণাম করি।"

পরশুরাম মন্দিরের সামনে এসে দোলনার ওপর বসে পড়ে হ্যাপি। বলে, "আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আপনারা গিয়ে মন্দির দেখে আসুন।"

"সে কি? আপনিও চলুন।" সুমন হ্যাপিকে অনুরোধ করে।

"না, আমি যাব না। আপনারা যান। অবশ্য দেখবার শুনেছি তেমন কিছু নেই। একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে পরশুরাম বসে আছেন।"

"আপনি না গেলে আমরাও যাব না।" সুমন আবদার করে।

"ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয় আমার।"

"কেন?"

"আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদের যে নির্বংশ করতে চেয়েছিল, তার মন্দিরে আমাকে ঢুকতে বলেন?"

"কিন্তু শুনেছি এখন ক্ষত্রিয় রাজারাও এ মন্দিরে ঢোকেন।" হ্যাপিকে রাজী করার চেষ্টা করি।

"চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে এ যাতায়াত শুরু হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি তার ক্ষত্রিয়ত্ব বিসর্জন দেয়, তা হলে আমাকেও দিতে হবে?" হ্যাপির কণ্ঠে উষ্মা।

"না না, সে-কথা বলছি না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম ঘটনাটা।" লজ্জা পাই।

"আপনি না গেলে আমিও যেতে পারি না। আমাদের পূর্বপুরুষ যুদ্ধ করতেন কিনা জানি না। তবে দেশের বাড়িতে দেওয়ালের সঙ্গে সেকালের ঢাল-তলোয়ার ঝুলতে দেখেছি। আমরাও ক্ষত্রিয়। যাবার হয় ওরা যাক। আমি আপনার সঙ্গেই থাকব।" রঞ্জন হ্যাপির দলে যোগ দেয়।

"পূর্বপুরুষ যুদ্ধ করলেই যদি ক্ষত্রিয় হয়, তা হলে আমিও ক্ষত্রিয়। অতএব আমরা কেউই ঢুকব না।" বলে এগিয়ে যায় সুমন। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়। তারপর হ্যাপি বলে, "ক্ষত্রিয় না হলেও এ মন্দিরে ঢোকা উচিত নয়। মাতৃহন্তা কখনও দেবতার আসন পেতে পারে না।"

পরশুরামের জন্য মায়া হচ্ছে। এখনও যদি ভদ্রলোকের পক্ষ সমর্থন না করি তা হলে অন্যায় করব। জিজ্ঞেস করি হ্যাপিকে. "আপনি স্কন্দ-পুরাণ বিশ্বাস করেন?"

"পুরাণকে অবিশ্বাস করব!"

"স্কন্দ-পুরাণ বলে—জমদগ্নি ঋষির স্ত্রী রেণুকা নদীতে স্নান করতে গিয়ে গন্ধর্ব-রাজ চিত্ররথকে দেখে তাঁর অনুরাগিনী হয়ে পড়লেন। টের পেয়ে ঋষি তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে মাতৃহত্যা করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু.সে রাজী হল না। ফলে ক্রুদ্ধ পিতার শাপে সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গেল। জমদগ্নি তখন কনিষ্ঠ পুত্র.পরশুরামকে একই আদেশ করলেন। পিতার আদেশ শিরোধার্য করে মাতৃহত্যা করলেন পরশুরাম। খুশি হয়ে ঋষি বললেন, 'বৎস, তোমার পিতৃভক্তিতে মুগ্ধ আমি। বল কি তোমার অভিলাষ'?"

'ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব—আদেশ করুন পিতা।'

'নির্ভয়ে বল বৎস।'

'আমি আমার মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করছি।'

চমকিত পিতা অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর মাতৃভক্ত সন্তানের দিকে। হয়তো বা ভাবলেন, পরশুরামের জননী অসতী হতে পারেন না। সত্যবদ্ধ ঋষি রেণুকার পুনর্জীবন দান করে যোগাসনে গিয়ে বসলেন। মা ও ছেলের মিলনানন্দে মুখরিত হল বরাহতের আকাশ বাতাস। ধন্য ধন্য করে উঠলেন স্বর্গ থেকে দেব-কুল। পরশুরামের মাতৃভক্তির স্মারক হিসেবে সেদিন থেকে বরাহতের নাম হল উত্তরকাশী।"

এগিয়ে চলেছি। অন্নপূর্ণা অম্বিকা একাদশীরুদ্র কালীমন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম দেখে চলেছি মল্লী গ্রামের দিকে। তিব্বতী পোশাক পরা ছুটি লোক আমাদের আগে আগে চলেছে। হ্যাপিকে জিজ্ঞেস করি, "এরা কোথায় যাচ্ছে?"

"খুব সম্ভব ডুণ্ডা গ্রামের দিকে।"

"ডুণ্ডা? ডুণ্ডা তো সেই নাকোরি ছাড়িয়ে ধরাসুর দিকে?" সুমন বলে।

"হ্যাঁ, জাড্ নামে এক যাযাবর জাতির শীতকালীন আবাস সেই গ্রাম। গ্রীষ্মকালে এরা হরশিল ও নেলাং গিরিদ্বারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাসা বাঁধে। থুলিং মঠ পেরিয়ে পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী গার্তক পর্যন্ত যায়। জাড়েরা রাজপুত বলে দাবি করে নিজেদের। অথচ আমরা ওদের ছোঁয়া খাই না। নৃতাত্ত্বিক মতে রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য কয়েক পুরুষ আগে ওরা তিব্বত থেকে পালিয়ে এসেছে এখানে।"

বাজনার শব্দে থামতে হয় হ্যাপিকে। এক পাশে সরে দাঁড়াই সকলে। মিছিল চলেছে। ভরাযৌবনা দুটি মেয়ে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে চলেছে সবার আগে। পরনে ঘাঘরা, পায়ে ঘুঙুর। নাচের ভঙ্গিমা রুচিশীল না হলেও গানের কথাগুলো ভালো লাগে, 'কনে! তোমার যে বর নিয়ে এলাম তার তুলনা হয় না। ভাগ্যবতী তুমি, হে কন্যা। তোমার বর বাঙালীর মত বুদ্ধিমান, পাঞ্জাবীর মত শক্তিমান আর মারোয়াড়ীর মত অর্থবান।' মেয়ে দুটির পেছনে বাজনাদারের দল। তারপরেই রাজপুতবেশে ঘোড়ায় চেপে, মুখ ঢেকে বিয়ে করতে চলেছে বর। বরের পেছনে ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে করতে হেঁটে চলেছে বরযাত্রীর দল।

ওরা চলে গেলে হ্যাপিকে জিজ্ঞেস করি, "ঐ মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়েছে কেন?"

"এদেশের বিয়ের সময় ওদের নিতেই হবে সঙ্গে। ওরা পতিতা।"

"পতিতা? এখানে পতিতা পেল কোথা থেকে?"

"ধর্মস্থান দেখে ভেবেছেন, এখানে পতিতা থাকতে পারে না?"

"না, তা নয়। তবে ভেবেছিলাম কাশী আর উত্তরকাশীতে কিছুটা তফাত থাকবে!"

"কাশীতে যা আছে উত্তরকাশীতে তা থাকবে না, এ আপনি আশা করেন কেমন করে?" বোধ করি আমার কাছ থেকে কিছু শোনার প্রত্যাশায় একটু থামে হ্যাপি। কিন্তু আমাকে নির্বাক থাকতে দেখে আবার বলতে শুরু করে, "ভারতের অধিকাংশ তীর্থেরই পাঁচশ গজের মধ্যে শুনেছি পতিতালয় আছে। দিনের আলোয় যারা ধর্মের মুখোশ পরে থাকে, রাতের অন্ধকারে তারা আশ্রয় নেয় পতিতালয়ে। মিথ্যে মুখোশ পরে থাকে, রাতের অন্ধকারে কিছুই অবশিষ্ট নেই সনাতন ধর্মের। অথচ এই ধর্মের অনুশাসন মানার জন্য কি আকুল আগ্রহ আমাদের। কবে এই মোহ ঘুচবে? সেদিন আসবে কি?"

নিরুত্তর থাকি। জানি আমার দিকে তাকিয়ে বললেও এ প্রশ্ন আমাকে নয়।

এ প্রশ্ন অনন্ত কালের কাছে। যে কাল প্রতি ক্ষণে পরম যত্নে কুসংস্কারকে লালন-পালন করে আসছে। আরও অনেকের মত হ্যাপিও তার প্রশ্নের উত্তর পাবে না। শিক্ষার প্রভাবে যুক্তির মাপকাঠিতে গিন্নীরা সংস্কারমুক্ত হতে চায় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হ্যাপিরা সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। পারে না বলেই পরশুরামের মন্দিরে ঢোকে না। তখন ভুলে যায় শিক্ষা আর যুক্তির কথা। সংস্কারটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সংস্কার মিশে আছে রক্তে—যে রক্ত বইছে চল্লিশ কোটি হিন্দুর শিরায় শিরায়।

॥ আটাশ ॥

দুর্যোধনের পরামর্শে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে পুরোচন তৈরি করেছিল লাক্ষাগৃহ। পাণ্ডবরা মরেন নি। বিদুরের সাহায্যে তাঁদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। পাপী পুরোচন নিজের স্বরচিত জতুগৃহে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে।

রাজ্যলোভে দ্বাপরের ক্ষত্রিয়রা কত নীচে নামতে পারতেন তারই নজীর হয়ে, শহরে থেকে দূরে, ফরেস্ট অফিসের কাছে গঙ্গার তীরে, লাক্ষাগৃহের বেদীমূলে আজও একখানা পাথরের ঘর দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি জানালাহীন একটিমাত্র ছোট্ট দরজাযুক্ত মাঝারি আকৃতির ঘর। দিনের বেলাতেও নাকি আলো নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। মন্ত্রীদের পরামর্শে যে পুণ্যক্ষেত্রের শোভা-সৌন্দর্যে লুব্ধ হয়ে যুধিষ্ঠির পরিবারস্থ সকলের জীবন বিপন্ন করেছিলেন, তা আজ শস্যক্ষেত্রের মাঝে নিতান্তই অনাদৃতের মত পড়ে আছে। অধিকাংশ তীর্থযাত্রীই অজ্ঞতাবশতঃ মহাভারতের এই অতি পরিচিত স্থানটা লক্ষ্য না করেই চলে যান। দূরত্ব কিছুই নয়। বড় জোর মাইল দেড়েক। চড়াই বা উত্‌রাই নয়। উত্তরকাশীর সীমারেখার পাহাড়টি ছাড়িয়ে, বড় রাস্তা থেকে ক্ষেতে নেমে, আল ভেঙে, এখানে এসে পৌঁছতে আমাদের সময় বেশী লাগে নি।

তা হলেও রাত আটটা বেজে গেছে। অন্ধকার। প্রাণহীন প্রান্তর। এত রাত করে আজ না এলেই হত। অদ্ভুত খেয়ালী কার্ল। সন্ধ্যেবেলা বলে বসল, "চল এখুনি গিয়ে জতুগৃহ দেখে আসি।" আমতা আমতা করতেই প্রশ্ন করেছিল, "সন্ধ্যে হয়ে গেছে বলে ভয় করছে?"

"না না, ভয়ের কি? তিনজনে যাব। টর্চ থাকবে। তবে অচেনা জায়গা……"

"অচেনা? যে ভাবে পথ জেনে নিয়েছ তাতে কোন অসুবিধে হবে না।"

আর আপত্তি করি নি। সকাল-সন্ধ্যে বিচার করব বলে তো আর এ পথে

আসি নি। তা ছাড়া কিই বা করব অশ্রেমে বসে থেকে। বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা।

অতুগৃহ দেখে ফিরছি। অনুমানের বেশী দেরি হয়ে গেছে। জোরে হাঁটতে ভালই লাগছে। বেশ শীত পড়েছে। ছুটতে ছুটতে একটা লোক আমাদের উল্টো দিকে চলে গেল। অন্ধকারে অত তাড়াতাড়ি আলের ওপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে লোকটা? সত্যি কথা বলতে কি; প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর হাসি পেল। মানুষ নিজেকে কত ভালবাসে। আমাদের কত ভয়। কত ভাবনা। ভুলে গিয়েছিলাম শহর হলেও উত্তরকাশী পুণ্যভূমি। অন্ধকারে পথ-চারীদের জীবন বিপন্ন নয় এখানে। লজ্জা পাচ্ছি নিজের কাছে। নাগরিক জীবন আমাদের কতখানি সন্দিগ্ধ করে তুলছে।

আবার গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি বড় রাস্তার দিকে। সহসা একটা শব্দে চলা বন্ধ হল আমাদের। স্পষ্ট শুনতে পেলাম গোঙানি। সবার আগে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে যায় কার্ল। আমরা তাকে অনুসরণ করি। টর্চ জ্বালিয়েছে কার্ল। কেউ শুয়ে আছে। ছুটে যাই। একটি মেয়ে। ক্ষেতের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। রক্ত গাঢ় হয়ে গেছে খয়েরী ঘাঘরা আর লাল জামার রঙ। গোলাপী ওড়নাটা পাশে পড়ে আছে। সোনালি-জরির কাজ-করা চটিজোড়া পড়ে আছে একটু দূরে। পেছন থেকে কেউ ছোরা মেরেছে মেয়েটিকে।

অজানা বিজন প্রান্তর। আমরা তিনজন যুবক। একটি বিপন্না যুবতী। কোথায় নিয়ে যাব? কি করব? ডাক্তার—পুলিস······

কার্লের কথায় সম্বিৎ ফিরে এল, "টর্চটা একটু ধর তো? দেখি আঘাতটা কি ধরনের? হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে পারব কিনা?"

কি বলছে কার্ল? এই রাতে আহতা যুবতীকে বয়ে নিয়ে গেলে পুলিস যে আমাদেরই আততায়ী বলে ভেবে নেবে।

কার্ল তাগিদ দেয়, "টর্চটা ধরো!" মেয়েটির পাশে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে সে। তারপর বলে, "নাঃ, খুব বেশী গভীর হয় নি। টিকেও যেতে পারে।"

কথার শব্দে চোখ মেলে তাকায় মেয়েটি। ক্ষীণকণ্ঠে গাড়োয়ালীতে বলে, "আমাকে বাঁচান—বাঁচান।" ভাষান্তরিত করে মেয়েটির আবেদন কার্লকে বুঝিয়ে বলতেই সে উত্তেজিত ভাবে তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে, ফরাসীতে আশ্বাস দেয়, "বাঁচাব বৈকি। তোমাকে ভাল করে তুলব। তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

আশ্চর্য। মেয়েটিও কিন্তু তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অবাক হয়ে নয়। পরম

নিশ্চিন্তে। সে যেন বুঝতে পেরেছে কার্লের ভাষা। জানতে পেরেছে কার্ল তাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে।

উঠে দাঁড়াল কার্ল। অদূরে পড়ে থাকা মেয়েটির ওড়নাখানি হাতে নেয়। ক্ষতস্থান বেঁধে ফেলতে আমার সাহায্য চায়। রঞ্জনের হাতে টর্চটা দিয়ে সাহায্য করি তাকে। বাঁধা হয়ে গেল তবু রক্তপাত বন্ধ হল না। তবু কার্ল বলে, "রঞ্জন আলো দেখিয়ে আগে আগে যাক। তুমি পায়ের দিকটা ধর—আমি মাথার দিকে আছি। দেখো, খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।"

"তুমি সত্যই একে নিয়ে যেতে চাও?"

"তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?"

"ভেবে দেখেছ এতে কত ঝামেলা হতে পারে?"

"তা তো পারেই।" নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে কার্ল উত্তর দেয়, "তাই বলে একে এভাবে ফেলে চলে যাব?"

"তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না কার্ল, হয়তো বা পুলিসী হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ব।"

"তোমার দেশের আইন-কানুন আমি জানি না। বিপন্নকে সাহায্য করলে যদি কোন দেশের পুলিস আমাকে শাস্তি দেয়, আমি অম্লানবদনে সে শাস্তি মেনে নেব। অন্তত এই সান্ত্বনা আমার থাকবে যে নিজের বিবেকের কাছে কোন অন্যায় করি নি।"

লজ্জা পেলাম। আমার দেশের একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করতে ভিন্‌দেশী এই মানুষ সকল বিপদের বোঝা বইতে রাজী। আর আমি কিনা কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে চাইছি! তুলে নিলাম মেয়েটিকে। একজন ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আর একজন চাইছে বাঁচিয়ে তুলতে। দুজনই মানুষের দেহ ধরে আছে—কাকে মানুষ বলব?

॥ উনত্রিশ ॥

পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম কার্ল ও আমি। রঞ্জনের ডাকে দোকানের দিকে এগিয়ে যাই। দোকান মানে সেলুন। আসবাবপত্র বলতে একখানা চেয়ার, বড় একটা আরশি, আর তিন-চারজন বসার মত একটি বেঞ্চ। এ ছাড়াও আছে ডজনখানেক ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবগুলো এ বছরের নয়। তা হলেও বোধ করি খদ্দেরদের কাছে ওদের মূল্য এখনও অপরিবর্তিত। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা থেকে

রাজকাপুর-নার্গিস—কোন ছবিই ফেলনার নয়।

ঋষিকেশ ছাড়ার পর থেকে দাড়ি-গোঁফের সঙ্গে মিলন চলেছিল। একটু আগে এই সেলুনের মালিকের কৃপায় ওদের সঙ্গে বিরহ ঘটেছে। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বেশ আরামে গালে হাত বুলোচ্ছিলাম। নাঃ, রঞ্জন আবার হাঁকডাক শুরু করেছে। ব্যাপারটা কি? ভেতরে ঢুকে চক্ষুস্থির। নরসুন্দরের সঙ্গে রঞ্জনের প্রায় হাতাহাতির যোগাড়। আমাকে দেখে থেমে যায় দুজনে। তিক্তকণ্ঠে রঞ্জন বলে, "চমৎকার জায়গায় ঢুকিয়ে গেছ! যতই বলছি কলকাতায় চুল কেটে এসেছি, চুল বড় হয় নি এখনও, ততই কাঁচি হাতে তাড়া মারছে! শেষ পর্যন্ত এই ভূতের হাতে চুল ছাঁটতে হবে আমাকে?"

রঞ্জন একটু লম্বা চুল রাখতে ভালবাসে।

এবার নরসুন্দরের পালা, "শেঠজী, উত্তরাকাশীতে আমার চেয়ে কেউ ভাল ছাঁটতে পারবে না; আজ পনেরো বছর আমি এ লাইনে আছি। চুল তো উনি ছাঁটবেনই। তাই বলছিলাম অন্যের কাছে না গিয়ে আমার হাতে ছাঁটিয়ে নিন। গরীবের দুটো পয়সা হয়।"

এদেশের লোকেরা ছোট করে চুল ছাঁটে। সে বিচারে নরসুন্দর ভুল করে নি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রঞ্জন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "এ লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে আমার চুল বড় হয় নি। একটু বুঝিয়ে বল না। তা নইলে চল হাসপাতালে যাই। দরকার নেই দাড়ি কামিয়ে।"

রঞ্জনের নির্দেশমত বোঝাতে গেলে কোন কাজই হবে না। আমাকেও মিথ্যেবাদী ভাববে। অতএব হে জমদগ্নির বরাহত, পাণ্ডবের বারণাবত, পরশুরামের উত্তরকাশী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। রঞ্জনের রমণীয় সুদীর্ঘ সুবিন্যস্ত কালো কেশের প্রয়োজনে আমি মিথ্যাচারী হচ্ছি। নরসুন্দরকে বলি, "আরে ভাই, তুমি ভুল ভেবেছ। ও আর কোথাও চুল কাটাবে না। ওর চুল কাটানো নিষেধ আছে।"

"নিষেধ?"

"হ্যাঁ। মানসিক আছে। গঙ্গোত্রী গিয়ে মাথা কামাতে হবে ওকে।"

"আরে রাম রাম। সে কথা উনি এতক্ষণ বলেন নি কেন?" নরসুন্দর জিভে কামড় দেয়। তার কণ্ঠস্বরে লজ্জা ঝরে পড়ে।

স্বস্তি বোধ করি। কারণ দেখাই, "শরম লাগছিল।"

"ওঃ!" বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ায় সে। রঞ্জনকে অনুরোধ করে, "মাপ করুন শেঠজী। আপনি বসুন, আপনার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছি।"

সুস্থ শরীরে রঞ্জন সেলুন থেকে বেরিয়ে এল। হাসপাতালের দিকে হাঁটতে শুরু করি। মেয়েটির অবস্থা নাকি ভাল নয়।

আমাদের দেখে নমস্কার করেন ডাক্তার। খাটের পাশের বেঞ্চখানাতে বসলাম আমরা। মুখ তোলে মেয়েটি। ওর পটলচেরা চোখ দুটিতে পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরশ। ডাক্তার আমাদের পরিচয় দেন, "এঁরাই কাল তোমাকে ক্ষেত থেকে তুলে এনেছেন।"

"ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।" দুর্বল কণ্ঠে মেয়েটি বলে।

ভগবানের সৃষ্ট মানুষ ওর রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে ধরা। অথচ সেই ভগবানের কাছেই আমাদের কল্যাণ কামনা করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চাইছে মেয়েটি। মনে মনে বলি—ভগবান তোমার প্রার্থনা পূরণ করবেন কিনা জানি না, তবু এত বড় অবিচারের পরেও তুমি যখন তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেল নি, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভাল করে তুলবেন তোমাকে। তুমি নাকি নষ্ট-চরিত্রা পাপিষ্ঠা। তোমার চরিত্রস্খলনের কারণ আমি জানি না। তোমার পাপের পরিমাপ করার আগ্রহও আমার নেই। আমি শুধু বিশ্বাস করি, কেউ চরিত্র হারিয়ে জন্মায় না এ ধরিত্রীতে। মানুষই মানুষের চরিত্র নষ্ট করে। পাপ করাতে বাধ্য করায়। চরিত্র আর পাপের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। বাঁচার অধিকার সর্বজীবের জন্মগত।

খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দারোগা। তাঁর কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে, "ওনারাও এসে গেছেন—ওনাদের সামনেই বল, রাজারামের সঙ্গে এই অন্ধকার রাতে তুমি কেন ওখানে গিয়েছিলে?"

আমাদের সকলের দিকে একবার তাকায় মেয়েটি। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "রাজারাম বলেছিল মা নাকি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমাকে দেখতে চেয়েছেন। সাত বছর মাকে দেখি নি। তাই রাজারামের সঙ্গে গ্রামে যাচ্ছিলাম। তখন বুঝি নি, যাকে ফাঁকি দিতে রাজারামকে সাথী করেছিলাম, সেই ডাইনী রূপকুমারীই তার হাতে আমার মৃত্যুবাণ পাঠিয়েছে।" মেয়েটি থামে।

তাকে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ দিয়ে দারোগা আবার জিজ্ঞেসা করেন, "ডাইনী জেনেও রূপকুমারীর কাছে পড়েছিলে কেন? রাজারামের মত ভয়ঙ্কর লোককে বিশ্বাস করেছিলে কেন?"

"সবই আমার অদৃষ্ট। রূপকুমারীর প্রলোভনে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে একদিন ঘর ছেড়েছিলাম। পরদিন হয়তো আমার বিধবা মা কাঁদতে কাঁদতে পাড়া-

পড়শীর কাছে আমাকে খুঁজে দেবার জন্ত মিনতি করেছিলেন। আমি তখন রূপকুমারীর সঙ্গে মুসৌরীর পথে। দারোগাসাহেব, বড় গরীব আমরা। বছরের অর্ধেক দিন দু বেলা খেতে পাই না। ভগবান আমাদের স্বাস্থ্য দিয়েছেন, রূপ দিয়েছেন, কিন্তু অন্ন দেন নি। খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। তাঁকে আমার মনেও পড়ে না ঠিকমত। জ্ঞান হবার পর থেকেই মাকে দেখেছি গাঁয়ের অবস্থাপন্নদের কাছে দিনমজুরী খাটতে। সারাদিন খেটেও পেটভরা খাবার জুটত না দুজনের। অথচ খেতে না পেলেও রূপ আর যৌবন আমার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। মাঠে মাঠে কাজ করে বেড়াতাম মায়ের সঙ্গে। এই সময় একদিন রূপকুমারী আর রাজারামের সঙ্গে দেখা। ওরা বেড়াতে এল আমাদের বাড়ীতে। মা'র অনুপস্থিতির সুযোগে রূপকুমারী আমাকে একখানা দশ টাকার নোট দিল। একসঙ্গে দশ টাকা কোন দিন হাতে পাই নি। আমাকে দ্বিধা করতে দেখে হেসে ওঠে সে, 'লজ্জা কি গুনরী! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। বিকেলে আমার বাড়ি যেও। আরও অনেক জিনিস দেব। ভাল ভাল ওড়না ঘাঘরা…'

"লোভ সামলাতে পারি নি। গিয়েছিলাম। গাঁয়ের আরও দু-তিনটি মেয়ে ছিল সেখানে। তারা রূপকুমারীর সঙ্গে মুসৌরী যাচ্ছে। পেটভরে খেতে পাবে। গয়না পাবে। নতুন নতুন পোশাক পাবে। আমিও চাইলাম ওদের সঙ্গী হতে। রূপকুমারী রাজী হল। মা পাছে আপত্তি করেন তাই মাকে না জানিয়েই একদিন ডাণ্ডিতে চেপে বসলাম।" থামে গুনরী। নীরব কিছুক্ষণ। তার পর বলে, "একটু জল।"

নার্স ফিডিং বোতলে জল ভরে ওর মুখের কাছে ধরে। সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করে নিজের একখানি হাত দিয়ে মুখ মুছে নেয় গুনরী। তারপর আবার শুরু করে, "রূপকুমারী নিজেও মল্লিগ্রামের বাসিন্দা। সেও আমার মত জাতে কোল্টা। রূপের মোহ ছড়িয়ে একদিন সে বশ করেছিল যুবরাজ মহেন্দ্রসিংকে। যুবরাজ তখন মাঝে মাঝে উত্তরকাশীতে আসতেন। রাস্তায় রাস্তায় নেচে গেয়ে বেড়াত রূপকুমারী। একদিন তাকে দেখলেন যুবরাজ। রাওয়াইয়ের রূপসী জ্বালা ধরাল তাঁর বুকে। সন্ধ্যার পর নিজের কুঠিতে তাকে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানালেন যুবরাজ। রূপকুমারী এল রূপের পসরা নিয়ে। মোহাচ্ছন্ন যুবরাজ সে রূপের মূল্য দিতে কার্পণ্য করলেন না। রাওয়াইয়ের প্রথম প্রতিভা রূপকুমারী। কিন্তু সে-যুগের উত্তরকাশী যুবরাজের এই রূপচর্চায় বাধা দিল। রূপকুমারীকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন মুসৌরী। মুসৌরীতেই স্থায়ী বাসা বাঁধল রূপকুমারী। যেসব ধনীরা মুসৌরীতে আসে দেহ আর মনের সংস্কার সাধন করতে, রূপকুমারী তাদের সাহায্য করে।

ক্লাবে গিয়ে তাদের সঙ্গে মদ খায়। রাত বাড়লে নিয়ে আসে তার বাড়িতে—মুসৌরীর আনন্দনিকেতনে। খ্যাতি বাড়ল। একা সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল। ফিরে এল মল্লিগ্রামে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখিয়ে উপোসী অথচ রূপসী যুবতীদের নিয়ে যায় মুসৌরী। তাদের নাচ গান ও লেখাপড়া শেখায়। তারা ব্যবসা চালায়। মুনাফা থাকে রূপকুমারীর হাতে।"

ডাক্তার শুনৃরীকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন। আত্মজীবনী বলছে এক পাপিষ্ঠা। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে এত কথা অবান্তর। তবু আজ এই প্রথম সে নিজের কথা শোনাবার মত শ্রোতা পেয়েছে। রূপকুমারী তাকে যে জীবনে টেনে নামিয়েছিল, সে জীবনে তার ছিল শ্রোতার ভূমিকা। অন্যের অতৃপ্ত জীবনের কথা শুনে তৃপ্তি দেবার দায়িত্ব ছিল তার। নিজের কথা ভাববারও ছিল না কোন অবকাশ। কিন্তু আজ সে বক্তা।

নার্স এসে জ্বর দেখে গেল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করে গমনোন্মুখ হলেন। শুনৃরী ডাক দেয়, "ডাক্তার সাহাব।"

ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার। কিন্তু কিছু বলবার আগেই শুনৃরী বলতে থাকে, "আপনি যাবেন না। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। দারোগা সাহাব জানতে চান, আমি রাজারামের মত একটা ভয়ঙ্কর লোককে কেন বিশ্বাস করেছিলাম! ভয়ঙ্কর লোকেরাই যে আমাদের সহায়। একবারও যদি জানতে পারতাম রাজারাম আমাকে পেছন থেকে ছোরা মারবে, তা হলে ওকেও আমি জীবন নিয়ে ফিরে যেতে দিতাম না। অন্ধকারে আমাদের ভয় করে না। আপনারা যখন দৈনন্দিন কাজ শেষ করে বিশ্রামের আয়োজন করেন, আমাদের কাজ তখন থেকেই শুরু। মানুষকে মেরে ফেলতে দেখলে শুনৃরীর ভয় হত। কিন্তু ফুলকুমারী ভয় পায় না। আমি আর শুনৃরী নই ডাক্তার সাহাব। রূপকুমারী আমার নাম রেখেছিল ফুলকুমারী। অনেক হত্যা ফুলকুমারী দেখেছে। এমন কি করম সিংয়ের হত্যা!"

"করম সিং? যার হত্যাকাণ্ড নিয়ে সারা গাড়োয়াল তোলপাড় হয়ে গেছে? লাখ্নৌ চীফ কোর্টে যে আপীল চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে?" প্রশ্ন করি।

"জী হাঁ।" জবাব দেয় ফুলকুমারী।

মনে পড়ে—সে মামলার প্রধান আসামী ছিল রূপকুমারী নামে এক পতিতা। বেনিফিট অব ডাউটের জন্য আসামীকে শাস্তি দেওয়া যায় নি।

"করম সিংয়ের হত্যা তুমি নিজে দেখেছ?" উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলেন দারোগা।

"হত্যা করতে দেখি নি ঠিক। তবে তাঁর মৃতদেহ আমার ঘরে এনে রেখেছিল ওরা। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য আমাকে সে রাতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেরাদুন।"

"তাঁকে কেন হত্যা করেছিল?"

"টাকার লোভে। করম সিংয়ের সঙ্গে অনেক টাকা ছিল। ক্লাব থেকে সকলের অলক্ষ্যে রূপকুমারী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সম্ভ্রান্ত বংশের বিবাহিত যুবক বলেই হয়তো কাউকে না জানিয়ে গোপনে এসেছিলেন তিনি। মুসৌরী এসেছেন। কয়েকটা দিন একটু ফুর্তি করে যাবেন। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই সেজে-গুজে বসে থাকার আদেশ ছিল আমার ওপর। বড় ঘরের ফরাসে মখমলের চাদর পড়েছে। রূপোর আলবোলায় বেনারসী তামাক পুড়ছে। আতরের গন্ধে উতলা হয়েছে বাতাস। করম সিংকে সঙ্গে নিয়ে রূপকুমারী ঢুকল ঘরে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ফরাসের ওপর বসলেন সিংজী। রাজারাম তবলায় চাঁটি মারল। নাচগান শুরু করলাম আমরা। স্থায়ী খদ্দেরদের বেলায় অবিশ্যি অন্য নিয়ম ছিল। কিন্তু নতুন অস্থায়ী খদ্দেরদের সঙ্গে কোন দিন টাকাপয়সার কথা আগে থেকে বলে নিত না রূপকুমারী। বাড়ি নিয়ে এসে আবদার করে, ঠকিয়ে অথবা জোর করে কেড়ে নিত সব। অনেক সময় মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হত কপর্দকহীন অবস্থায়। সিংজী কিন্তু মদ খেতে রাজী হলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করল রূপকুমারী। নিজে গান গাইল নাচল। সিংজী অটল। নাচগান শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর কাছে গিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে রূপকুমারী, 'এ কি! এরই মধ্যে উঠলেন যে বড়!'

হাতঘড়ির দিকে নজর দিয়ে জবাব দিলেন সিংজী, 'রাত বারোটা বেজে গেছে। এবারে হোটেলে ফিরব। ভারি আনন্দ পেলাম তোমার এখানে এসে। কাল চলে যাচ্ছি, নৈলে আর একদিন আসতাম।' শেরওয়ানীর ভেতর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করলেন তিনি। সেদিকে চাইতেই আমার সারাদেহে উষ্ণ রক্ত বইতে শুরু করল। ঐ সেই টাকা—যার জন্য মল্লিগ্রাম ছেড়েছি, যাকে ভুলেছি, রূপকুমারীর শয়তানীর সহায় হয়েছি। অথচ সিংজীর হাতে যা আছে তার এক-দশমাংশ যদি আমার থাকত তাহলে আর এ নির্যাতন সইতে হত না। শুধু আমার নয়, রূপকুমারীর চোখ-দুটোও জলজল করে উঠল। বাজপাখির মত সিংজীর হাতের দিকে তাকিয়ে রইল রাজারাম।

সিংজী রূপকুমারীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দিতে হবে?'

'বিশ টাকা।'

হাতের নোটগুলো নাড়াচাড়া করে একখানা নোট এগিয়ে দিলেন রূপকুমারীর দিকে।

'এ যে একশ টাকার নোট! আমার কাছে তো ভাঙানী হবে না!'

'ভাঙানী আমি চাই না। এটা তুমি নাও। খুশি হয়ে দিলাম তোমাকে, আমার কাছে সবই শয়ের নোট।'

'আপনি দিলেও আমি নিতে পারব না। রাতে না থাকলে আমি অত টাকা নিই না।'

'কিন্তু আমি যে বলে আসি নি কাউকে। হোটেলে না ফিরলে চিন্তা করবে সবাই।'

'বেশ তো। যান না আপনি। নাই বা দিলেন কিছু। আপনাকে ভাল লেগেছে আমার। গান শুনিয়ে খুশি হয়েছি। সকলের কাছ থেকে টাকা নেব বলে তো আর নাচ-গান শিখি নি।'

'না না। তা কি করে হয়! এই তোমাদের পেশা।' কি একটু ভেবে নিলেন সিংজী, 'আচ্ছা রাতে যদি তোমার এখানে থাকি···'

'জী।'

'কিন্তু কাল যে খুব সকালে ফিরে যেতে হবে।'

'ব্যবস্থা করে দেব।' রাজারামকে ইশারা করে তানপুরার কাছে গিয়ে বসল রূপকুমারী।

খানিকক্ষণ বাদে রূপকুমারীর আদেশে যে যার ঘরে চলে গেলাম আমরা। সিংজী তখন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছেন। বুঝলাম এজাতীয় আসরে আসার অভ্যাস নেই তাঁর। অনভিজ্ঞ ধনী যুবক।

রাত তখন প্রায় তিনটা। রূপকুমারীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলতেই রূপকুমারী বলে, 'ফুল, রাজারামের সঙ্গে এক্ষুনি তোকে দেরাদুনে যেতে হবে। কয়েকদিন থাকতে হবে কুমারসাহেবের বাংলোতে। এই চিঠিটা কুমার সাহেবকে দিবি। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায়, তুই আজ রাতে মুসৌরী ছিলি'।"

অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছে গুনূরী। ডাক্তারের ইশারায় আমরা উঠে দাঁড়ালাম। উত্তেজিত কণ্ঠে গুনূরী বলে, "আপনারা যাবেন না। বসুন। শুনে যান শেষ পর্যন্ত।"

"আমরা জানি তার পরের কথা। রাস্তার পাশে তোমার ঘরে পরদিন সকালে করম সিংয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়। একটা ভাঙা তালা পড়েছিল দোরগোড়ায়। কিন্তু আদালতে প্রমাণ হল রূপকুমারী সে রাতে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে নিয়ে

বিচারে তোমরা বেকসুর খালাস পাও।"

দারোগা চুপ করলে ডাক্তার গুন্‌রীকে বলেন, "বিগত দিনের ও-সব কথা মনে করে আজ আর কোন লাভ নেই। রূপকুমারী এরকম অনেক পাপ করেও ধনী আর প্রতিষ্ঠাবানদের সহায়তায় বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।"

"শুধু বেঁচে নেই, আজও সে আমার মত মেয়েদের সর্বনাশ করে চলেছে। অথচ আমাদের অর্জিত টাকার প্রাপ্য অংশ আমরা কখনও হাতে পাই না। মুখে বলে আমাদের টাকা তার কাছে জমছে। কিন্তু সে টাকা চাইতে গেলেই আমাদের জীবন হয় বিপন্ন। ওর হিসেবেই আমার সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জমেছে ওর কাছে। কয়েক দিন আগে সে টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু পাই নি। বলেছিলাম, না দিলে পুলিসের কাছে বলে দেব সব। তাতে আমার জেল হয় সেও ভাল। কিন্তু ও যাতে রাওয়াইয়ের আর কোন মেয়ের সঙ্গে বেইমানি না করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।"

"তুমি এবার একটু চুপ কর।" ডাক্তার আবার বাধা দেন।

গুন্‌রীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে যেন বলে চলেছে তার কথা, "চুপ? হ্যাঁ, চুপ আমি করব বৈকি। করতেই হবে। চিরকাল জিতে এসেছে রূপকুমারী। আজও তার জয় হবে। কিন্তু যতক্ষণ না ভগবান আমাকে চুপ করিয়ে দেন, ততক্ষণ আমাকে চুপ করতে বলবেন না ডাক্তার সাহাব। আর—আর সত্যই যদি আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, তা হলেও রূপকুমারীর কথা কোন দিন আমি বলব না। শুধু চারটি খেতে দেবেন আমাকে—চারটি খেতে···! আমিও আপনার সঙ্গে মানুষের সেবা করব। আজ শুধু শেষ-বারের মত প্রকাশ করতে দিন রূপকুমারীর স্বরূপ।" জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে গুন্‌রী। তবু ডাক্তার আর তাকে বাধা দেন না। বোধ হয় আর কোন লাভ নেই বলেই—

"কাল বিকেলে রাজারাম বলে আমার মা নাকি অসুস্থ। আমাকে দেখতে চাইছেন তিনি। এর আগে দুবার মায়ের কাছে লোক পাঠিয়েছি। মা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঠিয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই মা আমাকে দেখতে চেয়েছেন! লুকিয়ে রাজারামের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পরম নিশ্চিন্তে বাড়ির পথে চলেছিলাম। সেই বাড়ি, যেখানে ছোটবেলায় মা'র হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মা, যাঁকে দিবারাত্র নানা আবদারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে একদিন যাঁকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি। পৃথিবীতে একমাত্র

আপনার জন হওয়া সত্ত্বেও যিনি আমার অধঃপতনকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারেন নি। সেই মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন! আবার তাঁকে দু চোখ ভরে দেখতে পাব। তাঁর কোলে মাথা রেখে আকাশের তারা গুনব। আমার সব কিছু দিয়ে তাঁকে সুখী করে তুলব। কিন্তু সব মিথ্যে—মা আমাকে ক্ষমা করেন নি। আমি শুধু রাজারামের ছোরাকে দেহে ধারণ করতে রূপকুমারীর ফাঁদে পা দি··· য়ে···ছি···লা···ম।" ওর দু চোখের কোলে অশ্রু। ডাক্তার নাড়ীটা পরীক্ষা করলেন একবার। নার্সকে বললেন অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে।

দারোগার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বিদায় নিলাম শুনৃরীর কাছ থেকে। চিরবিদায়। আর সে বলবে না রূপকুমারীর কথা। কেউ শুনতে পাবে না তার জীবন-কাহিনী। চুপ করেছে শুনৃরী। রূপকুমারী তার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। আর কোন দিন গান গাইবে না ফুলকুমারী।

অকালে ঝরে পড়ে ফুল। অসময়ে মরে যায় মানুষ। পথচারী ব্যথাতুর নয়নে চেয়ে থাকে ফুলটির পানে। প্রিয়জন কাঁদে মানুষটির জন্যে। কিন্তু যে ফুল পথচারীর অগোচরেই শুকিয়ে যায়? যার কাঁদার জন নেই এ সংসারে?

উত্তরপ্রবাহিণী গঙ্গা। গঙ্গাই বলব। চুলচেরা বিচারে নানা নামে অভিহিত। প্রতিটি ধারার আলাদা নাম। কিন্তু নানা নামের অস্তিত্বকে স্বীকার করি না আমি। আমার কাছে সবই এক। আমার জন্মভূমির স্নিগ্ধসমীর গঙ্গার তীরে। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘট ভরে কুলবধূ। গঙ্গার বুকে পাল তুলে আমার দেশের মহাজনী নৌকা ভাসে। লক্ষ্মণাবতী গৌড় পাণ্ডুয়া টাণ্ডা রাজমহল মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের গঙ্গা। গঙ্গা আমার নদে'র ধাত্রী। কলির ভগবানের জন্মদাত্রী। 'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার।' আমি ভাগীরথীকে চিনি না, মন্দাকিনীকে জানি না, অলকানন্দাকে মানি না। আমার কাছে সবাই গঙ্গা। উত্তরকাশীর উত্তর-প্রবাহিণী গঙ্গা।

প্রবাহের দিক থেকে কাশীর সঙ্গে উত্তরকাশীর মিল রয়েছে। গঙ্গাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে ভগীরথ পর্বত। গঙ্গা বইবে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পুবে। অথচ হরিদ্বার এলাহাবাদ ও মুঙ্গেরে গঙ্গা বইছে পুব থেকে পশ্চিমে। কাশী ও উত্তরকাশীতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

প্রবাহের দিক থেকে মিল থাকলেও প্রকৃতির দিক থেকে নেই। কাশীর মত দিগন্তপ্রসারী ঘোলা জলের সমারোহ নেই উত্তরকাশীতে। বল্লপরিসর পাথরে বোঝাই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে উন্মত্ত আবেগে ছুটে চলেছে স্ফটিক-স্বচ্ছ প্রাণচঞ্চল

মিলেছে উত্তরকাশীর উপত্যকায়, আর এক দিকে গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশছোঁয়া খাড়াই পাহাড়।

গঙ্গার বুকে বড় একখানা পাথরের উপর বসে আছি আমি ও রঞ্জন। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কার্ল সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর তাকে বার করতে পারি নি। সব হারিয়েও যে হাসিটুকু হারায় নি, আজ তাকেও হাসতে দেখি নি। পলিনের মৃত্যু যাকে করেছে মায়ামুক্ত, শুনৃরীর মৃত্যু কি তাকে করল মায়াময়?

আমিও ভাবছিলাম শুনৃরীর কথা। মানুষ মরলে তার প্রিয়জন কাঁদে। কিন্তু যার কাঁদার জন নেই এ সংসারে? শুনৃরীব মা হয়তো জানতেও পারবেন না তাঁর একমাত্র সন্তানের অকালমৃত্যুর কথা। জানলেও সমাজের শাসনে শোকপালন করতে পারবেন না তাঁর এই স্নেহ-বুভুক্ষু চরিত্রহীনা কন্যার জন্য। তবে কি কেউ কাঁদবে না শুনৃরীর মৃত্যুতে? কেন কাঁদবে না? মানুষ মানুষকে কাঁদায়, আবার মানুষ মানুষেব জন্য কাঁদে। ওবেরামেৰ্গোর এক দার্শনিক অশ্রুপাত. করছে মল্লিগ্রামের এক পতিতার জন্য—

'একই আকাশ ঘটে ঘটে
একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে।'

॥ ত্রিশ ॥

চৌকিদারকে বলতেই ঘর পেয়ে গেলাম। মানেরী ধর্মশালার অবস্থানটি বড় সুন্দর। এক পাশে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। সামনে একটা নালা। পেছনে পাহাড়। নালা আর গঙ্গার মধ্যে ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডের ওপর ধর্মশালা আর কতগুলো দোকান। নালার ওপর একটা পুল। আমরা কিন্তু পুল না পেরিয়ে নালা ডিঙিয়ে ধর্মশালায় এসে উঠেছি।

আমরা মানে আমি রঞ্জন সুমন সাবিত্রী ও তার দাদা। যাদের সঙ্গে ধরাসু থেকে হাঁটাপথ ধরেছি, তারা কেউ আর আমাদের সঙ্গে নেই। কার্ল ও অরোরাদের ফেলে এসেছি উত্তরকাশীতে। সময়ের বিচারে কতক্ষণই বা ছিলাম ওদের সঙ্গে। তবু জীবনের বিচারে এ সময়টুকুর মূল্য অনেক। একসঙ্গে চলেছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি—আনন্দে মেতেছি, ব্যথায় ছটফট করেছি। আর কোন দিন কার্লের দোভাষীর কাজ করতে হবে না। কোন দিন মিসেস্ অরোরার স্নেহমধুর ধমকানি শুনব না। আজ তাই কিছুই ভাল লাগছে না। উত্তরকাশী থেকে এই সাড়ে দশ

মাইল পথ আসতে প্রতি পদক্ষেপে ওদের মনে করেছি। ওরাও নিশ্চয় আমাদের মনে করেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে মনের আকর্ষণের প্রভাব কতটুকু? আমরা এগিয়ে এসেছি, ওরা থেকে গেছে পেছনে। ওদের সজল চোখের বিদায় অভিনন্দনকে সম্বল করে গঙ্গাকে ডাইনে-রাখা অপেক্ষাকৃত সমতল পথটি দিয়ে আমরা এসেছি মানেরী।

আজ আর আগে-পেছনে চলি নি। একসঙ্গেই হেঁটেছি সবাই। পথে অসি সঙ্গম দেখেছি। গঙ্গার সঙ্গে অসি এসে মিলেছে। ওখান থেকে ১৮ মাইল দূরে বরফানি পাহাড়ের ঘেরা ডোরিতাল। দু মাইলের বেশী পরিধি, স্বাদু জলের একটি হ্রদ। অসির উৎস। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্মস্থান। গণেশ ওল্টাবার ব্যাপারে মারোয়াড়ী ব্যাপারীরা যতই পটু হয়ে থাকুন, বাবা গণেশকে সত্যই ওঁরা মনেপ্রাণে ভক্তি করেন। কয়েকজন মারোয়াড়ী তীর্থযাত্রীকে দেখলাম ও-পথে যেতে। পাহাড়ী পথ। পথে কোন দোকান বা চটি নেই। যাতায়াতের মত খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। হ্রদের তীরে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঠিয়ায় যদি ঠাঁই মেলে ভাল, নইলে আকাশতলে রাত কাটাতে হবে।

ঘর পেলেও ঢুকতে পারি নি। সুমন আর সাবিত্রীর কড়া হুকুম, ঘর সাফ না হলে ভেতরে ঢোকা চলবে না। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল না—ডাক পড়ল। প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছে ওদের। নোংরা কাঠের মেঝেটা ঝকঝকে করে তুলেছে ওরা দুজনে। কম্বল পর্যন্ত বিছানো হয়ে গেছে। কম্বলে গা এলিয়ে দিলাম আমরা তিনজন। কুলিরা চা নিয়ে এল। সুমন পরিবেশন করল।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সাবিত্রী দাদাকে বলে, "শুধু চায়ে কতক্ষণ পেটের জ্বালা সামলাবে? রান্না হতে দেরি আছে। একবার দোকানে গিয়ে দেখ না সুজি ও চিনি পাও কিনা!"

দাদার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। ঢোক গিলে জবাব দেন, "এখানে ওসব পাওয়া যাবে কি? এক কাজ কর্, কুলিদের কাউকে পাঠিয়ে দে!"

"তার চাইতে সোজাসুজি বললেই পার যেতে পারবে না!"

দাদা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু একটা বলার চেষ্টায় ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বলি, "ওঁর যখন ইচ্ছে করছে না, কেন জোর করছেন? দাদা বিশ্রাম করুন, আমি যাচ্ছি।"

সাবিত্রী দাদার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

"কি দুখানা পা নিয়ে জন্মেছেন এ সংসারে! ভালই হল, আর ঘরে বসে ছটফট করতে হবে না—বাইরে যাবার একটা ছুতো মিলেছে।"

সুমনের কথায় লজ্জা পেলাম। ভেবেছিলাম এক ঢিলে তিন পাখী মারব। দাদা বিশ্রাম করবেন, সবাই হালুয়া খাবে আর আমারও টহল দেওয়া হবে। কিন্তু ধরা পড়ে গেছি। কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলি, "তা হলে থাক। যাকে খুশি দোকানে পাঠাও গে।"

সুমন কোন জবাব দেয় না। রেগে গেছে। এইজন্যই জ্ঞানীরা বলেন—'পথি নারী বিরর্জিতা'; কিন্তু বর্জন করতেও যে মন চাইছে না। অতএব—

"শুধু সুজি চিনি আনলেই চলবে, না আরও কিছু?"

সুমন এখনও নিরুত্তর। মুচকি হেসে সাবিত্রী বলে, "আপাতত আর কিছু দরকার নেই। পরে দেখা যাবে।"

চৌকিদার ধর্মশালার একপাশে দোকান করে বসেছে। আমি কিন্তু এগিয়ে চলি পুলের ধারে। যাবার সময়ে দেখে-যাওয়া পাঞ্জাবী মেয়েটির দোকান—ছোট ভাইটির সহায়তায় দোকান চালাচ্ছে সে। আমাকে বসতে বলে মেয়েটি। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দোকানের একপাশে পড়ে থাকা জরাজীর্ণ একটা প্যাকিং বাক্স। ভাই দেখছি দিদির চেয়েও ভদ্র। এক লাফে ও সে বাক্সটা ঝেড়ে দেয়। তারপরেই ভদ্রতার কারণ বুঝতে পারি। আর এক লাফে দোকানের বাইরে বেরিয়ে যায়। এগোতে থাকে পুলের দিকে। দিদি সাবধান করে, "ওমি, পালাবি না বলছি। ফিরে আয়। নইলে আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি। বাবা—"

ওমি কিন্তু বিচলিত হয় না। রাস্তা থেকে ছোট ছোট পাথর তুলে নালার মধ্যে ছুঁড়তে থাকে। মেয়েটি আর কিছু বলার আগেই পেছনের পর্দা সরিয়ে একজন গৌরকান্তি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বেরিয়ে আসেন। পরনে আধময়লা পায়জামা, গায়ে তুলোর ফতুয়া। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওমি!"

নিতান্ত সুবোধ বালকের মত হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ওমি এগিয়ে আসে। বলে, "আমি যাই নি বাবা। দিদিটা আছে খালি তোমার কাছে নালিশ করতে।"

বৃদ্ধ আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। দোকানের পেছন থেকে নারী-কণ্ঠের একটা আর্তনাদ ভেসে আসে, "জল, একটু জল!" ব্যস্তভাবে পর্দা ঠেলে ভেতরে গেলেন তিনি।

মেয়েটি ততক্ষণে সুজি-চিনি বের করে ফেলেছে। দিদিকে একটা শব্দহীন ভেংচি কেটে ওমি ঝোলানো বাটখারার সামনে এসে বসে। মেয়েটি আমাকে বলে, "বাবুজীর ঘর কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"কলকাতায়!...কলকাতা অনেক বড়, না বাবুজী?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের লাহোরের থেকেও বড় ?"

"তা বৈকি। তোমরা বুঝি লাহোর থেকে এখানে এসেছ ?"

"হ্যাঁ। আনারকলিতে থাকতাম আমরা। বাবা প্র্যাকটিস্ করতেন ওখানে।"

"প্র্যাকটিস্ !"

"লাহোর হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট ছিলেন বাবা। দাঙ্গার সময় সব ফেলে পালিয়ে এসেছি।"

"তা এখানে এলে কেমন করে ?"

"বরাত্, বাবুজী। দেশ ছেড়ে দেরাদুনে আসি আমরা। বাবা চেষ্টা করেছিলেন অনেক, কিন্তু এই বয়সে নতুন জায়গায় প্র্যাকটিস্ জমাতে পারলেন না। তাছাড়া মাগ্‌গী শহর—আর মার হয়ে পড়ল অসুখ। ঠাণ্ডা জায়গায় ভাল থাকেন তিনি। তাই দু বছর হল এখানে এসেছি।"

"এই দোকানের আয় থেকেই সংসার চলে তোমাদের।" বলেই লজ্জা পাই। এ প্রশ্ন করা ঠিক হয় নি।

মেয়েটির মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না সে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে। জবাব দেয়, "চলে না। চালিয়ে নিতে হয়। মুশকিল কি জানেন ? এখানে কেনা-বেচা এই ছ মাস। শীতকালে যাত্রীরা আসেন না। বাবাও তখন উত্তরকাশী গিয়ে মালপত্তর বয়ে আনতে পারেন না। বুড়ো হয়েছেন তো। তাই বলে আমরা উপোস করি না। গ্রামের লোকেরা সাহায্য করে আমাদের। কোন লজ্জা পাই না ওদের সাহায্য নিতে। ওদের মধ্যেই থাকতে হবে চিরকাল। আস্তে আস্তে মেনে নেব ওদের আচার-আচরণ, মিশে যাব ওদের সমাজে।"

লাহোর থেকে মানেরী। উকিল থেকে মুদি। ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেল, আমরা তাদের স্মরণ করি শহীদ বলে। কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত শহীদ, তিল তিল করে নিজেদের ক্ষয় করে দিয়ে চলেছে স্বাধীনতার মূল্যে—তাদের আমরা কি দিয়েছি ? বৃত্তি ভুলেছে—সমাজ ভুলেছে—সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে—ভাষা ভুলতে বসেছে। স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে নিজেদের সকল সুখ ও শান্তি। পরাধীনতার সমুদ্র মন্থন করে অমৃত দিয়েছে আমাদের, আর হলাহলটুকু কণ্ঠে ধারণ করেছে নিজেরা। নব ভারতের এরাই তো নীলকণ্ঠ।

ধর্মশালায় ঢুকে মুচ্‌রার সঙ্গে দেখা। ওর হাতেই সুজি-চিনি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া নিরাপদ। মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছি। হালুয়া

খেতে খুব ভালবাসে মুচ্‌রা। পরম উৎসাহের সঙ্গে আমার আদেশ পালন করে সে। আবার বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করি, কিন্তু থামতে হল—

"এই এলেন বুঝি? আদিবাসী একটি মেয়ে সিঁড়ির ওপরে বসেছিল, আমাকে দেখে প্রশ্ন করে।

অবাক হলাম। অপরিচিতা মেয়ের পক্ষে সেধে আলাপ করার জন্য! কিন্তু লজ্জা, শরম, ভয়—তিন থাকতে তীর্থ নয়। আর মেয়েটি ঠিক অপরিচিতাও নয়। ধরাসু থেকে এদের দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হয়েছে।

বললাম, "হ্যাঁ। তোমরা সবাই ভাল তো?"

"ভাল না থেকে উপায় আছে? ভাল থেকেই রানীমার ওষুধ খেতে হচ্ছে রোজ!"

"রানীমা!"

"বা রে, রানীমাকে দেখেন নি? রাজগড়ের ছোট রানী। তাঁর সঙ্গেই গঙ্গোত্রী চলেছি আমরা। আগে তো মানুষ হয়েও মন্দিরে ঢুকতে পারতাম না, সরকারের কৃপায় এখন আর কোন বাধা নেই। রানীমা তাই আমাদের নিয়ে চলেছেন।"

রানীমার কথা জানার একটা কৌতূহল ছিল। পথে কয়েকবার তাঁকে ওষুধ বিলোতে দেখেছি। বয়স তিরিশের কোঠা পেরিয়ে গেলেও সৌন্দর্য আজও তাঁর দেহকে জুড়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে। অমায়িক ব্যবহার আর অনাড়ম্বর বেশভূষা দেখে শ্রদ্ধা করেছি মনে মনে।

"তোমরা বুঝি রানীমার প্রজা ছিলে?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিয়েই খেয়াল হল মেয়েটির। আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। অনুরোধ করে, "বসুন না বাবুজী।"

সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ি। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। জিজ্ঞেস করি, "কি হল?" উত্তর দিতে পারে না। সিঁড়ির উঁচু ধাপে বসেছিল সে। আমি ওর নীচে। বলি, "মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিলেও যে তোমরা সাড়া দিতে পার না। নিজেদের ছোট ভেবেছ বলেই তো সমাজ তোমাদের ছোট করে রাখতে পেরেছে। অধিকার অর্জন করতে হয়, শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে হয়।"

লজ্জা পেল মেয়েটি। ধুপ্‌ করে বসে পড়ল আগের জায়গায়। জিজ্ঞেস করি, "তোমাদের মহারাজা বুঝি খুব প্রজাবৎসল?"

"ঠিক তাই উল্টো। আমাদের কথা তিনি চিন্তাই করেন নি কোন কালে। তিনি ঘুরে বেড়ান কলকাতা বোম্বাই দিল্লী সিমলা।"

"সে কি, মহারাজ যান সিমলা আর মহারানী এসেছেন গঙ্গোত্রী!"

"ছোট রানীমা চিরকালই তাই করেছেন। মহারাজার সঙ্গে যান বড় রানীমা। তিনি রাজবংশের মেয়ে। ওসব জায়গার চালচলন জানা আছে তাঁর।"

"ছোট রানীমা বুঝি গরীবের মেয়ে? কিন্তু চেহারা দেখে তো মনে হয় না!"

"ঐ চেহারার জন্যই তো রানী হতে পেরেছেন।" একবার চারদিক দেখে নেয় মেয়েটি। তারপর গলার স্বর আরো খাটো করে বলে, "ছোট রানীমার বাবা মহারাজার কর্মচারী ছিলেন। রূপে ভুলে তাঁকে বিয়ে করেন মহারাজা। তা হলেও রাজবাড়ির চালচলনের সঙ্গে ছোট রানীমা কোন দিনই খাপ খাওয়াতে পারেন নি নিজেকে। তীর্থদর্শন ও দানধ্যান করে দিন কাটাচ্ছেন। মহারাজাও বাধা দেন না। তাঁকে যে খুব ভালবাসেন তিনি।"

"রাজারানীর ভালবাসার কথা শুনে আর কতক্ষণ নিজের কথা ভুলে থাকা হবে?" সুমন কখন এসে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে।

"কেন? খাবার হয়ে গেছে।"

"না, বসে আছে এখনও!"

"খাবার না-হয় নাই-বা বসে থাকল! একজন তো বসে থেকে থেকে তার পর খুঁজতে বেরিয়েছে।"

"ভারী আনন্দের কথা! ওদিকে যে রাতের রান্না চড়াতে পারি নি এখনও, সে খেয়াল আছে?"

"যার রান্না তার যখন খেয়াল আছে, আমি কেন অনধিকারচর্চা করতে যাব?"

উঠে দাঁড়ায় আদিবাসী মেয়েটি। সুমন কিছু বলার আগেই বলে, "বাবুজী নমস্তে। বহিনজী, আমি চলি এখন তাহলে।"

হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করে সুমন, "কি নাম মেয়েটির?"

"জিজ্ঞেস করি নি।"

"কি, হাসছেন যে বড়?"

"তোমার কৌতূহল দেখে।"

"ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ওরকম বললে আর কথা বলব না আপনার সঙ্গে।"

"থাকতে পারবে?"

"ছিলাম তো এত দিন।"

"আমাকে ছুঁয়ে বলতে পার, তোমার কৌতূহল হয় নি?"

কোন উত্তর দেয় না সুমন। নিঃশব্দে চলতে থাকে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি, "কি? কিছু বলছ না যে?"

"বলব না, যান।"

॥ একত্রিশ ॥

মানেরী থেকে মাল্লা। এ ছ মাইল আসতে কষ্ট হয় নি কোন। চড়াই হলেও মাত্র চারশ সত্তর ফুট ওপরে উঠেছি। মাল্লার উচ্চতা চার হাজার আটশ পঞ্চাশ ফুট। রাস্তাও ভাল। কয়েকটা দোকান আর দুটো চটি আছে এখানে। মাল্লা ও পথের জংশন। এখান থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ যাবার রাস্তা আছে। যাঁরা একসঙ্গে চার ধাম করেন তাঁদের কাজে লাগে এ রাস্তা। উত্তরপ্রদেশ সরকার একটা পশম শিল্প কেন্দ্র খুলেছেন এখানে। দূর দূর থেকে লোকেরা ভেড়া নিয়ে আসে। ওদের লোম ছেঁটে নেন কেন্দ্র-কর্তৃপক্ষ। ভেড়ার মালিক পায় অর্থ। আর মালিকের ভেড়া হয় চর্মসর্বস্ব।

আসার পথে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। মানেরী থেকে তখন বোধ করি মাইল দুয়েকও হাঁটি নি। পথের দুধারে ক্ষেত। মেয়েরা কাজ করছে। হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জী পরে আমি ও রঞ্জন আগে আগে হাঁটছি। হাতে লাঠি। আমাদের পঞ্চাশ-ষাট হাত পেছনে সুমন সাবিত্রী ও দাদা। অনেকক্ষণ থেকেই গুন্ গুন্ করছিল রঞ্জন। সবে গলা ছেড়েছে—'কি মায়া লাগল চোখে সকালবেলা···' এমন সময় থামতে হল সুমনদের চিৎকারে। পেছন ফিরে তাকাই। হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছে ওরা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করছে বলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তা হলেও মনে হচ্ছে ওরা যেন সাবধান করছে আমাদের। বলতে চাচ্ছে, 'হুঁশিয়ার! মারল! ডাকাত!' ডাকাত? প্রকাশ্য দিবালোকে গঙ্গোত্রীর পথে ডাকাত? এ তো মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। রঞ্জনের চোখের মায়াও বোধ করি মুছে গেছে এতক্ষণে; প্রায় সাত-আটজন লোক লাঠি হাতে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। পোশাক দেখে স্থানীয় লোক বলেই মনে হচ্ছে। তবে কি এখানকার লোকেরা ডাকাতি করে? অসহায় তীর্থযাত্রীদের সব কিছু লুটপাট করে নেয়? আর ভাবার সময় নেই। লাঠিটাকে শক্ত করে ধরি। লড়ব শেষ পর্যন্ত। ওরা এসে পড়ল। লাঠি তুলতে গিয়ে থামতে হল।

"নমস্তে শেঠজী।"

এ আবার কি ধরনের ডাকাতি? সর্বনাশ করতে এসে নমস্কার করছে! ভুল ভেবেছি। সর্বনাশ করতে আসে নি ওরা। সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের সাহায্য চাইতে এসেছে।

গত বছরে সরকার থেকে সার দিয়ে গিয়েছিল ওদের। ক্ষেতে সে সার দিয়ে

খুব ভাল ফসল পেয়েছে। এবারে এখনও সার পাঠাই নি 'আমরা'। সার না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওদের। ইতিমধ্যে স্বমনরাও ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এসে গেছে। দাদা রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। ওদের কথা শুনে হাঁফ ছাড়েন। স্বমন বলে, "এরা তোমাদের সার দেবেন কেমন করে? এঁরা তো যাত্রী।"

"রাম রাম। ঠাট্টা করছেন আমাদের সঙ্গে। গত বছর এঁরাই এসেছিলেন। হুদিন দেখেছি। বুড়ো হলেও চোখে ঠিক দেখতে পাই আমি।" দলপতি জানায় স্বমনকে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকি। হেসে ফেলে স্বমন। জিজ্ঞেস করি দলপতিকে, "আপনার ঠিক মনে আছে আমরা দুজন এসেছিলাম?"

"হ্যাঁ। সঙ্গে চারজন চৌকিদার ছিল।"

দলপতির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেঁটে লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে তার স্থান দলপতির পরেই—এতক্ষণ কথা বলার স্বযোগ না পেয়ে উস্‌খুস্‌ করছিল। এবারে বলে উঠল, "হ্যাঁ। চৌকিদারদের ছিল সরকারী পোশাক। আর আপনারা ঠিক এই রকম পোশাক আর রঙীন চশমা পরে ছিলেন।"

এইবারে ব্যাপারটা বোঝা গেল। আমরা নয় আমাদের পোশাক এসেছিল। অতএব আমরাই এসেছিলাম। ওদের ধারণা এ রকম খাকি হাফপ্যান্ট গেঞ্জি আর গগল্‌স কৃষিবিভাগের শেঠজীরা ছাড়া আর কেউ পরেন না। সে ধারণার পরিবর্তন করাতে চাইলে শুধু সময় নষ্ট হবে। কাজেই বলতে হয়, "আমরা শুধু জানতে এসেছি কার কতটুকু সার লাগবে?" পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করি। এক এক করে সকলের নাম ঠিকানা ও জমির আয়তন লিখে নিয়ে তার পর বলি, "ঠিক আছে। ব্যবস্থা করব।"

খুশি হয়ে ফিরে গেল ওরা।

"লোকগুলোকে মিথ্যে আশ্বাস দিলেন কেন?" স্বমন তিরস্কার করে।

"মিথ্যে আশ্বাস দিই নি। সত্যই ওরা সার পাবে। ভাটোয়ারীতে এগ্রিকালচারাল অফিস আছে। সেখান থেকে ওদের সার পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

স্বমন আশ্বস্ত হয়, আমি মিথ্যুক নই।

মাল্লা থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। আর মাত্র দু মাইল পরেই ভাটোয়ারী। শুনেছি বেশ বড় জায়গা। বিরাট ধর্মশালা ছাড়াও একটা ডাকবাংলো আছে। থাকার অস্থবিধা নেই। রান্নারও দরকার হবে না। কিনতে পাওয়া যাবে সব। এখন কিন্তু বেশ চড়াই ভাঙতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছি। প্রখর রোদে গলা শুকিয়ে আসছে।

গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ভাটোয়ারী পৌঁছেছি। প্রাচীনকালে ভাটোয়ারীকে বলতো ভাস্কর প্রয়াগ। ভাস্কর এখানে শিবের তপস্যা করেছিলেন। সিদ্ধিলাভ করে প্রতিষ্ঠা করেন আলোকেশ্বর শিবলিঙ্গ—চুরাশি লিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরটি এখনও আছে, তবে ভগ্নদশা।

পাহাড়ী নদী নহর ও জল এখানে এসে গঙ্গায় মিশেছে। নহর-সঙ্গম থেকে ভাটোয়ারী শুরু—জল-সঙ্গমে শেষ। ভাটোয়ারীর ওপর সরকারের নজর পড়েছে। অনেক নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। হাসপাতাল হাইস্কুল কৃষিগবেষণাগার বাস-অফিস প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুল অবিশ্যি এখনই একটা আছে। আশেপাশে তাকালে অনেকগুলো গ্রাম দেখা যায়। ভাটোয়ারী তাদের প্রাণকেন্দ্র।

চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু আমাদের অনুমান ব্যর্থ হল। ঘর দিতে পারবে না সে। ধর্মশালাটি যেমন বড়, আগন্তুকের সংখ্যাও তেমনি অনেক। সবাই তীর্থযাত্রী নয়। বেড়াতেও আসে কেউ কেউ। যান্ত্রিক সভ্যতার স্পর্শ বাঁচিয়ে, দূরে অবস্থিত হলেও, ভাটোয়ারীর সঙ্গে সভ্য জগতের যোগাযোগ আছে। একটু এ্যাড্‌ভেঞ্চারও হয় আবার সুখ-সুবিধারও অভাব নেই। যাত্রীরাও অনেকে দু-তিন দিন কাটিয়ে যান এখানে। ফলে ভিড় লেগেই আছে।

যাঁরা একসঙ্গে চার ধাম দর্শন করেন, ভাটোয়ারী তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন বিশ্রামকেন্দ্র। যমুনোত্রীগঙ্গোত্রী হয়ে এখানে এসে যাত্রীরা স্থির করেন কেদারবদ্রী যাবেন কিনা। সংকল্প করে এলেও, শারীরিক অবস্থার জন্য অনেকেই এগোতে সাহস পান না। কিন্তু সাহস দেবার লোকের অভাব নেই। রয়েছে কেদারনাথের পাণ্ডারা। এখান থেকেই তারা ধরপাকড় শুরু করে। অনিচ্ছুক নিমরাজী যাত্রীদের কাছে বাবা কেদারনাথ ও বাবা বদ্রীনাথের মাহাত্ম্য কীর্তন করে। পথকষ্টের কথা তুললে হেসে দেয়। বলে, "কোন কষ্ট হবে না। আমরা তো প্রতি বছরই তিন-চার বার যাতায়াত করছি। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর মত খারাপ রাস্তা নয়। বাবা কেদারনাথ স্মরণ করেছেন, না গিয়ে উপায় নেই আপনার। আপনার পিতা স্বর্গীয় জয়দুলাল সিং সেই আমলে বাবার পুজো দিয়ে গেছেন; আর আপনি এত কাছে এসেও বাবাকে রুষ্ট করবেন? আমার পিতামহ স্বর্গীয় বরুণ পাণ্ডা আপনার ধর্মপ্রাণ পিতৃদেবকে কেদারনাথদর্শন করিয়েছিলেন। আপনারা আমার তিন পুরুষের যজমান…"

জয়দুলাল সিংয়ের ধর্মপ্রাণ পুত্র দেহের প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করতে গিয়ে লজ্জিত হন। শ্রান্ত দেহ বলে, 'পারব না।' পুণ্যার্থী মন বলে, 'কেন পারবে না?' সহযাত্রীদের পরামর্শ অমান্য করে উঠে দাঁড়ান। চার ধাম দর্শন করার সংকল্প

করে ঘর ছেড়েছেন। কাপুরুষের মত সংকল্প পরিত্যাগ করবেন ? সহযাত্রীদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। এতদিন একসঙ্গে চলেছেন। চলতে চলতে পড়ে গেছেন। হাত-পা ছড়ে গেছে। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়েছেন। সামান্য কারণে ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে কথা বলেন নি। আজ তাদের সবার জন্যই দুঃখ হচ্ছে। তারা সবাই যাত্রা-জীবনের প্রিয়জন, সকল দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার। পুণ্যের লোভে, ধর্মের প্রয়োজনে আজ তাদের ছেড়ে যেতে হবে। তিলে তিলে গড়ে ওঠা অন্তরের এই মধুর সম্পর্ক অস্বীকার করে বিচ্ছেদ টেনে আনতে হবে নিজেদের মধ্যে। বিরহকাতর সিংজীকে দেখে আমার বুকেও একটা ব্যথার পরশ পাচ্ছি। লালাজী কার্ল মুন্না গুড্‌ডুকে এমনি ভাবেই ছেড়ে এসেছি। আজ যারা সঙ্গে আছে তাদেরও এক দিন ছেড়ে যেতে হবে। তবে কি সুমনকেও···?

যথারীতি চৌকিদারকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যাই। সে জানায় একটি মাত্র ঘর খালি আছে। ডাকবাংলো লোকে বোঝাই। এদিকে পুলিসের মহকুমা কর্তার নাকি আসার কথা। তাই তাঁকে একটা ঘর খালি রাখতে বলা হয়েছে।

"কিন্তু ধর্মশালার ওপর পুলিসের কোন অধিকার নেই। আপনি ইচ্ছে করলে খালি নাও রাখতে পারেন।" রঞ্জন চৌকিদারকে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চায়।

"তা পারি। কিন্তু পুলিস যখন বলেছে···"

"বললেও আইনগত কোন বাধা নেই আপনার। ইচ্ছে হলে ঘরখানা আমাদের দিয়ে দিতে পারেন। তাতে আপনারও লাভ, আমাদেরও সুবিধে।" রঞ্জন চৌকিদারের হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয়।

"ঠিক আছে। আপনি যখন বললেন। চলুন।"

ঘরে ঢুকেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধ থেকে নেবে গেছে। রাতটা ঘুমোতে পারব। চা ও কিছু খাবার কিনে আনল মুচ্‌রা। পরিবেশন করতে করতে সুমন আমাকে বলে, "স্নান সেরে আসুন। আপনারা ফিরে এলে আমরা যাব।"

গামছা তথা শিরস্ত্রাণ কাঁধে নিয়ে গঙ্গার দিকে রওনা হলাম। আমি ও রঞ্জন টুপি আনি নি। গামছা দিয়েই টুপির কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।

খরস্রোতা গঙ্গা। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা জল। ঘাটে খুব ভিড়। ঘাট মানে স্নান করার উপযোগী পাথরে বোঝাই নদীতীরের একফালি জায়গা। তীর ঘেঁষে জলের মধ্যে পড়ে থাকা একটা উঁচু পাথরের এ-পাশে ছেলেরা আর ও-পাশে মেয়েরা নাইছে। স্রোতের জন্য কোমর-জলের বেশী নামতে সাহস পায় না কেউ। জলে

নামলে পাথরের ওপাশটা দেখা যায় না। পাথরখানা মেয়েদের আবরু রক্ষা করছে।

প্রথমে শীত করলেও এখন বেশ আরাম লাগছে। হঠাৎ একটা চীৎকার কানে এল। পাথরের পরপারে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, "চলে গেল, চলে গেল।"

প্রখর স্রোতে একখানা শাড়ি ভেসে যাচ্ছে। জায়গাটা গভীর। কাজেই কেউই এগোচ্ছে না। কি করব বুঝতে পারছি না। বুঝতে হলও না। মাছরাঙার মত ছোঁ মেরে শাড়িখানা ধরে ফেলে রঞ্জন। বেশ কয়েক মিনিট স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে ফিরে এল ঘাটে—মেয়েদের অংশে। ততক্ষণে রঞ্জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে স্নানার্থীরা। গঙ্গা মেয়েটির বস্ত্রহরণ করেছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করে রঞ্জন তার লজ্জা নিবারণ করেছে। রঞ্জন আজ ভাটোয়ারীর শ্রীমধুসূদন।

ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। দাদার সঙ্গে পালোয়ান সদৃশ একজন রাজস্থানী যাত্রীর কুস্তির যোগাড়। আমাদের দেখে দাদার জোর বেড়ে গেল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলেন রাজস্থানীকে। নড়াতে পারলেন না একচুলও। রাজস্থানী পাল্টা ধাক্কা দেবার জন্য পাঁয়তাড়া কষছে। তার সঙ্গীরাও মারমুখী হয়ে উঠেছে। দাদা হাঁটি হাঁটি পা পা করে পেছনে এগোচ্ছেন। সুমন ও সাবিত্রী দাদার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অসহায়ের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর দেরি করলে দাদার সমূহ বিপদ বুঝে আমি দুজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। রাজস্থানী থেমে গেল। বিরক্তভাবে আমার দিকে তাকাতেই জিজ্ঞেস করি, "কি হয়েছে ?"

"হবে আবার কি! আমরাও এ ঘরে থাকব। মারামারি করবে, বেশ রাজী!" মরীয়া হয়ে উঠেছে সে।

"তোমরাও থাকবে—বললেই হল! তোমাদের জন্য আমরা এ ঘর নিয়েছি ?" আমার কিছু বলার আগেই দাদা চীৎকার করে উঠলেন।

তাঁকে ধমক লাগাই। তারপর রাজস্থানীকে বলি, "আপনি কিছু মনে করবেন না। অসুখে ভুগে ভুগে একটু খিটখিটে হয়ে গেছেন উনি।"

"তা এরকম বদরাগী লোককে নিয়ে তোমরা তীর্থে চলেছ কেন ?"

"মা গঙ্গা যাতে ওকে ঠাণ্ডা করে দেন।"

ক্ষেপে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দাদা। সাবিত্রী তাঁকে থামিয়ে দেয়। মজা পেয়ে সুমন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটা আসন্ন কুরুক্ষেত্র বেধে ওঠার মুখে থেমে গেল দেখে রঞ্জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। রাজস্থানীকে বলতে থাকি, "আপনারা থাকবেন এ ঘরে, অতি আনন্দের কথা।

আপনাদের মত ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের সেবা করার পুণ্য হবে আমাদের।"

সুমন আমার কানে কানে বলে, "কিন্তু এইটুকু ঘরের মধ্যে আট-নজন লোক থাকব কেমন করে ?"

ইংরেজিতে বলি, "তুমি ভেবো না কিছু। আমি ব্যবস্থা করছি। দাদা যে রাস্তায় এগোচ্ছিলেন, সেটা গঙ্গোত্রীর রাস্তা নয় হাসপাতালের রাস্তা। তোমরা বরং রঞ্জনকে সঙ্গে করে ঘাটে যাও। ফেরার সময় দোকান থেকে খেয়ে এসো।"

ওরা চলে গেলে রাজস্থানীদের বলি, "আপনারাও যান না। স্নান-খাওয়াটা সেরে আসুন। আমার যখন আজ খাওয়া হচ্ছে না, তখন আমিই আপনাদের মালপত্র পাহারা দিচ্ছি।"

"কেন, তোমার কি কোন উপোস আছে ?"

"না। তবে ক্রিয়াকর্ম না করে আমার খাওয়া নিষেধ কিনা।"

"বেশ তো, ক্রিয়াকর্ম সেরে ফেল।"

"সে সম্ভব নয়। তা যাক গে। হলামই বা পরিশ্রান্ত, এক দিন খাওয়া না জুটলে মরে যাব না। তার বদলে তিন-তিনজন পুণ্যাত্মাকে আশ্রয় দেবার—সেবা করার মহাপুণ্য তো হবে আমার।"

"আমরা ঘরে থাকলে তোমার ক্রিয়াকর্ম হতে পারে না ?"

"না। তবে ওসব কথা ভাববেন না আপনি।"

"তুমি না বললেই তো না ভেবে পারি না আমরা। আমাদের আশ্রয় দেবার পুণ্য হবে তোমার। আর তোমাকে উপোসী রাখার পাপ হবে আমাদের।" রাজস্থানী একবার থামে। তারপর সঙ্গীদের আদেশ করে, "নে মালপত্র তোল্! দেখি বারান্দায় হয়তো জায়গা পাওয়া যেতে পারে।"

না যাবার জন্য একাধিকবার অনুনয়ের অভিনয় করি। তার পর দরজা বন্ধ করে ভাবতে থাকি এই সরল লোকগুলোর কথা। মন যাদের এত সাদা, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা যাদের নেই, পাপের বিরুদ্ধে এত সজাগ দৃষ্টি যাদের—তাদের পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়োজন কি ? কেন তারা এই দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছে ? নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে এই যে মিথ্যার আশ্রয় নিলাম, এতে কি আমার কোন পাপ হল ? পাপ বলে কি সত্যই কিছু নেই এ সংসারে ?

দরজা খুলে দেখি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে সুমন ও সাবিত্রী কাঁপছে। জিজ্ঞেস করি, "সে কি ! কাপড় নিয়ে যান নি আপনারা ?"

"না। দারুণ শীত লাগছে।" সাবিত্রী জবাব দেয়।

সুমনের নজরে পড়ে রাজস্থানীরা নেই। অবাক হয়ে বলে, "ওরা কোথায় ?"

"জানি না।"

"স্নান-খাওয়া করতে বোধ হয়...। আশ্চর্য লোক, আপনাকে বিশ্বাস করে মালপত্র রেখে গেল না পর্যন্ত !" সুমন অবাক হয়।

সাবিত্রী খুশি হয়ে বলে, "ভালই হয়েছে। আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমরা কাপড় বদলে নিই। এখনই হয়তো এসে পড়বে আবার।"

"ওরা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। আর আসবে না। ওদের তাড়িয়েছি আমি।"

"কেমন করে ?"

"মিথ্যে কথা বলে।"

ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দাদা ফিরে এলেন খানিক বাদে। রাজস্থানীদের তাড়িয়েছি শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়তে গিয়ে থেমে গেলেন অতর্কিতে। ভুঁড়িতে চাপ পড়েছে। আমাকে ছেড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লেন কম্বলের ওপর। আমরা তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। একটু সামলে নিয়ে বললেন, "খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে।" তারপর ধীরেসুস্থে জানালেন, রঞ্জন আমাদের জন্য ডাকবাংলোর সামনে খাবারের দোকানে অপেক্ষা করছে।

সুমন ও সাবিত্রীকে নিয়ে রাস্তায় উঠে এলাম। এ রাস্তাটা গঙ্গোত্রী যাবার মূল রাস্তা থেকে নেমে এসেছে। এক পাশে সারি সারি দোকান। আর এক পাশে ধর্মশালা। ধর্মশালার পেছনে গঙ্গা।

রঞ্জন দেখছি তিনজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে একজন আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

সঙ্গে সুমন আর সাবিত্রী রয়েছে। মেয়েরা মেয়েদের দেখলে আলাপ না করে থাকতে পারে না। ভদ্রমহিলা কিন্তু আমার সঙ্গেই প্রথম আলাপ শুরু করলেন, "আপনার এই বন্ধুর উপকারের কথা সারাজীবন মনে থাকবে। আমাকে উনি আজ অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ভগবান আপনাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করুন। গঙ্গোত্রী গেলে আমি পুজো দিতাম আপনাদের নামে।"

স্নানের সময় আমি দেখি নি ভদ্রমহিলাকে। সুমন ও সাবিত্রী যে পরিমাণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, তাতে এ আলোচনা আর চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, "আপনারা গঙ্গোত্রী যাবেন না কেন ?"

"গঙ্গোত্রী যাবার জন্য তো আসি নি। গরমের ছুটিতে হিমালয় দেখতে বেরিয়েছি। জীপে করে উত্তরকাশী এসেছি। ভেবেছিলাম উত্তরকাশী থেকেই ফিরে

যাব। তারপর শুনলাম এ পথে কিছুদূর না হাঁটলে হিমালয়ের আসল রূপ দেখা হয় না। আজ তিন দিন এখানে এসেছি। ডাকবাংলোতে উঠেছি। কাল নামতে শুরু করব। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। মাদ্রাজের একটা কলেজে লেকচারার আমরা তিনজন।"

হিমালয়ের সৌন্দর্য আর মাদ্রাজের কর্মজীবনের মধ্যে দোলা খাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। স্বর্গ আর মর্ত্য। হৃদয় আর অর্থ। অর্থ তাঁকে টেনে নিয়ে যাবে কর্মজীবনে। হৃদয়ের আবেদনকে উপেক্ষা করে ছাত্রীদের সামনে তাঁকে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে হবে, 'Our life is not the one old burden, our path is not the one long journey...'

॥ বত্রিশ ॥

ভুক্কী পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু আর বুঝি পারি না। মাদ্রাজী ভদ্রমহিলারা না এগিয়ে ভালই করেছেন। একে কি রাস্তা বলব? জিলিপির মত এঁকেবেঁকে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে পিলারের কাজ চালিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটা ঝুলন্ত কাঠের পুল। এক সঙ্গে বেশী ওজন সইতে পারে না, তাই পুলের মুখে সাইন বোর্ড—'দুটো ঘোড়া অথবা পাঁচটা মানুষ অথবা দশটা ভেড়া।' যাক, জ্ঞান বাড়লো একটা মানুষ দুটো ভেড়ার সমান।

অতি সন্তর্পণে দড়ির রেলিং ধরে ওপারে যেতে হবে। মনে পড়ছে এই গঙ্গার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা হাওড়া পুলের কথা।

একজন পাহাড়ী একটি ভেড়াকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে পুলের মুখে। ভেড়া কিছুতেই এগোতে রাজী হচ্ছে না। গঙ্গাকে ভয় করছে কি পুলকে ভয় করছে, বলতে পারব না। তবে উভয়েই ভয়াবহ।

ভয় আমরাও পেয়েছি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করল শুধু সুমন, "আমার ভয় করছে!"

"তোমার পূর্বপুরুষরা অশ্বপৃষ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। আর তুমি কিনা..."

আমাকে শেষ করতে দেয় না সুমন, "আমার পূর্বপুরুষ যা-ই করে থাকুন, আপনি যে বিপিন পালের দেশের লোক তা বেশ বুঝতে পারছি। কী বক্তৃতাই দিতে পারেন! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেউ না ধরলে আমি এ পুল পেরুতে পারব না।"

অতএব সুমনের একখানি হাত ধরতে হয়।

এপারের রাস্তা আরও ভয়াবহ। মাঝে মাঝে ধস নেমে মূল রাস্তা অদৃশ্য। আগের যাত্রীদের পায়ের দাগের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগোতে হচ্ছে। সকলেই দু-চারবার করে আছাড় খেয়েছি। দাদার অবস্থা খুবই সঙিন। সুবিশাল দেহটিকে টেনে নিয়ে যেতে ভদ্রলোককে রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছে। সকলেরই পা ফসকাচ্ছে। আমরা কোন রকমে সামলে নিতে পারছি, দাদা পারছেন না। কিন্তু ভদ্রলোক বেপরোয়া, টেনে তোলা মাত্র আবার চলতে শুরু করেছেন। যেন কিছুই হয় নি। আমাদের সারাশরীর ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে। তবে গরম লাগছে না। অনেক ওপরে উঠে এসেছি। আর মাইল দেড়েক পরেই গঙ্গানী। গঙ্গানীর উচ্চতা ছ হাজার দু-শ আশি ফুট।

একটা পাহাড়ী নদী পেরিয়ে আসতে হল। পারাপারের সেতুটি প্রায় নিশ্চিহ্ন। শুধু একদিকে একটা খুঁটি রয়েছে এখনও। তার ওপরে আড়াআড়ি ভাবে একখানা তক্তা ঝুলছে। পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নদী পেরোতে হল। মুচ্‌রার কোন পাত্তা পাচ্ছি না। পেছিয়ে পড়েছে। ক্যামেরা আর বায়নোকুলারকেই আমাদের ভারী মনে হচ্ছে, আর ওর কাঁধে প্রায় এক মণ বোঝা। কিন্তু তারিফ করতে হয় দাদার মুটেকে। ঐ পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে ঠিক আমাদের পেছনে চলছে। এখনও ঘণ্টা দেড়েক বেলা আছে। গঙ্গানী যেতে আর আধ ঘণ্টার বেশী লাগার কথা নয়। সুমন কাতর কণ্ঠে বলে, "একটু বসব ?"

"এখন বসলেই শরীর এলিয়ে পড়বে। তার চেয়ে আর একটু কষ্ট করে চলো। গঙ্গানী পৌঁছে একেবারে বিশ্রাম করব।"

সুমনের কথাই কিন্তু রইল। একটু বাদেই থামতে হল। কয়েকজন যাত্রী বসে-ছিলেন রাস্তার ওপরে। তাঁরা জানালেন, একটু ওপরে উঠে গেলেই ঋষিকুণ্ড। সেখানে স্নান করে শরীরের ব্যথা দূর হয়েছে তাঁদের। আমাদেরও স্নান করে নেওয়া উচিত। সুমনের চোখ দুটি আনন্দে জল্‌জল্‌ করে উঠল। বসলাম আমরা।

দুটি কুণ্ড আছে এখানে। ব্যাস ও বশিষ্ঠ। যৌথভাবে বলা হয় ঋষিকুণ্ড। কুণ্ডের জলে গা ডুবিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তার পর উঠে এলাম একে একে। বেশ ঝরঝরে লাগছে। সঙ্গের শুকনো খাবার শেষ করে ফেলি। ওয়াটার-বট্‌লের জলও ফুরিয়ে গেল। পুলের ওপারে গঙ্গানী ধর্মশালা। এখান থেকে দু-একটা আপেল-বাগান চোখে পড়ছে। সাবিত্রী নাকি বায়নোকুলার দিয়ে পাকা আপেলও দেখে নিয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজি করেও চৌকিদারের টিকি দেখতে পেলাম না। লোকটা

গেল কোথায় ? আরও অনেকে খুঁজছেন তাকে। সারা ধর্মশালা চরকি মেরেও খালি ঘর চোখে পড়ল না। পেলে ঢুকে পড়তাম। পরে চৌকিদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যেত। মেজাজটা বিগড়ে গেল।

"কি ? ঘর পান নি তো ?"

তাকিয়ে দেখি সেই আদিবাসী মেয়েটি।

"হ্যাঁ। চৌকিদারকেও খুঁজে পাচ্ছি না।"

"চৌকিদার গা-ঢাকা দিয়েছে প্রাণের দায়ে। ঘর খালি নেই।"

"তবে তো মহা মুশকিল হল। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন।"

"রানীমাকে একবার বলুন না। মেয়েরা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে। আপনারা একটা দোকানে কোন রকমে কাটিয়ে দেবেন আজকের রাতটা।"

"কিন্তু রানীমা রাজী হবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই। প্রতি রাতেই আমরা এরকম দু-একজনকে জায়গা দিই।"

মেয়েটির কথায় ভরসা পাই। কিন্তু সংকোচ কাটে না। আমাকে দ্বিধা করতে দেখে বলে, "আচ্ছা লাজুক লোক আপনি ! আসুন আমার সঙ্গে।"

অগত্যা মেয়েটির সঙ্গে রানীমার সামনে এসে দাঁড়াই। হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকে একটি মেয়েকে ওষুধ দিচ্ছিলেন তিনি। পরনে লালপাড়ের গরদ। সীমন্তে সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখা। মাথার কাপড় খসে পড়েছে। মাটি-ছোঁয়া চুলের রাশি যে কোন মেয়ের ঈর্ষার বস্তু। হাতের দিকে তাকিয়ে রাণী বলে মনে হয় না। শাঁখা ও দুগাছি বালা। গলায় একছড়া হার। কান দুটো খালি। প্রতিমার মত টানা-টানা চোখ দুটির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে জ্বলজ্বল্ করছে বাঁ হাতের অনামিকার আংটির পাথরখানা। স্বর্গের নিরাভরণা জ্যোতির্ময়ী অপ্সরী, মর্ত্যের বধূবেশে বসে আছেন গঙ্গানী ধর্মশালার আধো অন্ধকার ঘরে। রাজ্যের মঙ্গল কামনায় মহারানী পুজো দিতে চলেছেন গঙ্গোত্রীর পবিত্র মন্দিরে।

"কি খবর ঝুমরু ?" আদিবাসী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন রানীমা।

"এঁরা ঘর পান নি। সঙ্গে দুটি মেয়ে আছে। বলছিলেন যদি আজকের রাতটা আমরা একটু জায়গা দিতাম।"

"মেয়ে দুটি কে ?"

কি জবাব দেব ? মাথা নত করে চুপ করে থাকি। ঝুমরু বলে, "একজন এই বাবুজীর স্ত্রী আর একজন…"

"ওঁর বান্ধবী।" আমি যোগ করি।

"নিয়ে এসো তাঁদের।" রানীমা অনুমতি দেন।

যুযুৎসুর চোখের তারা নেচে ওঠে। সে নাচ ছন্দ পেল পদসঞ্চারে। বলে, "চলুন!"

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানো গেল ওদের। যুযুৎসুর সঙ্গে সাবিত্রী ও সুমন চলে গেল। কথা হল নিজেদের একটা ব্যবস্থা করে ওদের ডাকব। একসঙ্গে দোকানে গিয়ে খেয়ে নেব কিছু। অপ্রত্যাশিত ভাবে দাদারও একটা বন্দোবস্ত হল বারান্দার এক কোণে। গতকাল ভাটোয়ারীতে যে রাজস্থানীর সঙ্গে দাদার হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল, সে ডেকে দাদাকে জায়গা দিয়েছে আজ। গলাগলি দেখে মনে হচ্ছে কালকের কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। দাদার মুটেও এসে গেছে। খানচারেক কম্বল নিজে রেখে বাকি চারখানা তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুমনদের। এবারে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমাদের অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। শীত করছে। মুচ্‌রার পাত্তা নেই। আস্তানার চেয়েও কম্বলের প্রয়োজন বেশী হয়ে পড়েছে।

রাস্তায় এসে দাঁড়াই। ভাটোয়ারীর চেয়ে ছোট হলেও জায়গাটা মন্দ নয়। বহু আগে, যখন রাস্তা বলতে কিছু ছিল না, তখন পুণ্যার্থীদের দৌড় ছিল এই পর্যন্ত। এই গঙ্গানীতে বসেই গোমুখীর উদ্দেশ্যে পুজো দিতেন তাঁরা। এখন সে কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রীরা আরও সাড়ে সাতাশ মাইল এগিয়ে যান। ধর্মশালার উল্টো দিকে অনেকগুলো দোকান রয়েছে। খাবার ছাড়াও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান আছে দু-একটা। ধর্মশালার পেছনে গঙ্গা। রাস্তায় দাঁড়িয়েও গর্জন শুনতে পাচ্ছি। দেকোনগুলোর পেছনে পাহাড়। তা হলেও এই জায়গাটুকু সমতল। সবশেষে সরকারী প্রাইমারী স্কুল।

একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মুচ্‌রা এই রাস্তা দিয়েই আসবে।

দোকানদার স্থানীয় লোক। বয়স বছর তিরিশ। মুখ দেখে যদিও কম বলে মনে হয়। আমাদের দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। বেঞ্চিটা ঝেড়ে দিয়ে বসতে বলল আমাদের। কিছু কেনা উচিত ওর দোকান থেকে। কিন্তু কেনার মত কোন জিনিসই চোখে পড়ছে না। বেশীক্ষণ ভাবতে হল না, তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ঘাগরা-পরা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দোকানে ঢুকল। দোকানীর কাছে গিয়ে নাকিসুরে কি যেন আবদার করল। দোকানী কর্কশ কণ্ঠে বলল, "রোজ রোজ দিতে পারব না। যা, ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর্।"

"চারা লাগানো হয়ে গেছে সব।" মেয়েটি চোখ ডলতে ডলতে জবাব দেয়। আপেল-রাঙা গাল দুটি চোখের জলে চিক্‌চিক্ করছে। বলে, "তুমি বলেছিলে আজকের মধ্যে সব চারা লাগাতে পারলে দেবে।"

"নেই, যা।"

"আছে—ঐ চাটাইয়ের নীচে।"

দোকানী রেগে যায়, "দেব না, ভাগ্। রোজ রোজ এই আবদার ভাল লাগে না।"

মেয়েটি ততক্ষণে গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, "কি চায় ও?"

"আর বলেন কেন? পয়সা দিতে হবে?"

"কি করবে পয়সা দিয়ে?" প্রশ্ন করি।

"কি করবে আবার? চুড়ি কিনবে! আজকাল হয়েছেও যেমন। চুড়িওয়ালা-গুলো উত্তরকাশী থেকে এই পর্যন্ত ধাওয়া করতে শুরু করেছে। লাভের মধ্যে আজ কিনবে কাল ভাঙবে।"

"কত চাচ্ছে?"

"তা কম নয়। দু আনা না হলে চলবে না।" তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় দোকানী। তার পর মেয়েটিকে ধমক লাগায়, "আর কাঁদতে হবে না। ক্ষেতে জল দিয়ে বাড়ি যা।"

"ক্ষেতে জল দেওয়া হয়ে গেছে। পয়সা না দিলে বাড়ি যাব না। কথাও বলব না তোমার সঙ্গে। কাচের চুড়ি ভেঙে যায়, আমি কি ইচ্ছে করে ভাঙি? মনিয়ার সঙ্গে মারামারি লাগলে ভেঙে যায়। তাই তো বলি আমাকে একজোড়া রুপোর চুড়ি কিনে দাও, না হয় পেতলের। ও লোকটার কাছে পেতলের চুড়িও আছে। আট আনা করে দাম।"

এবারে যেন লজ্জা পেল দোকানদার। সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। মেয়েটিকে ডাকি। বলি, "চুড়িওয়ালার কাছে রুপোর চুড়ি আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত দাম?"

"দু টাকা।" রুদ্ধশ্বাসে জবাব দেয় মেয়েটি।

রঞ্জন মানিব্যাগ বের করে। এবারে দোকানীর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। চাটাইয়ের তলা থেকে একটি দু-আনি বের করে মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দেয়, "এই নে। আর কোন দিন দোকানে এসে ঝামেলা করবি না।"

"একশ বার করব। চুড়ির পয়সা না দিলেই করব।"

"এই তো দিলাম। সন্ধি করতে চায় দোকানী। মেয়েটি কিন্তু দু আনির দিকে এগোয় না। রঞ্জন ততক্ষণে দুটো টাকা বের করে মেয়েটাকে কাছে ডেকেছে।

দোকানী নির্দেশ দেয়, "নিবি না শেঠজীর টাকা!" তারপর মিনতি জানায় রঞ্জনকে, "দেবেন না ওকে।"

আমি বলি, "ছোট মেয়ে। শখ হয়েছে। তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?" দোকানী উত্তর দিতে পারে না। রঞ্জন উঠে গিয়ে মেয়েটির হাতে টাকা দুটো গুঁজে দেয়। সবার দিকে একবার তাকিয়ে, কেউ কিছু বলার আগে যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবে ছুটে চলে যায় সে। দোকানী শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

দোকানীকে সান্ত্বনা দিই, "তুমি কিছু মনে করো না ভাই। এতে তোমার লজ্জার কিছু নেই।"

"না, কি আর মনে করব শেঠজী। বোঝে না—আবদার করে।"

"মেয়েটি কে? তোমার বোন বুঝি?" রঞ্জন প্রশ্ন করে।

দোকানীর সারামুখে কেউ যেন আবীর মাখিয়ে দিল। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, "না। আমার জেনানা।"

"শেঠজী! মাঈজী আপনাকে ডাকছেন।"

সাবিত্রীদের কুলির কথায় ফিরে তাকাতে হয়। সুমন ও সাবিত্রী দুজনেই ওর মাইজী। তা হলেও ডেকে যখন পাঠিয়েছে তখন মনে হয় সুমনকেই বোঝাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, "কোথায়?"

"ঐ তো দাঁড়িয়ে আছেন।"

সামনে যেতেই জ্বলে উঠল সুমন, "কি বলেছেন ঝুমরুকে?" ওর কণ্ঠস্বরটা গর্জনের মত শোনাচ্ছে। কৈফিয়তের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে রানীমার সামনে চুপ করে ছিলাম। ফলে ঝুমরু ভেবে নিয়েছে তার অনুমান সত্যি। তা হলেও এমন কি ঘটতে পারে যার জন্য সুমনকে এভাবে ছুটে আসতে হল? আমার ফিরে যাবার পর্যন্ত তর সইল না?"

"কি, চুপ করে আছেন কেন? কেন বলেছেন ওসব কথা?"

"আমি তো ঝুমরুকে তেমন কিছু বলি নি সুমন!"

"তা হলে কেন ওরা এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছে?"

"কি কথা?"

যেন আগুনে ঘি পড়ল, "আমার মুখ থেকে আর একবার না শুনতে পারলে ভাল লাগছে না, না? জানেন না আপনি কি বলেছেন? কিন্তু যা ভেবেছেন তা অসম্ভব।"

"অসম্ভব বলে কিছু নেই এ সংসারে। জীবনের দুর্গমতম পথের সহযাত্রী আমরা। বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছি পরস্পরকে। অন্তরের বোঝাপড়াটা ঠিক

থাকলে বাইরের কথায় কিছু এসে যায় না।"

"ছিঃ ছিঃ! আপনার মনে এত পাপ? আপনার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে আমার।" একবার থামে সুমন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে সে। শত চেষ্টা করলেও এখন ওকে শান্ত করতে পারব না। তা ছাড়া মিথ্যে বলে শান্ত করে লাভ কি? চুপ করে থাকি।

সুমন ডাক দেয়, "শুনুন!"

সুমনের দিকে তাকাই। ওর দু'চোখে আগুন। সে উত্তাপে ঝলসে দিতে চাইছে আমাকে। বলে, "পুণা থেকে কলকাতা প্রায় দেড় হাজার মাইল—এই দূরত্বকে কমাতে চাইলে ভুল করবেন।"

॥ তেত্রিশ ॥

বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া শেষ কথাটা ঘুমের মধ্যেই নিজের কানে পৌঁছেছিল, 'মাইল মেপে প্রীতির পরিমাপ করা যায় না।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জনের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি বিড়-বিড় করছ?"

"কিছু না।"

রঞ্জন পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে। অন্ধকার ঘর। আস্তে আস্তে মনে পড়ল সব। উঠে বসি বিছানার ওপরে। এ কি! কম্বল এল কোথা থেকে? তাই এত আরামে ঘুমিয়েছি! স্বপ্ন-দেখা-ঘুমে হয়েছিলাম বিভোর। মুচ্‌রা এসে গেছে তা হলে? ঘড়িটা দেখি। চারটে বাজে। এবার বেরিয়ে পড়তে হয়। সবার আগে নিঃশব্দে গঙ্গানী ছাড়তে হবে। রঞ্জনকে ডাক দিই। ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, "কি? কি হল আবার?"

"চারটে বাজে। বেরিয়ে পড়তে হবে। মুচ্‌রা কোথায়?"

"মুচ্‌রা? তুমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছ?"

"স্বপ্ন দেখব কেন? মুচ্‌রা না এলে কম্বল এল কোত্থেকে?"

"আছে বন্ধু। দেবার জন আছে। বেচারা নিজে বোধ হয় কষ্ট পেয়েছে সারারাত।"

"তুমি আনলে কেন?"

"সুমন তোমাকে দিল আর আমি নেব না! তারপর তোমার নিমোনিয়া হলে

তাকে কি কৈফিয়ৎ দেব? শেষরাতে ঘুম থেকে টেনে তুলে কি-সব প্রলাপ শুরু করেছ? ঘুমিয়ে পড়।" রঞ্জন শুয়ে পড়ে।

"ও কি, আবার শুয়ে পড়লে কেন? বললাম যে বেরিয়ে পড়ব এবারে!"

"আমি রাজী আছি। কিন্তু এই রাতে রানীমার মহল থেকে ওদের বের করে আনতে পারব না। তাছাড়া ঘোঁঘুমের সময় দাদাকে টেনে তুলতে হলে হাতীর দরকার। সে খেয়াল আছে?"

"কাউকে টানাহেঁচড়া করতে হবে না। শুধু ওদের কম্বলগুলো রেখে আসতে হবে দাদার কাছে।"

লাফ দিয়ে উঠে বসে রঞ্জন, "এ কি বার্তা শুনি আজি···"

"ওদের সঙ্গে চলব বলে তো আমরা পথে বার হই নি। পথের পরিচয়কে বেশী দিন আঁকড়ে থাকতে চাইলে দুঃখের বোঝা বাড়ে।"

"কিন্তু সেটা যে খুব অন্যায় হবে—অভদ্রতা হবে।"

"ন্যায় আর ভদ্রতার প্রতি তোমার যদি এত মায়া, তা হলে তুমি ওদের সঙ্গে এস। আমি চললাম।" উঠে দাঁড়াই।

রঞ্জনও উঠে বসে। বলে, "ঝাঁপটা খোল। আকাশটি দেখি। তালাটা বের কর। দোকানদারের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় চাবিটা গুঁজে রাখতে হবে। ভাগ্যিস লোকটি জায়গা দিয়েছিল!"

অতীতকে বিলিয়ে দিতে হবে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। বর্তমানকে সম্বল করে এগিয়ে চলেছি। লোহারীনাগে এসে থামলাম। এই চার মাইলে গঙ্গানী থেকে মাত্র সাতশ ফুট ওপরে উঠে এসেছি। তবু ঘাম ঝরছে। চড়াইটা পেরিয়ে এসেছি খুব তাড়াতাড়ি। কালিকমলী ধর্মশালার সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে নিলাম। গতরাতে কিছু খাই নি শুনে দোকানদার কয়েকখানা রুটি বানিয়ে দিল। পয়সা নিতে চাচ্ছিল না, জোর করে আট আনা পয়সা দিলাম। গঙ্গা ও সোনগঙ্গার মিলিত গর্জন শুনতে শুনতে লোহারীনাগ পেরিয়ে এলাম।

সুখী যখন পৌঁছলাম তখন বারোটা বেজে গেছে। রঞ্জন সুখী ছাড়তে রাজী নয়। সব যাত্রীরাই গঙ্গানী থেকে এই ন মাইল হেঁটে এখানে এসে থামে। শরীরের যা হাল হয়েছে তাতে আমাদেরও থামা উচিত। তা হলেও থামব না। এখানে থামলে দেখা হয়ে যাবে সুমনদের সঙ্গে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার হাঁটতে শুরু করেছি। মুচ্‌রার জন্য চিন্তা হচ্ছে। আজও আমাদের ধরতে পারে কিনা সন্দেহ। একদিনে এতটা পথ হাঁটতে পারবে

কি? না পারলে মহা বিপদে পড়তে হবে। পথে মাঝে মাঝে বরফ পেরোতে হচ্ছে। কাল তবু যা হোক কম্বল যোগাড় হয়েছিল।

মাইল খানেক চড়াই ভেঙে তার পর একটানা নীচে নামছি। মাঝে মাঝে ধস পেরোতে হচ্ছে। গঙ্গানী থেকে গঙ্গা আমাদের ডাইনে চলেছে। কখনও দেখছি, কখনও শুধু শব্দ শুনছি। একটা বিরাট ধসের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সামনের পাহাড়টার অর্ধেকটা বোধ করি ধসে গেছে। তবে কি এই সেই ধস, যার ফলে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে? তিন দিন আগেও যেখান দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেত, আমরা সেখান দিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি।

দু-একটা ফলের বাগান চোখে পড়ছে। তা হলে তো ঝালা এসে গেছে। ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে। মনের আবেদনে পা দুখানি বহুক্ষণ থেকেই আর সাড়া দিতে চাইছিল না। এবারে পায়ের আবেদনে সাড়া দেবে মন। বিশ্রাম আসন্ন।

ধর্মশালায় ভিড় নেই বললেই চলে। ভাল একখানা ঘর পেয়েছি। রুটি বানাবার দায়িত্বও নিয়েছে একজন দোকানদার। কিন্তু মুচ্‌রার পাত্তা নেই। পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। গঙ্গানী থেকে এগারো মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করেছি। আর মুচ্‌রা কাল গঙ্গানীতেই পৌঁছতে পারে নি। পারলেও এতটা পথ আসতে পারত কিনা সন্দেহ। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। শীতে দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছে। যদিও রঞ্জনের গালাগালি বন্ধ হয় নি। আমার জিদের জন্যই নাকি তাকে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে। রঞ্জন ফতোয়া জারী করেছে—যেমন করে হোক কম্বল যোগাড় করতে হবে। কিন্তু ফতোয়া জারী করা আর কম্বল যোগাড় করা এক জিনিস নয়। যাত্রীদের কাছে-কম্বল চাওয়া আর মরতে বলা একই কথা। কেউই অতিরিক্ত কিছু নিয়ে আসতে পারে না। যা আনে তাতে নিজেদেরই কুলোয় না। অতএব সে গুড়ে বালি।

দোকানদার রুটি দিতে এলে তাকে জানালাম অবস্থাটা। লোকটি অমায়িক। বলল নীচে পাতার মত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে সে। কিন্তু গায়ে দেবার মত তার কিছু নেই। রুটি রেখে চলে গেল দোকানদার। খানিক বাদে একটি বছর ষোল-সতেরোর মেয়ের সঙ্গে কয়েক আঁটি খড় নিয়ে এল।

মেয়েটি দোকানদারের একমাত্র মা-মরা-সন্তান পিগ্‌নী। চঞ্চল দুটি চোখ। দুষ্টুমিভরা হাসি। স্বাস্থ্য-দীপ্ত দেহ।

খড়ের আঁটিগুলো খুলে ফেলে পিগ্‌নী। বিছিয়ে দেয় মেঝেতে। বিছানার সমস্যা তো মিটল। এখন গায়ে দেবার কি করি? দোকানদার কোন সমাধানই করতে পারে না। হঠাৎ কি বলতে গিয়ে থেমে যায় পিগ্‌নী। আমরা ওর দিকে

তাকাই। লজ্জা পেয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকে সে। দোকানদার জিজ্ঞেস করে, "কিরে বেটী, কি বলছিলি ?"

পিগ্‌নী নিরুত্তর। দোকানদার ভরসা দেয়, "লজ্জা কি !"

"আগুন জ্বালালে শেঠজীদের কম্বল ছাড়াও চলতে পারে।"

"ঠিক বলেছিস। এ কথাটা মনে হয় নি এতক্ষণ। কিন্তু সারারাত না ঘুমিয়ে আঁচ দেখবে কে ?"

পিগ্‌নী বলে, "সারারাত আঁচ দেখার দরকার নেই। ঘণ্টা দুই জ্বললেই ঘর গরম হয়ে যাবে। শীত অনেক কম লাগবে।"

মেয়েকে সমর্থন করে দোকানদার। পয়সা নিয়ে কাঠ আনতে বেরিয়ে গেল সে। হঠাৎ পিগ্‌নীর লক্ষ্য পড়ে আমাদের ক্যামেরা ও বায়নোকুলারের দিকে। তৃষিত নয়নে চেয়ে থাকে। রঞ্জন শুধায়, "ছবি তুলবে ?"

জবাব দেয় না। ক্যামেরা হাতে নেয় রঞ্জন। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলে তাকে। কথা শোনে পিগ্‌নী। ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে তিনবার শাটার টেপে রঞ্জন। জড়তা ভেঙেছে পিগ্‌নীর। বায়নোকুলারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি ?"

"দুরবীন।"

বুঝতে পারে না। খাপ খুলে বায়নোকুলার বার করে রঞ্জন। মোটামুটি এ্যাড্‌জাস্ট করে পিগ্‌নীর চোখের সামনে ধরে।

"কি মজা ! অত দূরের পাহাড়টা আমার কোলের কাছে ? আরে ! ঝরণাটা আমার হাতের পাশে ?" বায়নোকুলার নামিয়ে ফেলে সে দূরের একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বলে, "ঐখানে যাবেন শেঠজী ? ওখান থেকে দেখব আমার নানীর বাড়ি দেখা যায় কিনা।"

রাজী হয় রঞ্জন। ক্যামেরা ও বায়নোকুলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা দুজন। আর শীত করছে না রঞ্জনের।

দোকানদার ফিরে এল কাঠ নিয়ে। মেয়ের কথা শুনে হেসে বলে, "পাগলীর পাল্লায় পড়েছেন ও-শেঠজী ! বিরক্ত করে মারবে ওনাকে।"

বাঁচা গেল। আমি ভাবছিলাম দোকানদার অসন্তুষ্ট হবে। আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল দোকানদার। বলে গেল, ফিরে এলে যেন তাড়াতাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিই পিগ্‌নীকে।

আগুনের সামনে বসে আছি একা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দোকানদার আরও দুবার এসে খোঁজ করে গেছে পিগ্‌নীর। উঁচু জায়গাটায় গিয়ে একবার নাকি

খুঁজেও এসেছে ওদের। দ্বিতীয়বারে মনে হল একটু অসন্তুষ্ট হয়েই চলে গেল সে। আমিও লজ্জা পেয়েছি রঞ্জনের এই কাণ্ডকারখানা দেখে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে! পাহাড়ীরা সহজ ও সরল। সমতলবাসীদের বিশ্বাস করে। কিন্তু সে বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তা করতে হল না। ফিরে এল ওরা। কাল সকালে আবার আসবে বলে বিদায় নেয় পিগ্‌নী। আগুনের ধারে না এসে রঞ্জন গিয়ে আশ্রয় নিল শয্যায়—তৃণশয্যা। জিজ্ঞেস করি, "কি হে? শুয়ে পড়লে যে বড়? খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?"

"না, আপেল খেয়ে পেট ভরে গেছে।"

"আপেল কোথায় পেলে আবার?"

"পিগ্‌নী একটা বাগানে নিয়ে গিছল। গাছে উঠে আপেল পেড়ে খাইয়েছে। কয়েকটা নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম তোমার জন্য। কিন্তু দোকানদার গালাগালি করবে বলে আনতে দেয়নি ও। ফেরার সময় স্বামী সজ্জনানন্দের আশ্রম দেখে এলাম।" থামল রঞ্জন। হয়তো ভেবে চলেছে পিগ্‌নীর কথা।

গঙ্গার গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আগুনের আভা ছাড়া আর কোন আলো নেই। আমার মনের আলো নিভে গেছে। সময় দিয়ে কি পরিচিতির পরিমাপ করা চলে? কথা শুনে কি বিচার করা চলে মনকে?...আধো অন্ধকার ঘরে আমরা দুজনে বসে আছি নিঃশব্দে। রঞ্জন সম্ভবত ভাবছে হিমালয়ের কথা। আর আমি...

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। এত রাতে এই শীতে কে এল আবার? দোকানদার নয় তো? আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলতে হয়। এক ঝলক হিমেল হাওয়া হাড়সুদ্ধ নাড়িয়ে দিল। মালপত্র পিঠে নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে একটা লোক। মুচ্‌রা। আমাদের মুচ্‌রা এসেছে। কম্বল পাওয়া গেছে। কি আনন্দ! কোনমতে ভেতরে ঢুকে আগুনের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। রঞ্জনের সাহায্যে ওর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলি। কাঠগুলো নেড়ে দিই। ঝিমিয়ে-পড়া আগুন শিখা মেলে জেগে ওঠে। কাঁপুনি থামছে না মুচ্‌রার। মনে হচ্ছে মাটিতে পড়ে যাবে এক্ষুনি। ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিতে হবে ওকে। ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে অবাক হতে হল। এ যে দেখছি অর্ধেক হয়ে গেছে। মোটে দিনতিনেক ব্যবহার করেছি। সিঙ্গোটে শেষবার যখন বোতলটা দেখেছি, তখন বারো আনারও বেশী ছিল। শ্রীমান মুচ্‌রাই

বোঝা কমিয়েছে তা হলে ! সে যাকগে। অনেকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলাম মুচ্‌রাকে। আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছে। ওর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। রঞ্জনের রুটিটা দিয়ে দিই ওকে। ব্যাগে জেলী আছে। জেলী বের করতে গিয়ে একটা পুঁটলি হাতে ঠেকে। খুলে ফেলি। হালুয়া ও পুরী। মুচ্‌রা তৈরি করে এনেছে। পুঁটলিটা সামনে রাখতেই মুচ্‌রা বলে, "ও আমার নয়। আমি খেয়ে এসেছি। আপনাদের জন্য ছোটি মাইজী বানিয়ে দিয়েছেন।"

ছোটি মাইজী ? সুমন ? সুমন আমার জন্য খাবার পাঠিয়েছে ?

রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, "মাইজী কোথায় ?"

"সুখী ধর্মশালায়।" সন্ধ্যার কিছু আগে আমি সুখীতে আসি। মাইজী বললেন, "আপনারা থামেন নি ওখানে। দোকানে খবর নিয়ে জেনেছেন ঝালাতে থাকবেন আজ রাতে। পুরী ও হালুয়া খাওয়ালেন আমাকে। বললেন, আজ যদি মিলতে পারি আপনাদের সঙ্গে, কাল সকালে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবেন আমাকে। সকাল সাতটার মধ্যেই ওনারা এসে যাবেন এখানে। ছোটি মাইজী আপনাদের দেরি করতে বলেছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, করব বই কি। আবার একসঙ্গে চলা যাবে।" আনন্দিত হয়ে ওঠে রঞ্জন, "তাছাড়া পিগ্‌নীকেও কথা দিয়েছি, তার সঙ্গে দেখা না করে ঝালা ছাড়ব না। ওর নাকি আবার ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়।"

॥ চৌত্রিশ ॥

ঝালা থেকে মাত্র দেড় মাইল হেঁটেছি। কিন্তু মার্কণ্ডতে না থেমে পারলাম না। পথ যদিও খুব খারাপ, তা হলেও এরকম পথ চলতে অভ্যস্ত হয়েছে পা দুটো। এত পরিশ্রম তো হওয়া উচিত নয়। কাল থেকেই শরীরটা যেন দুর্বল মনে হচ্ছে। একটু কাশিও হয়েছে। জ্বর হয়েছে কি ? বুঝতে পারছি না। গা-হাত-পা ব্যথা করছে।

শেষরাতে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কটি সঙ্গে নিয়ে একা একা পথে না বের হলেই ভাল হত। উত্তেজনার বশে শারীরিক অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঘুম থেকে উঠে আমার চিঠি পেলে রঞ্জন মুচ্‌রাকে নিয়ে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি হেঁটে আমাকে ধরে ফেলবে। পিগ্‌নীর সঙ্গে দেখা না করে সে ঝালা ছাড়তে চাইছিল না। অথচ দেরি করলে সুমনরা এসে যেত।

কড়া গরম চা খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এখনও রোদ ওঠে নি।

ঘুমিয়ে আছে সমস্ত অঞ্চল। দু-একজন যাত্রী আর চায়ের দোকানদার ছাড়া কেউ নেই পথে। জায়গাটি মনোরম। শ্যামগঙ্গা এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে এখানে। শীতকালে গঙ্গোত্রীতে থাকা যায় না। শীতের সাত মাস এখানে বসেই গঙ্গাপুজো হয়।

ক্রমে রোদ উঠল। প্রখর না হলেও ঝক্‌ঝকে রোদ। ঝল্‌মল্‌ করছে চারিদিক। মার্কণ্ড থেকে এই দু মাইল পথ আসতে দু ঘণ্টা লেগেছে আমার। এসে গেছি হরশিল বা ভগৌরী। হরিপ্রয়াগ বা গুপ্তপ্রয়াগও বলে। হরশিল একটি সমতল উপত্যকা। উপত্যকার বুক চিরে ধীরে বয়ে চলেছে গঙ্গা। চারিদিকের পাহাড়ে ঘন দেবদারু বন। হরশিল তিব্বতী জাড়দের বেশ বড় একটা উপনিবেশ। রয়েছে ডাকবাংলো পোস্টাফিস পশুদের কৃত্রিম-প্রজননকেন্দ্র একটা সরকারী বয়ন-শিল্পবিদ্যালয় ও এগ্রিকাল্‌চারাল ফার্ম—আপেলই প্রধান গবেষণার বিষয়। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই পশম-শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সুন্দর সুন্দর কম্বল আর নানা রকমের গরম কাপড় বোনে। আগে তিব্বতের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা চলত। এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। চায়ের দোকানের সামনে এসে বসলাম।

একটা পুল পেরিয়ে এলাম। গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। হরশিলের চায়ের দোকানে বসে সুস্থ বোধ করছিলাম। কিন্তু এইটুকু পথ আসতেই আবার দুর্বল মনে হচ্ছে। পা আর চলতে চাইছে না। যত দূর দৃষ্টি যায় জীবনের কোন স্পন্দন নেই। নিষ্প্রাণ প্রকৃতি। যেমন করেই হোক পৌঁছতে হবে ধরালী। সেখানে লোকজন আছে। জয়পুর মহারাজার প্রাসাদোপম তেতলা ধর্মশালা আছে। ধারিওয়াল বলে এক পাহাড়ী জাতি বাস করে ধরালীতে। শুনেছি নেলাং গিরিদ্বারের মধ্য দিয়ে মানস-সরোবর পর্যন্ত ওরা যায় বাণিজ্য করতে। সেই গিরিদ্বারের কথা সেদিন হ্যাপি বলেছিল উত্তরকাশীতে। সুমনও শুনেছিল সে কথা। আজ সুমন কোথায়? আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেও কি রঞ্জনের সঙ্গে ছুটে আসছে? তা হলে কেন সেদিন ওসব কথা বলল? আমি কী কোন পাপ করেছি? প্রীতির জগতে তো প্রাদেশিকতার প্রাচীর থাকতে পারে না। তবে কি তীর্থের পথে বন্ধুত্বের স্থান নেই? কিন্তু বন্ধুর লোভেই তো এ বন্ধুর পথেই পা বাড়িয়েছি। মানুষ আছে বলেই তো তীর্থ। ভালবাসা আছে বলেই তো তীর্থ। ভুল করেছে সুমন। হয়তো বুঝতেও পেরেছে তার ভুল। তাই কাল মুচ্‌রাকে পাঠিয়েছিল। বলেছিল ঝালায় অপেক্ষা করতে। ভেবেছিল দেখা হলে বলবে……

শুনেছি এই অঞ্চলে খুব ধস নামে। বিশ বছর আগে একবার একটা প্রকাণ্ড ধস নেমেছিল ধরালীতে। ফলে সেদিনের প্রায় সমস্ত গ্রামটা তলিয়ে গেছে। সেই

দুর্যোগের সাক্ষীস্বরূপ মাটির ওপর জেগে আছে একটি শিবমন্দিরের চূড়া। মন্দিরটি ডুবে রয়েছে মাটির নীচে—মনে করিয়ে দিচ্ছে—'**Fame glory and power, they are but little bubbles of the hour.**'

এ কি, আমি পড়ে যাচ্ছি কেন? অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বলে কি পা-ফসকে গেছে? না ধস নামছে? আমি তলিয়ে যাচ্ছি। নীচে। নীচে। আরও নীচে। সীমাহীন অন্ধকারে। কালো পাতালে।

বাঁশি বাজছে। ঢোল বাজছে। কান্না যেন তালে তালে তালি দিচ্ছে। চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। কেউ কি আমার মাথায় হাওয়া দিচ্ছে? আমি কোথায়? চোখ মেলতে চেষ্টা করি। এত আলো কেন? ঝাপসা দেখছি। আবার চোখ বুজি। কেউ আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, "কেমন লাগছে এখন?" উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি। পরিচিত কণ্ঠস্বর। অতি পরিচিত। চোখ মেলি। তীব্র আলো স্নিগ্ধ হয়েছে। প্রখরতা পেয়েছে হ্রাস। আর কষ্ট হচ্ছে না আগের মত। ঝাপসা ভাব কেটে যাচ্ছে। পৃথিবী তার রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে আমার সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। কাঠের একখানি ছোট ঘর। পরিচিতি কণ্ঠ আবার প্রশ্ন করে, "একটু ভাল লাগছে এখন?"

বাঁশির শব্দ মিলিয়ে গেল। জেগে রইল একটি প্রশ্ন। প্রশ্ন নয়, এ যেন সুরের পরশ। মুখ তুলে তাকাই। আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে সে। দৃষ্টি ফিরে এসেছে আমার। সুমন। হারিয়ে যাওয়া সুমনকে খুঁজে পেয়েছি। মনে পড়ছে সব। গঙ্গানী···ঝালা···মুচ্‌রা···ধরালী···ধস······

কান্নাজড়ানো কণ্ঠে আবার বলে সুমন, "কথা বলছ না কেন? আমি যে সেই দুপুর থেকে বসে আছি তোমার শিয়রে—তোমার কথা শুনতে। বলো—কথা বলো।"

বলতে চাই। পারি না। আমি কি বোবা হয়ে গেছি? না কান্না আমার গলা টিপে ধরেছে? কান্না? কাঁদব কেন? সুমনকে ফিরে পেয়েছি। এ যে আমার আনন্দের লগ্ন। পিপাসা। ঘরের কোণে রাখা পাথরের জালাটা দেখিয়ে দিই।

"জল?"

সম্মতি জানাই। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে জালার ধারে এগিয়ে যায় সে। একটা পাথরের বাটিতে জল এনে আমার গলায় ঢেলে দেয়। আঃ, প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

"আর দেবো?"

"না।"

"কথা বলেছ, তার মানে সেরে গেছ। তোমায় ভাল করে তুলতে পেরেছি আমি।"

আনন্দবিহ্বল সুমনের চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে আমার বুক। নীরব কিছুক্ষণ। তার পর সুমন আবার বলে, "আমি যে তোমায় মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। বলো আমায় ক্ষমা করেছ।"

"ক্ষমা চাইবার মত কিছু তুমি কর নি সুমন। ভুল হয়েছে আমার—তোমার ভুল ভেঙে দিই নি।"

নিরুত্তর সুমন। কতক্ষণ কেটে গেছে হিসেব করি নি। ঘড়ির হিসেবে তো অনেক সময়েই সময়ের হিসেব করা যায় না। বাইরে বেজে চলেছে বাঁশি। এদেশের বাঁশি। শব্দটা যেন অনেকটা সানাইয়ের মত।

"ও কিসের বাজনা সুমন?"

ঠিক হয়ে বসে সে। চোখ মুছে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। বলে, "বিয়ের।"

"কার?"

"বাকুলার মেয়ের।"

"বাকুলা?"

"এই বাড়ি যাঁর।"

"এখানে এলাম কি করে?"

"পা-ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন নীচে। ভাগ্যিস জায়গাটায় খাদ ছিল না। ঠিক তখন ঐ পথ দিয়ে হরশিল ফিরছিলেন বাকুলা।"

"কোথায় গিয়েছিলেন তিনি?"

"ধরালী। মেয়ের বর আনতে। তিব্বতী হলেও তিনপুরুষ ধরে এখানে আছেন। বর কিন্তু জাতিতে ধারিওয়াল। সবাই মিলে আপনাকে বয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে। কবিরাজ ডেকেছেন।"

"কবিরাজ কি বললেন?"

"জ্বর হয়তো কাল ছেড়ে যাবে। তবে দিন-তিনেক বিশ্রাম করতে হবে আপনাকে।"

"তোমরা কবে রওনা হতে চাও?"

"কাল।"

"বিশ্বাস করি না।"

"কেন?"

"মানে ?"

"আমাকে এভাবে রেখে তুমি রওনা হতে পার না ।"

সুমন নির্বাক । প্রসঙ্গের পরিবর্তন করতে চাই । বলি, "ওরা সবাই কোথায় ?"

"এতক্ষণ এখানেই ছিল । এখন একটু গেছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে । সাবিত্রী পুজো দেবে আপনার নামে । ফেরার পথে কাঠ-কাটা দেখে আসবে । পাইন গাছ চেরাই করে নদীতে ভাসিয়ে দেয় এখানে । গঙ্গা বুকে করে নিয়ে যায় সে কাঠ । ওদের লোক আছে হরিদ্বারে ।" থামে সুমন । খেয়াল হয় আমাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে । কাঠের দেয়ালের সঙ্গে ঝোলানো তাকের ওপর থেকে একটা পাথরের বাটি নিয়ে আসে । উগ্র আরক জাতীয় কিছু খাইয়ে দেয় আমাকে । বাটিটা রেখে আবার আমার পাশে এসে বসে ।

বাজনাটা যেন এগিয়ে আসছে । ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন একজন প্রবীণ তিব্বতী । আমাকে নমস্কার করে বলেন, "এই তো জ্ঞান ফিরেছে । ভগবান তথাগতকে কত ডেকেছি ।" ওপরের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানান বাকুলা, "আনন্দের দিনে দুঃখ দিতে চান নি । আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন তিনি ।" বৃদ্ধ আবার দোরগোড়ায় এগিয়ে যান । কাদের যেন ডাক দেন, "তোরা একবার এদিকে আয় । মহারাজের জ্ঞান ফিরেছে । তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যা ।"

চওড়া কলারওয়ালা বহুবর্ণের প্রিন্স-কোট পরে ঘরে ঢোকে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ সুশ্রী একজন যুবক । পেছনে স্বাস্থ্যময়ী একটি তিব্বতী তরুণী । বাকুলার মেয়ে ! পোশাকটি বিচিত্র । মাথায় একটুকরো রঙীন কাপড় বাঁধা । গলায় ফাঁস দিয়ে আঁটা বহু রঙের এক প্রকাণ্ড জামা । অনেকটা আলখাল্লার মত । কিন্তু গায়ের সঙ্গে লেগে নেই । ফুলে ফুলে রয়েছে । ওদের চোখে মুখে আনন্দ । ছেলেটি খুঁজে পেয়েছে তার সঙ্গিনী । মেয়েটি পেয়েছে তার জীবনের অবলম্বন । বিয়ে কোন্ ধর্মমতে হয়েছে জানি না । তবে ধর্মের দিক থেকে আলাদা ওরা । একজন হিন্দু, আর একজন বৌদ্ধ । একজন ভারতীয় যুবকের জীবনসঙ্গিনী হল একটি তিব্বতী মেয়ে । এ মিলন ভারতের সঙ্গে তিব্বতের । ভীতির নয় প্রীতির মিলন ।

বাকুলার পূর্বপুরুষ প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এদেশে । ভারত তাঁদের বাঁচার অধিকার দিয়েছে । সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে । ভারত চিরকাল বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিয়েছে প্রতিবেশীদের—আফগানিস্থান নেপাল তিব্বত চীন ব্রহ্মদেশ ও সিংহলকে । হরশিল ভারত সীমান্তের একটি বড় গ্রাম । অধিবাসীরা

অধিকাংশই তিব্বতী। মনে হয় তিব্বতে এসেছি। নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ তাদের আর সংস্কৃতি নিয়ে পুরুষানুক্রমে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে ওরা।

বর-কনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করে আমাকে। হাত জোড় করে প্রতি-নমস্কার করি। সুমন এগিয়ে যায় কনের কাছে। গলা থেকে খুলে নেয় সোনার হারছড়া। কেউ কিছু বোঝার আগেই মেয়েটিকে দেয় পরিয়ে। বাকুলা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুমন তাকে ইশারা করে চুপ করে থাকতে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়। তারপর ওরা সবাই বেরিয়ে যায়।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সুমন। হয়তো ভাবছে, এমন লগ্নটি তার জীবনে কবে আসবে? কিংবা—

। পঁয়ত্রিশ ।

যাক্ আজ ধরালীতে পৌঁছতে পেরেছি। সেদিন খেয়াল করি নি, এখন বুঝতে পারছি হরশিল এত জনবহুল কেন। হরশিল শুধু সমতল নয়, একটি উর্বর উপত্যকা। সমতলভূমির ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে বইছে গঙ্গা যেন। বাংলাদেশের নদী, বাংলাদেশের মাটি। মানুষগুলো কিন্তু বাঙালীর মত নয়। বেশ ফর্সা ও স্বাস্থ্যবান।

কয়েকটি ঝরনা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। অধিকাংশই ছোট। হেঁটে পেরোনো যায়। বড়গুলোর ওপরে কাঠের পুল আছে। চারটে পুল পেরিয়ে আমরা লোকালয়ের বাইরে এসেছি। বেলেমাটির বিশাল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। ছাগল ভেড়া চরছে। কয়েকটা গরুও দেখেছি—দাঁড়িয়ে দেখেছি। অনেক দিন গরু দেখি নি। প্রান্তরের প্রান্তে গঙ্গা। ওপারে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। ডাইনেও পাহাড়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের পথ। সেই পথ ধরে ধরালী পৌঁচেছি।

ধরালীতে চায়ের দোকানে বসে আছি। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বাধা পেলাম রঞ্জনের গর্জনে, "ওসব চালবাজি রেখে দাও। আমরা পাণ্ডা নেব না, যাও।"

"জরুর নিতে হবে। পুরুষানুক্রমে আমরা গঙ্গামায়ের পুজো করে আসছি। আমাকে না নিলে তিনি আপনার পুজো গ্রহণ করবেন না। যাত্রা বিফল হবে।"

"মস্ত আমার পূজারী এসেছে রে! এটা কি লুটেরার এলাকা পেয়েছ? নেব না পাণ্ডা, ভাগো।" রঞ্জনের গর্জনকে জোরদার করতে হেঁকে ওঠেন দাদা। দাদার

চেহারা আর কণ্ঠস্বরে পাণ্ডাজী প্রমাদ গনে। লোকটিকে কাছে ডাকি। বলি, "আমাদের যজমান করতে এসেছেন? ঝগড়া করে কি সুবিধা হবে? পুজো আমরা দেব। তবে ভেবেছি গঙ্গোত্রী গিয়েই পাণ্ডা ঠিক করব।"

"আমরা, গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা, সবাই নদীর ওপারে মুখীমঠে থাকি।" লোকটির কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ মোলায়েম হয়, "এখান থেকেই যাত্রীরা পাণ্ডা ঠিক করেন। গঙ্গোত্রীতে যাদের পাবেন তারা সকলেই যাত্রী নিয়ে গেছে। তারা দু-বার করে প্রণামী পাবে, আর আমরা যারা এই শীতের রাজ্যে আপনাদের পথ চেয়ে বসে আছি..." একবার থামে লোকটি। তার পর করুণ কণ্ঠে বলে, "আজ আঠারো দিন আমি কোন যাত্রী পাই নি।"

কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল ওরা? শবরীর মত আমাদের প্রতীক্ষায় বসে থাকে ওরা। এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই পুজো দিতে হবে। বলি, "ঠিক আছে, আপনিই আমাদের পুজো দেবেন। কাল বিকেলে গঙ্গোত্রীতে দেখা করবেন।"

দুটি টাকা অগ্রিম নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল লোকটি। দাদা মুখ ভার করেছেন। ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমার ওপর। রঞ্জন শেষ পর্যন্ত বলেই বসল, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ওমনি টাকা দিলে লোকটাকে! জানো এসব লোককে প্রশ্রয় দেওয়া মানে কি?"

"জানি, আমার দেশের একজন দুঃস্থ বৃদ্ধের অন্নের সংস্থান করা।"

বোধ হয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল রঞ্জন, কিন্তু পেরে উঠল না। "Good morning, ladies and gentlemen!" খাকী পোশাক পরা একজন শিখ আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন।

"Morning! Take your seat please!" রুমাল দিয়ে পাশের পাথরখানা ঝেড়ে দেয় রঞ্জন।

ধরালী ভারত সীমান্তের শেষ বড় গ্রাম। মিস্টার সিং এখানকার চেকপোস্টের ইন্-চার্জ। বেশ সুখেই নাকি আছেন তিনি। কাজ কম। অবসর প্রচুর। কাজেই যাত্রীদের তদ্বির ও তদারক করাই তাঁর একটা বাড়তি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত নতুন নতুন যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় রোজ। সারা দুনিয়াকে তিনি এখানে বসেই দেখেন।

"আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে বদলী হতে লেখে। কাছাকাছি কোন চেক-পোস্টে যেতে বলে। ধিক্কার দেয় এখানে পড়ে থাকার জন্য। ওরা ভাবে নিজের প্রতি কোন মমতা নেই আমার। বোঝে না যে, জীবনকে ভালবাসি বলেই এখানে আছি। জানে না, 'Life is too slow for those who wait, too swift for

those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love—life is eternity !"

ভৈরবঘাটি এসে পৌঁচেছি। আসার পথে দেখেছি জংলা। আগে একটা চটি ছিল ওখানে। এখন কিছুই নেই। এখানকার বনে একবার আগুন লাগে। ফলে জংলা ও ভৈরবঘাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জংলা চটির আর কোন সংস্থান করা হয় নি। বোধ করি দরকার নেই বলে। ওখানে যাত্রীদের না থামলেও চলে। জংলা পেরিয়েই নেলাং গিরিবর্ত্মের পথ। সত্যি বলতে কি, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দু দিকে দুটি রাস্তা। কিছু লেখা নেই। বাঁদিকটার ওপর ভাগ্যিস কয়েকখানা ডালপালা ফেলা ছিল। পথের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম ও রাস্তায় যাওয়া নিষেধ। ও রাস্তা নেলাং গিরিদ্বারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী গার্তক চলে গেছে। ও-ই সেই পথ, যে পথে যুগ যুগ ধরে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের কৃষ্টি ও বাণিজ্যের আদান-প্রদান হয়ে আসছিল।

আমরা যে পথে এগিয়ে এসেছি, সেও কম মহীয়ান নয়। এই পথে মিশে আছে কুন্তী দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের পদধূলি। অদম্য কৌতূহল ও অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র একদিন এই পথে এসেছিলেন ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে। শত-সহস্র পুণ্যার্থী এই পথে পতিতপাবনী গঙ্গাবারি নিয়ে সেতুবন্ধে গেছেন রামেশ্বর পুজো দিতে।

আমরা বিশ্রাম করেছি জাঠগঙ্গা-সঙ্গমে। একটা ঝরণা আছে কাছেই। কিন্তু তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে জব্দ হয়েছি। স্বাদহীন জল। মুখে দেওয়া যায় না। বিরক্ত হয়ে জাঠগঙ্গা-সঙ্গম পরিত্যাগ করেছি। পেরিয়ে এসেছি একটা লোহার পুল। নীচে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা জাঠগঙ্গা। ভেবে অবাক হয়েছি। ঐ লোহা-লক্কড়-গুলো এখানে বয়ে আনল কেমন করে? তাছাড়া আগের কয়েকটি পুল দেখেছি কাঠ ও দড়ি দিয়ে তৈরি। এটা লোহার কেন? পুলের ওপর উঠেই কারণটা বুঝতে পেরেছি। এ রকম আর একটা পুল একটু ওপরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানটির কোন ভৌগোলিক স্থিরতা নেই। প্রকৃতির প্রচণ্ড দুর্যোগ উপেক্ষা করে কাঠের পুল এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। শুধু যাত্রীদের জন্যই নয়, সীমান্তের নিরাপত্তার প্রয়োজনেও এ পুল অপরিহার্য।

ভৈরবঘাটির নতুন ধর্মশালাটি ভারি সুন্দর। জানি না আগেরটা কেমন ছিল। তবে পুড়ে গিয়ে বোধ করি ভালই হয়েছে। আলো-হাওয়া-যুক্ত বেশ বড় বড় ঘর। জল সরবরাহের ব্যবস্থাও অভিনব। অবিশ্যি ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে জল

আনতে উত্তরকাশীতেও দেখেছি। সারা শহরটা পাইপ-বাহিত ঝরণার জলের ওপর নির্ভরশীল। মাধবানন্দজী শুনেছি কড়া নজর রাখেন জলের পাইপের ওপর। কাউকে পাইপে হাত দিতে দেখলে ধমক লাগান। অনেক সময় পুলিসে দেবার ভয় দেখান। তা হলেও উত্তরকাশী শহর। মোটরে মালপত্র আনা যায় সেখানে। কাজেই মাধবানন্দজীর কৃতিত্ব যাই হোক, ভৈরবঘাটির কর্মকর্তাদের চাইতে বিস্ময়কর নয়।

ভৈরবঘাটি একটি চূড়া। এখানে ভৈরবনাথের মন্দির আছে। মন্দিরটি এ অঞ্চলের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় বেশ প্রাচীন। ব্রহ্মার গর্ব খর্ব করতে শিব সৃষ্টি করেন ভৈরবনাথ। ভৈরব মন্দির ভারতেও খুব বেশী নেই। পেশোয়া বাজীরাও নির্মিত কাশীর ভৈরবনাথের মন্দিরই সবচেয়ে বড়। ভৈরবনাথ কাশীর শাসক ও রক্ষক। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে পাপ দমন করাই তাঁর কর্তব্য। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর কাছে ভৈরবনাথের প্রতিষ্ঠারও বোধ করি একই উদ্দেশ্য। যমুনোত্রীর ভৈরবঘাটির চেয়ে অনেক জমজমাট এ ভৈরবঘাটি। গঙ্গোত্রী এখান থেকে সোয়া ছ মাইল বলেই এমনটি মনে হয়েছে। যাত্রীরা সকলেই নিদেনপক্ষে এক বেলা বিশ্রাম করেন এখানে। আর ভৈরবঘাটি থেকে যমুনোত্রী মাত্র দেড় মাইল। যাত্রীরা অনেকেই সেখানে থাকেন না।

জায়গা পেতে কোন কষ্ট হয় নি। বেশ বড় একখানা ঘর নিয়েছি। বাকুলার দেওয়া খাবারের সঙ্গে চা খেয়ে নিলাম। প্রচণ্ড শীত। দাদা কম্বলের তলায় অদৃশ্য হয়েছেন। নাসিকা গর্জনে ঘরখানা গমগম করছে। কম্বলটা তালে তালে একবার উঠছে একবার নামছে। সুমন আর সাবিত্রী খিচুড়ি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওভারকোটটা চাপিয়ে সুমনের মাফলারটা মাথায় বেঁধে রঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

বারান্দার এক কোণে দুই বৃদ্ধা বসে আছেন। এঁদের একজনকে যমুনোত্রীতে দেখেছি। এক পাঠান ভদ্রমহিলাকে কাশীরামদাসের মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আজ শ্রোতা ওঁরই সমবয়স্কা একজন বাঙালী বিধবা। ঠিক একই সুরে মহাভারত পড়ে চলেছেন তিনি—

'মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর॥'

অতর্কিতে থামলেন তিনি। প্রশ্ন করলেন শ্রোতাকে, "এই পোলা দুইডারে

কেডা রাইন্দা গ্যায় জানো ?"

মহাভারতের মধ্যে আমাদের কথা ? গতি স্তব্ধ হল। শ্রোতাও দেখছি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আমাদের সম্পর্কে। একই ভাষায় উত্তর দেন, "জাহুম্ না ক্যান্। ঐ যে কালা কালা মাইয়াগুলা—আ-আন—" শেষটুকু সুনিপুণ চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।

জীবনের সায়াহ্নে চলেছেন পুণ্যসঞ্চয় করতে। পুণ্যচিন্তার প্রমাণ স্বরূপ সারাপথে পড়ছেন মহাভারত। আশ্চর্য! গোটা মহাভারত পড়েও পরনিন্দার আকর্ষণমুক্ত হতে পারছেন না ? গঙ্গোত্রীতে এঁরা শান্তি পাবেন কি ?

॥ ছত্রিশ ॥

ধর্মশালার বাইরে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়াই। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরি নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দূরের উঁচু পাহাড়গুলোর বরফাবৃত চূড়ার ওপর সাঁঝের রোদ এখনও মিলিয়ে যায় নি। রঙের খেলা চলেছে। মেঘেরা ওদের মাথায় এসে জড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরের পাহাড়গুলো আস্তে আস্তে নীচু হয়ে আমাদের পাহাড়টার পায়ের কাছে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। দূরের পাহাড়গুলো সাদা ঝকঝকে। কাছের পাহাড়গুলো কালো কুচকুচে। সাদা কাছে এসে কালো হয়েছে। কালো দূরে গিয়ে সাদা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন দিগন্তপ্রসারী ঢেউখেলানো এক মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ের ঢেউ। বরফ আর পাথরের অচঞ্চল ঢেউ।

একটু বাদেই মুচ্‌রা এসে জানায় ছোটি মাইজী জোড় তলব করেছে। ফিরে আসতে হল ঘরে। প্রশ্ন করে সুমন, "আচ্ছা আপনি কী বলুন তো ?"

"কেন, মানুষ ?"

"আমার সন্দেহ আছে।"

"সে কি ? জেনেশুনেও একটা অমানুষকে…"

উচ্চস্বরে রঞ্জন ও সাবিত্রী হেসে ওঠে। ওদের হাসি দেখে সুমন আর গম্ভীর থাকতে পারে না। সেও হেসে ফেলে। বলে, "অসুখ থেকে উঠেছেন। কোথায় একটু সাবধানে থাকবেন, তা নয়। এই বরফ-ছোঁয়া হিমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুধু শুধু। যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন ?"

"খুব ভাল হবে। তুমি তখন খিচুড়ি না খাইয়ে ওষুধ খাওয়াবে।"

"চমৎকার ! আমার হাতে ওষুধ খাবার জন্ত উনি ইচ্ছে করে অসুখে পড়বেন বুদ্ধির বলিহারি !"

"দেখ, বুদ্ধির কথা তুলবে না। মনে আছে উত্তরকাশীতে সেই বিয়ের মিছিলের কথা ? বরের গুণগান করতে গিয়ে বাঈজীরা গাইছিল যে বাঙালীর যত বুদ্ধি তার। আমি কিন্তু সত্যিই বাঙালী।"

"ভগবান ভুল করে আপনাকে বাঙালী করেছেন।" সুমন কিছু বলার আগেই সাবিত্রী ঘোষণা করে।

রঞ্জন সহাস্তে জিজ্ঞেস করে, "কি করা উচিত ছিল ?"

"মারাঠী।" সুমনের দিকে একবার আড়চোখে তাকায় সাবিত্রী, "যদিও ভগবান তাঁর ত্রুটি শুধরে নেবার জন্তই গঙ্গা-যমুনার দেশে পাঠিয়েছেন আপনাকে।"

"সাবি, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" সুমন সাবধান করতে চায়। কিন্তু সাবিত্রী ততক্ষণে রঞ্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। ভয় হচ্ছে দাদা না জেগে ওঠেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছি। ঘরখানাকে যত প্রশংসা করেছিলাম মনে মনে, তত প্রশংসার যোগ্য নয়। বাইরের জানালার একখানা কপাট নেই। সুমনের তত্ত্বাবধানে আমাকে শয্যা নিতে হয়েছে ভেতরের দিকের দেয়ালের গায়ে। খোলা জানালার ধারে দাদা। এপাশে রঞ্জন।

অন্ধকার ঘর। নীরব চারিদিক। ওরা বোধ হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। আমার কিন্তু ঘুম আসছে না। কম্বল মুড়ি দিয়ে কল্পনা করছি গঙ্গোত্রীর রূপ। আগামীকাল এমনি সময় আমরা গঙ্গোত্রীতে।

একটা শব্দ কানে এল। কেউ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। তবে কি চোর ? যমুনোত্রীতে কার্লের যথাসর্বস্ব চুরি গেছে। কিন্তু ঢুকবে কেমন করে ? দরজার পাশেই কুলিরা। তা হলে কি খোলা জানালা দিয়েই ঢুকে পড়েছে ? আবার শব্দ হল। আস্তে আস্তে মাথার ওপর থেকে কম্বল সরাই। সত্যি, জানালার ধারে একটা লোক হাঁটাচলা করছে। লোকটা আমাদের মালপত্র হাতড়াচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ঘুমে অচেতন সকলে। আমি একা। অসুখ থেকে উঠেছি সবে। লাঠিগুলোও চোরটার হাতের কাছে। তবুও কাপুরুষের মত চুপ করে থাকা ঠিক নয়। প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে উঠি, "চোর ! চোর !"

"ভাইয়া, চোর নেহী। হাম্ শ্যামসুন্দর।"

শ্যামসুন্দর! দাদা! ছিঃ ছিঃ! কিন্তু উপায় নেই। ততক্ষণে জেগে উঠেছে সবাই। সুমন টর্চ জ্বালিয়েছে। বিরক্তির সঙ্গে সাবিত্রী দাদাকে জিজ্ঞেস করে, "ঘুমোতে ঘুমোতে আবার উঠে পড়েছ কেন? ওখানে দাঁড়িয়েই বা কি করছিলে এই অন্ধকারে?"

"বরফ।" কৈফিয়ৎ দেন দাদা।

"ঘরের মধ্যে আবার বরফ এল কোত্থেকে?"

দাদা খোলা জানালা দেখিয়ে দেন। পেঁজা তুলোর মত বরফের প্রবাহ মাঝে মাঝে এসে ঢুকছে। দাদার কম্বলখানা সাদা হয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডায় ঘুম ছুটে গিয়েছিল দাদার। শেষে অসহ্য হওয়াতে উঠে পড়েছিলেন জানালাটা ঢেকে দেবার চেষ্টায়! লজ্জা পেলাম সবাই। বয়সে সবচেয়ে বড় তিনি। আর তাঁকেই কিনা বরফের সঙ্গে সংগ্রামরত রেখে আরামে বিশ্রাম করছিলাম আমরা!

জানালাটা ঢাকার উপায় খুঁজতে থাকি। পাথরের দেয়াল। কারও মাথাতেই কোন বুদ্ধি আসছে না। হঠাৎ মুচ্‌রা এগিয়ে এল। ও আবার কি বলতে চায়? বলল না কিছু। গম্ভীর ভাবে চারখানা লাঠি নিয়ে দু-দুখানাকে লম্বালম্বি করে বেঁধে ফেলল। তারপর জানালার দু'ধারে হেলান দিয়ে রাখল। রাতে সরে না যায়, সেজন্য গোড়ায় জড়ো করল আমাদের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র। লাঠি দু'জোড়ার মাথায় একটা দড়ি বেঁধে তাতে ঝুলিয়ে দিল একখানা সতরঞ্চি। জানালা ঢেকে গেল। অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়ে রইলাম মুচ্‌রার মুখের দিকে। নিঃশব্দে সগর্ব হাসি হেসে মুচ্‌রা নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

সুমন মুচ্‌কি হেসে বলে, "বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় বাঙালী কিন্তু গাড়োয়ালীর কাছে হেরে গেলে!"

"হ্যাঁ, ওরই মহারাষ্ট্রে জন্মানো উচিত ছিল। অবিশ্যি তাতে আসে যায় নি কিছু। তুমিই ওর দেশে এসেছ।"

নিজের বিছানায় গিয়ে বসে সুমন।

কৃতজ্ঞ দাদা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন, "থ্রি চিয়ার্স ফর কমরেড মুচ্‌রা!"

রঞ্জনের সঙ্গে আমিও বলে উঠি, "হিপ হিপ হুর্‌রে……"

যার উদ্দেশে এ জয়গান সে কিন্তু অর্থহীন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

আর তরসইছে না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। আঁধার থাকতেই বিছানা গুটিয়েছি—শুধু আমরা নই, সবাই। ভৈরবঘাটি ধর্মশালা যাত্রীহীন হয়ে গেছে এতক্ষণে। আমাদের আগেও রওনা দিয়েছেন অনেকে। অসহ্য শীত। তা হলেও গতকালের মত ক্লান্ত লাগছে না। রাস্তাও অনেক ভাল। দু-এক জায়গা রীতিমত সমতল ও চওড়া। এক দিকে পাহাড়। আর এক দিকে গঙ্গা। রাস্তা থেকে নুড়ি আর পাথরের পার গিয়ে গঙ্গায় ডুবেছে। প্রাণোন্মত্তা গঙ্গা, প্রাণময়ী বসুধারা। ঐ ধারার উৎস দর্শন করব। আনন্দবিহ্বল চিত্তে এগিয়ে চলেছি।

সহসা গঙ্গা অদৃশ্য হল। অথচ শব্দ তীব্রতর হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে রাস্তা থেকে নেমে এলাম। ঢালু জায়গা বেয়ে একটা পাথরের প্রাচীরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হাল্‌কা চকোলেট রঙের মসৃণ পাথরের চওড়া প্রাচীর। একটি নয়, সমান্তরাল দুটি প্রাচীর। উভয়ের দূরত্ব বেশী হলে ফুট-তিরিশেক। মনে হয় দুটি বিরাট চন্দ্রচূড় পাশাপাশি শুয়ে আছে। প্রাচীরের ওপর উঠে দেখতে পেলাম, অনেক নীচে প্রচণ্ড বেগে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ধেয়ে চলেছে জলধারা। হিন্দুস্থানের পুণ্যপ্রবাহ গঙ্গা। এই তিরিশ ফুট প্রশস্ত জলধারা পনেরশ সাতান্ন মাইল দূরে সাগরসঙ্গমে গিয়ে কয়েক মাইল চওড়া হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য ঐ পাথরের প্রাচীর দুটি। মনে হচ্ছে একখানা প্রকাণ্ড পাথরকে খুদে খুদে তৈরি করা হয়েছে। কে তৈরি করল? মানুষের তো সাধ্য নয়। তবে কি বিশ্বকর্মা? অলক্ষ্যে বসে মানুষের কল্যাণ কামনায় যিনি নাকি প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। কে যেন আমার কানে কানে বলছে—

'I pitied him in his blindness, but can I boast I see?
Perhaps there walks a spirit close by, who pities me.'

কোনদিন বিশ্বাস করি নি। যারা বিশ্বাসী তাদের দিকে চেয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসেছি। আজ তারা সবাই যেন চারিদিকে অদৃশ্য হয়ে একযোগে আমার উদ্দেশ্যে করুণার হাসি হাসছে।

বুঝতে পারছি যে প্রচণ্ড বেগে নেমে যাচ্ছে ঐ জলধারা, তাতে এরকম কঠিন পাথরের প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত না হলে গঙ্গার গতিপথের কোন স্থিরতা থাকত না। কোশীর মত অবিরত গতিপথ পাল্‌টাতো। বন্যায় ডুবিয়ে দিত দেশ।

"হর হর মহাদেও! হর হর!"

হঠাৎ বাবা বিশ্বনাথের ওপর মুচ্‌রার ভক্তি উথলে উঠল কেন? জিজ্ঞেস করতেই জানায়, ঐ পাথরের প্রাচীরকেই শিবের জটা বলে ওরা। জটার মত এঁকে-

বেঁকে পড়ে আছে পাথরের প্রাচীর। জটারূপ সেই প্রাচীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। মুচ্‌রার সঙ্গে শিবের জয়ধ্বনি করে উঠি সবাই। পাথরের ফাঁকে গঙ্গার বুকে প্রতিধ্বনিত হয় সেই বিজয়োল্লাস।

গল্প করতে করতে, এদিক সেদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ থামতে হল। মুচ্‌রা আবার বন্দনা করে উঠেছে, "গঙ্গা মায়ীকি জয়!" কিন্তু সে বন্দনার শব্দকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে জলের প্রচণ্ড গর্জন। যেন কয়েকখানা স্টিম ইঞ্জিন একসঙ্গে শান্টিং করছে। বলছে—'আমাকে দর্শন করতে এসেছ তোমরা, যাতে অন্যমনস্ক না হয়ে পড়, অন্য আলোচনায় ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাই তো জলদগম্ভীর গর্জনে সর্বদা সতর্ক করে দিচ্ছি সবাইকে। সব ফেলে কাছে এস। এই অনন্ত প্রণবধ্বনির মধ্যে আমার সৃজনীশক্তিকে উপলব্ধি কর।'

পাথরের প্রাচীর শেষ হয়ে গেছে একটু আগে। তার পরে জলপ্রপাত। প্রায় দু'শ ফুট ওপর থেকে তীব্রবেগে দুটি প্রধান জলধারা একখানা সুবিশাল পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। ঐ পাথরখানাই ভগীরথ শিলা। ঐ শিলার ওপর বসেই ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন। ফেনিল জলরাশি জায়গাটা ধোঁয়াটে করে রেখেছে। জল-প্রপাত শব্দ ফেনা পাহাড় মন্দির—সব মিলে সৃষ্টি করেছে এক অলকাপুরী। শিলার ওপর থেকে নেমে এসে, উঁচুনিচু কতগুলো পাথর ডিঙিয়ে প্রবল আগ্রহে ও উচ্ছ্বাসে জলধারা গিয়ে ধরা দিচ্ছে প্রাচীরবেষ্টিত ঐ কারাগারে। প্রবেশদ্বারে একটি শিব-লিঙ্গ। স্বর্গ থেকে গঙ্গা নেমে এসেছেন মর্ত্যে। দিলীপনন্দন ভগীরথের তপোমুগ্ধ শিব তাঁকে ধারণ করেছেন জটাময় মস্তকে। জটা বেয়ে গঙ্গা নেমে যাচ্ছেন মর্ত্যধামে। কোটি সগর-বংশধর ভারতবাসীর মুক্তির মানসে।

'আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোরধ্বনি॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে॥
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী॥"

কতক্ষণ ঐদিকে তাকিয়েছিলাম খেয়াল নেই। সুমনের ডাকে ফিরে তাকাই।

একজন তরুণ সন্ন্যাসী আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে। চেহারাটি সুন্দর। গেরুয়ায় মানিয়েছে বেশ। এখানে কথা শোনা যাবে না বলে সন্ন্যাসী আমাদের এগিয়ে যাবার ইশারা করল। এগিয়ে চলেছি। ডান দিকে গঙ্গার ওপারের পাহাড়টা দূরে সরে গেছে। বাঁ দিকের পাহাড়টা এখন রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি হাঁটছি আমি ও সুমন। সবার আগে চলেছে সাবিত্রী। বেশ জোরে জোরে। তার মধ্যেই চারিদিকে নজর দিচ্ছে। হয়তো ওর স্বপ্নে-দেখা মা-গঙ্গার দেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। সহসা দু হাত জোড় করে প্রণাম করে সাবিত্রী। যে মন্দিরে পুজো দিলে ওর স্বামী রোগমুক্ত হবেন, সেই মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়েছে। চূড়ার ওপরে পেতলের ঘটটি সূর্যালোকে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আর জ্বলছে মন্দির-শীর্ষের ত্রিশূলটি। ঐ ত্রিশূল হাতে শিব গিয়েছিলেন দক্ষপুরী। ঐ ত্রিশূল হাতে সতীর মৃতদেহ কাঁধে করে বিরহ-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে ত্রিভুবন তোলপাড় করে বেরিয়েছেন তিনি। ঐ ত্রিশূল হাতে হাসিমুখে সমুদ্রমন্থনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তিনি হয়েছেন নীলকণ্ঠ। হে মিলন বিরহ আর ত্যাগের প্রতীক ত্রিশূল! তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

জলের শব্দ ক্ষীণতর হয়েছে দেখে সন্ন্যাসী বাংলায় জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম বিশ্বনাথ। স্বামী জ্ঞানানন্দ পাঠিয়েছেন আমাকে। ঋষিকেশের সাধুবাবার চিঠি পেয়েছেন তিনি। ওপারে আনন্দস্বামীর আশ্রমে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।"

ভালই হল। ঘরের জন্য কোন হাঙ্গামা করতে হবে না। ধর্মশালাটি যদিও দেখেছি বেশ বড়, তা হলেও ঘর যে খালি আছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যাত্রীরা এখানে তে-রাত্র বাস না করে নেমে যান না। স্থানাভাব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধুবাবা তো দুজনের কথা লিখেছেন। আমরা যে দলে আড়াই গুণ হয়েছি এ খবর তো জ্ঞানানন্দজীর জানার কথা নয়। জিজ্ঞেস করি বিশ্বনাথকে, "যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমাদের সকলের জায়গা হবে তো?"

"হবে বৈকি। বড় একখানা ঘর রেখেছি। সাধুবাবা দুজনের কথা লিখলেও আমরা জানি দুজনে আসবেন না আপনারা।"

"কেমন করে জানলেন?"

"পথে একা বেরোলেও, একা পথ চলা যায় না। দুর্গম পথই সম্পর্কহীন যাত্রীদের অন্তরের যোগাযোগ ঘটায়। তীর্থে পৌঁছেও তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

প্রীতির আকর্ষণে পরস্পরকে থাকতে ধরে।

দুটি সুবৃহৎ দোতলা বাড়ি নিয়ে ধর্মশালা। রাস্তার পাশে আদি অংশ। একটু দূরে ও উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে নতুন অংশ। তার নীচেই মন্দির। রাস্তার ডান দিকে মন্দির পর্যন্ত দোকানের সারি। দোকানগুলোর পেছনে গঙ্গা। যমুনোত্রীর মত প্রতি বছর তুষারপাতে ভেঙে যায় না এ মন্দির। আয়তনেও বেশ বড়। স্লেট পাথরের টালির ছাদ। কাছেই স্লেট পাথরের পাহাড় আছে। পাথরের দেয়াল। সামনের দিক উত্তর ভারতের হিন্দুমন্দিরের মত। কিন্তু গম্বুজ পাঁচটি দেখে বিস্মিত হচ্ছি। ইসলামী স্থাপত্যের স্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রথম আসেন অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কিন্তু ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর পতনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু স্থাপত্যে ইসলামী প্রভাব বিস্তারলাভ করতে পারে নি। কাজেই গঙ্গোত্রীর মন্দির প্রাচীন নয়। তা হলে গঙ্গার ওপারে পাণ্ডবরা যখন শিবির স্থাপন করেছিলেন, তখন কি এখানে কোন মন্দির ছিল না? অথবা সেদিনকার মন্দির প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ধ্বংস হয়ে গেছে! বহু পরে এ মন্দির গড়ে উঠেছে! দেখেও মনে হচ্ছে এর বয়স জোর দু'শ বছর। শুনেছি জয়পুরেব মহারাজা এই মন্দির তৈরি করেছেন।

মন্দিরের সামনেই আদিবাসী মেয়েরা স্বাগত জানাল। ঝুমরুও ওদের দলে আছে। জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের এত দেরি?"

"আর বল কেন? সেদিন রাতে ঐ হিমে বেড়িয়ে অসুখে পড়েছিল। চার দিন হরশিলে থাকতে হল।" সুমন উত্তর দেয়।

"বেশ হয়েছে।" আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ঝুমরু বলে, "যেমন বহিনজীকে কষ্ট দিয়েছেন, মা গঙ্গা তেমনি হাতেনাতে শাস্তি দিয়েছেন।"

বিশ্বনাথের সঙ্গে দাদা ও রঞ্জন এগিয়ে গেছে অনেক দূর, ঝুমরুর লক্ষ্য হয়, বলে, "ঘর না ঠিক করেই মন্দিরে চলেছেন? চৌকিদারের সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না। আমরা আনন্দ আশ্রমে উঠব।"

"ধর্মশালায় এত জায়গা থাকতে আশ্রমে কেন? না না, সে হবে না। ধর্মশালাতেই ঘর নিন। কালকের দিনটাও এখানে থাকব আমরা। বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে।"

অনেক কষ্টে ঝুমরুকে বোঝাই, ধর্মশালায় থাকা আর আনন্দ-আশ্রমে থাকায় পার্থক্য নেই কিছু। আশ্রমে শুধু রাত কাটাব। আমাদের দিন কাটবে এই এলাকাতেই। মন্দির গঙ্গা দোকান—সবই এখানে। এখানে না এসে উপায় কী?

কয়েক পা এগিয়েই আবার থামতে হল। থামতে হল দুটি লোককে দেখে। একজন গুজরাতী আর একজন সিন্ধী। মন্দিরের বারান্দায় বসে পরমাত্মীয়ের মত গল্প করছেন। এঁরা দুজনেই মানেরী ধর্মশালায় মারামারি করছিলেন। আমরা না ধরলে হয়তো সেদিন রক্তারক্তি হয়ে যেত। আজ কিন্তু দুজনেই একযোগে অভিবাদন করেন আমাদের, "নমস্তে।"

"তস্‌রিফ্‌ রাখিয়ে।"

বসব কি! সময় কোথায়? মন্দির দর্শন করে, এখানেই চা খেয়ে নিয়ে যেতে হবে আশ্রমে। ঘর গুছিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে কথা হবে বলে ওঁদের এড়িয়ে মন্দিরে ঢুকলাম আমরা।

গোমুখীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গোত্রী মন্দির। সামনে চারটি গোল স্তম্ভ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে আমরা বারান্দায় উঠে এলাম। পাথরের স্তম্ভ, পাথরের সিঁড়ি, পাথরের মেঝে দেয়াল ও ছাদ। পাথরের প্রতিমা। শুধু মন্দির নয়—এখানকার পথঘাট ধর্মশালা আশ্রম—সবই পাথরের। পাথর ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। পাথর মাত্রই কঠিন। কিন্তু কাঠিন্যের জন্য পাথরকে যাঁরা প্রাণহীন বলেন আমি তাঁদের দলে নই। পাথর কথা কয়। হাতছানি দিয়ে ডাকে। কাছে এলে স্নিগ্ধ শীতল বুকে জড়িয়ে ধরে। যারা সে স্নেহের পরশ একবার পেয়েছে তারা বারে বারে আসে। নিজেকে বিলিয়ে দেয়। দিয়ে ধন্য হয়।

প্রশস্ত বারান্দা। কয়েকজন যাত্রী এখানে সেখানে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে আছেন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তা হলেও এঁরা বসে থাকবেন। একেবারে ভজন শুনে ধর্মশালায় ফিরবেন। সন্ধ্যারতির পর এখানে ভজনের আসর বসে। তখন এখানে বসার জায়গা পাওয়া কঠিন। প্রদীপ বা ধুনুচি দিয়ে নয়, এখানে আরতি হয় মশাল জ্বালিয়ে। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ঢোল কাঁসর ও ঘণ্টার তালে তালে প্রধান পুরোহিত আরতি করেন। আরতি-শেষে মশাল হাতে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন। পথে শিব ও গণেশের মন্দিরে মশাল ছুঁইয়ে আসেন। শুরু হয় স্তোত্রপাঠ—তারপরে ভজন।

যমুনোত্রীর মত নয়, এখানে মন্দিরের দরজা সারাদিন খোলা থাকে। একজন পূজারী আশীর্বাদ ও চরণামৃত বিতরণ করছেন। আমরাও পেলাম—এ যে কত বড় পাওয়া তা বুঝতে পারছি সুমন ও সাবিত্রীকে দেখে। পরম ভক্তিভরে ওরা চরণামৃত পান করল, আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিল। অপলক নয়নে চেয়ে রইল—ঐ যাঁর তরল তরঙ্গে ত্রিভুবন বিগলিত, সেই দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার দিকে।

বেদীর ওপরে সুবৃহৎ গঙ্গামূর্তি। ডাইনে যমুনা, বাঁয়ে সরস্বতী। সোনালী গঙ্গা,

কালো যমুনা, সাদা সরস্বতী। যমুনার সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্য শান্ত সুমহান ভগীরথ। জলছে ঘিয়ের দীপশিখা—সুগন্ধি ধূপের হোমশিখা। পুজো হয়ে গেছে কিন্তু পুজোর উপচার রয়েছে ছড়িয়ে। ফুলে পাতায়, ভোগে নৈবেদ্যে, আসনে বাসনে পরিপূর্ণ। দুজন পূজারী সেসব গোছগাছ করছেন। আরও অনেক মূর্তি রয়েছে মন্দিরে—রাম লক্ষ্মণ সীতা শঙ্করাচার্য ও শিব তাদের মধ্যে অন্যতম।

সাবিত্রী ও সুমন তেমনি ভাবেই চেয়ে আছে। চোখে নেমে এসেছে অশ্রুর প্রবাহ—আনন্দাশ্রু। সফল হয়েছে শ্রম। সার্থক হয়েছে পদযাত্রা। ধন্য হয়েছে জীবন। সাবিত্রীর স্বামী হবে রোগমুক্ত। সুমন হবে সম্পূর্ণ সুস্থ। হবে—নিশ্চয়ই হবে। সবার সব প্রার্থনা পূরণ হবে। রোগ শোক পাপ ও তাপ দূর হবে। ত্রিভুবন-তারিণীর পদকমলে কুমতি বিসর্জন দিয়ে সুমতি নিয়ে সবাই ফিরে যাবে ঘরে। এই মন্দিরের পাঠপীঠ ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ পীঠস্থান হয়ে থাকবে।

মন্দিরের সামনে বালি আর কাঁকরের চত্বর। এও যমুনোত্রীর মত নয়, মোটা-মুটি সমতল। পাহাড়ের এত কাছে এতখানি সমতল জায়গা প্রকৃতির দান বলে মনে হচ্ছে না। সম্ভবত পাহাড় ভেঙে সমতল করা হয়েছে। আমরা মন্দিরের পেছন থেকে এসে শিবমন্দিরকে ডাইনে রেখে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠেছিলাম। তখন চত্বরের দিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না। এখন দেখছি বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে নতুন ধর্মশালা, ডানদিকে গঙ্গা। জল যমুনোত্রীর মত অত নীচে নয়। চত্বরের শেষে ঘণ্টাঘর। আর দেরি করে লাভ নেই। আগের পথেই ফিরে চলি।

একটা চায়ের দোকানের সামনে বসা গেল। দাদা এখনও এসে পৌঁছন নি। ঘণ্টাঘর দেখে লোভ সামলাতে পারেন নি। মহানন্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। বিশ্বনাথ চায়ের ফরমাশ দিল। দোকানী ইশারায় আমাদের বসতে বলল। আমাদের সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ নেই তার। একজন যাত্রীকে বলে চলেছে, "শীতের আগেই অবিক্রীত জিনিস ভেতরে রেখে দোকান বন্ধ করে আমরা নেমে যাই নীচে। সাত মাস পরে আবার গরমের সময় এসে দোকান খুলি।"

"জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে যায় না?"

"জী না। যে জিনিস যতটুকু রেখে যাই, পরের বছর এসে সবটুকুই বেচতে পারি।"

"আরে তা তো হবেই। এ যে ন্যাচারাল ফ্রিজিডিয়ার!" দাদা ফিরে এসেছেন, "আচ্ছা এখানে কি শীতকালে কেউ থাকেন না?"

চা ছাঁকতে ছাঁকতে উত্তর দেয় দোকানী, "থাকেন বৈকি। সাধুদের কেউ কেউ থাকেন।"

"দোকান না থাকলে তাঁদের চলে কি করে?" মাঝখান থেকে সুমন বলে ওঠে।

"দোকান থেকে কিছু কেনার দরকার হয় না তাঁদের। যাত্রার সময় যা সিধা পান তাতেই সারা বছর চলে যায়। শীতের সময় দিনরাত ঘরের মধ্যেই বসে থাকেন। শুধু জল নিতে বড় জোর দিনে একবার বাইরে আসেন। চারিদিকে বরফ। বের হতে কার ইচ্ছে করে বলুন!"

অনেকক্ষণ থেকে আমিও কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম। দোকানদারের হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা নিয়ে প্রশ্ন করি, "চারিদিকের বরফের মধ্যে জল পান কোথায়? বরফ গলিয়ে জল করেন কি?"

"না না, অত কাঠ পাবেন কোথায়? গরমের দিনে শুকনো ডালপালা যোগাড় করে রেখে দেন। সারা শীতের সম্বল। কাঠ নষ্ট করতে পারেন না তাঁরা।"

"তবে কি নদীর জল বরফ হয় না শীতে?" দাদা প্রশ্ন ছাড়লেন এবারে।

"হয় বৈকি। নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে পারাপার হওয়া চলে। তা হলেও জল থাকে নীচে। বরফ খুঁড়ে জল বার করতে হয়। জল যে থাকবেই। বুঝলেন না, জল থাকতেই হবে। শিবের মাথায় তো জল পড়া বন্ধ হলে চলবে না। বরফের নীচে নীচে জল বয়ে গিয়ে মহাদেবের জটায় পড়ে। কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা যে জটার জল নেবে? ভস্ম হয়ে যাবে না তা হলে!"

॥ আটত্রিশ ॥

ঝুমরুকে যাই বলে থাকি, মন্দির থেকে আশ্রমের দূরত্ব কিন্তু উপেক্ষা করার মত নয়। মন্দিরের চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তা। রাস্তার বাঁদিকে দুখানা দোকানের মধ্য দিয়ে সরু গলি। কয়েক ধাপ সিঁড়িও আছে। পাথর ও বালির ওপর দিয়ে খানিকটা নেমে এসে একটা কাঠের পুল। তার পর অসমতল ত্রিভুজাকৃতি অনেকখানি জায়গা পেরিয়ে আর একটা পুল—কেদারগঙ্গা। পুল ডিঙিয়ে কিছুটা হেঁটে আনন্দ আশ্রম। এপারে কয়েকখানা বাড়ি উঠছে। বিশ্বনাথ জানাল ওগুলো সরকার তৈরি করছেন। ডাকবাংলো দাতব্য-চিকিৎসালয় ডাকঘর প্রভৃতি সবই হবে ধীরে ধীরে। ডাকঘর এখনও আছে, ধর্মশালার দোতলায় একখানা ঘরে। নিজস্ব বাড়ি নেই, এই যা। এপারে পাহাড়টা একটু দূরে। কাজেই সমতলভূমির আয়তন ওপারের থেকে অনেক বেশী।

আনন্দ-আশ্রমের অবস্থানটি বড় সুন্দর। অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির ওপর কেদারগঙ্গার কাছেই অবস্থিত। কেদারগঙ্গা গঙ্গায় মিশেছে মহাদেবের জটার কিছু ওপরে। অনেক আশ্রম ও কুঠিয়া আছে এপারে। পাহাড়ের গুহায়ও নাকি সাধুরা বাস করেন। বিশ্বনাথ বলেছে, আমাদের নিয়ে যাবে ওখানে। ওরই একটা গুহায় তার গুরুদেব থাকেন। নাম সদানন্দস্বামী। শিষ্যদের দিয়ে একটা আশ্রম পর্যন্ত বানিয়ে নিতে পারেন নি, এ কেমন গুরুদেব! জ্ঞানানন্দজীর আশ্রম দেখেছি। বেশ বড় একখানা দোতলা বাড়ি। অত বড় আশ্রমেও শুনেছি স্থানাভাব। শিষ্য-প্রশিষ্যে বোঝাই। আমাদের ঠাঁই নেই। তাঁর পসার-প্রতিপত্তির কথা শুনে খুশি হয়েছি। জীবনের সকল প্রতিযোগিতায় বাঙালী আজ পরাভূত, এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীদের লাইনেও প্রায় বিতাড়িত। বাঙালী জ্ঞানানন্দজীর পসারে খুশি হব বৈকি।

বিশ্বনাথের কিন্তু ভিন্ন মত। বলেছে, জ্ঞানানন্দজীর আশ্রমে ভিড় অবশ্য লেগেই আছে। তাহলেও একখানা ঘর তিনি আপনাদের দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে তাঁর লোকসান।"

"লোকসান?"

"বাঃ, জানেন না বুঝি? দান-ধ্যানের দিকে বাঙালীদের নজর সবচেয়ে কম।"

আনন্দ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা একজন পাঞ্জাবী সাধু। আনন্দস্বামী নামেই পরিচিত। প্রায় বিশ বছর এখানে আছেন। আমাদের দেখে ভারি খুশি হলেন। বললেন, "তোমরা প্রমাণ করেছ, সনাতন ধর্ম ধ্বংস হবে না। ইংরেজী শিখলেও ম্লেচ্ছ হয়ে যায় নি এদেশের ছেলেমেয়েরা। সাহেব হওয়ার মোহ ঘুচে গেছে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের।"

আমরা গোমুখী যাব শুনে উৎসাহ দিয়েছেন। এর আগে যাকে বলেছি সে-ই নিরুৎসাহ করতে চেয়েছে। আনন্দস্বামী বললেন, "কেন পারবে না? আমি এই বুড়ো বয়সেও গতবার ঘুরে এসেছি। মন থেকে যদি ভয় দূর করতে পেরে থাক, তা হলে নিশ্চয়ই পারবে।"

সুমন কিন্তু খুশি হল না। আনন্দস্বামী চলে গেলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "গোমুখী কি না গেলেই নয়? আমি বলছিলাম—" শেষ না করেই থেমে যায়। ওর মুখের দিকে তাকাই। একবার চোখাচোখি হয়। তার পর নীচের দিকে চেয়ে পায়ের একটি নখে বহুদিন আগে লাগানো নেল-পলিসের ক্ষীণ আস্তরণটুকু খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "সবাই বলছিল, এ বছর এখনও খুব বরফ পড়ছে। দু-তিন দিন আগেও দুজন সাধু রওনা দিয়েছিলেন, পৌঁছতে পারেন নি। একজন কোনমতে

প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন। তুষারপাতে তাঁর একখানা পা চলে গেছে। আর একজন বরফচাপা পড়ে মারা গেছেন।"

কি বলব ? পথ যে ভয়ঙ্কর তা অস্বীকার করব কি করে ? তবু যেতে হবে। সাধ্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু আছে সাধ। শক্তিতে কুলোবে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আছে সদিচ্ছা। ভক্তির ভান করব না, কিন্তু মনে নেই কোন ভয়। যতই বাধা পাচ্ছিলাম ততই জিদ বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন মনটা কেমন হয়ে গেল। গোমুখী গেলে সুমনদের ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু সুমনের জন্য আমার মন উতলা হয় কেন ? সুমন আমার কে ?

যথাসময়ে বিশ্বনাথ এল আমাদের নিয়ে যেতে। কাল সকালেই পুজো দিতে চায় সাবিত্রী। সে পাণ্ডার সঙ্গে সে-ই আলোচনায় রত। দাদাও জরুরী কাজে ব্যস্ত। বেড়াতে যাবার অবকাশ নেই। গতরাতের বরফাক্রমণের কথা ভুলতে পারেন নি। আনন্দস্বামীর কাছ থেকে খবরের কাগজ যোগাড় করেছেন। সাবিত্রীর ধমক খেয়ে ময়দা নিয়ে মুচ্‌রাকে দিয়ে আঠা বানিয়েছেন। আমাদের ঘরে জানালা নেই। কাঠের দেয়াল। কাঠের জোড়ায় কোথাও কোথাও একটু-আধটু ফাঁক আছে। সেই ফাঁক মারবেন তিনি। বরফ তো নয়ই—বরফের মাসতুতো ভাই গঙ্গোত্রীর হাওয়াও যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।

সাবিত্রী রাগ করে বলে উঠেছিল, "এখানে এসেও যদি তোমার ঘুম না কমবে, তবে এ পথে পা বাড়িয়েছিলে কেন ?"

সাবিত্রীর কথা নীরবে হজম করাই দাদার নিয়ম। কিন্তু সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। দাদাও রক্তমাংসের মানুষ। বলে বসলেন, "দেখ্‌ সাবি, অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে। তোদের কি ? ভাল ভাল জায়গা বেছে শুয়ে পড়বি। আর আমাকে ঠেলবি জানালার ধারে। এ পথে পা বাড়িয়েছি বলেই কি তোর বৌদিকে বিধবা করব ?"

"বৌদিকে খুব মনে পড়ছে, না দাদা ?" সাবিত্রী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

"পড়বে না ? কত দিন···। যাক গে। এই ফাঁক বুজনোর ব্যাপারে কোন কথা বলবি তো ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

"বেশ বলব না। কিন্তু একটা কথা।" সাবিত্রীর চোখে কৌতুক, "বৌদিও যে আসতে চেয়েছিল, তাকে আনলে না কেন ?"

"প্রাণের দায়ে। তোদের সামলাতেই আমাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হচ্ছে। তোদের রাজত্বে যাই হোক ঘরের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছি। তাকে আনলে তো বারান্দায় পড়ে থাকতে হত।"

সাবিত্রী আর হাসি চাপতে পারে না। আমরাও হেসে ফেলি। দাদা.যেন কেমন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। বোধ করি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তিনি এমন কি বেফাঁস বলে ফেলেছেন।

সুমন ও রঞ্জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিশ্বনাথের সঙ্গে। কি হবে আশ্রমে বসে থেকে ? তাছাড়া বিশ্বনাথের গুরুদেব স্বামী সদানন্দ সম্পর্কে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। ডানদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে জ্ঞানানন্দজীর আশ্রম। বাঁ দিকে পর পর কয়েকটি আশ্রম। কেউ কেউ তরিতরকারীর বাগান করেছেন দেখছি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একটু বাদেই শিবের জটা। জটাকে ডাইনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। এদিকে আর বসতি নেই। জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সঙ্কীর্ণ পথ। মিছিল করে চলতে হচ্ছে। এখানে এখনও লোক চলাচল করছে। যমুনোত্রীর চেয়ে গঙ্গোত্রী জমজমাট। অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী—যাত্রীসংখ্যা তো বটেই। যমুনোত্রীতে যাত্রীরা সবাই আবার রাত্রিবাস করেন না। বিকেল থেকেই লোকের মুখ দেখা যায় না সেখানে।

কথায় কথায় বিশ্বনাথকে জিজ্ঞেস করি, “এ বয়সে সন্ন্যাসী হলেন কেন ?”

“ভারতমাতার মুক্তির মানসে।”

“মুক্তি বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?”

“…to be what we ought to be and to possess what we ought to possess !”

“সেজন্য তো রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের প্রয়োজন।”

“আমারও তাই ধারণা ছিল। নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম রক্তনদীর জোয়ারে। কেবলই হজমের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেলাম। পৌঁছতে পারলাম না মুক্তির সঙ্গমে। শুনবেন সে কথা ?—”

বিশ্বনাথ বলতে থাকে তার ফেলে-আসা-দিনগুলির কথা। চলতে চলতে তন্ময় হয়ে শুনছি। ভালই লাগছে। তবে একটা ব্যথার সুর বেজে উঠছে আমার মনোবীণার তারে। বাজুক। বেদনার পরশেই যে সৃষ্ট হয় শ্রেষ্ঠ সুর। সুখের চেয়ে দুঃখ বড়, মিলনের চেয়ে বিয়োগ বড়, ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়।

স্কুলে পড়ার সময়ই রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে বিশ্বনাথের। কলেজে ঢুকে এ যোগাযোগ পাকা হয়। ঘুরে বেড়ায়ে বস্তিতে বস্তিতে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ওপরে। সংগ্রামী মন নিয়ে সংঘবদ্ধ করে বেড়ায় বঞ্চিতদের।

মা বুঝিয়ে বলতেন, তাকে মানুষ হতে হবে। মনে মনে হাসি পেত তার।

মানুষের সংজ্ঞা মা ও ছেলের কাছে এক নয়। ডিগ্রী রোজগার সংসার ঘুণে-ধরা ধ্বংসোন্মুখ সমাজের এই প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। স্বার্থপর সমাজের বন্ধন থেকে তাকে হতে হবে মুক্ত।

মুক্ত হয়েছিল বিশ্বনাথ। সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বন্দী হল সে। খবর পেয়ে মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা ভাবলেশহীন ভাবে বসে থাকলেন বৈঠকখানায়। আর একমাত্র বোন আরতি অশ্রুপ্লাবিত চোখে সদর দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। হাসিমুখে পুলিসভ্যানে গিয়ে উঠল বিশ্বনাথ। তার সংসার সারা জগৎ জুড়ে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বিশ্বনাথের নবজন্ম হল। সময় কাটাবার জন্য পড়াশুনা শুরু করল। কোন দিন কবিতা, কোন দিন ইতিহাস, কোন দিন দর্শন বা ধর্মগ্রন্থ। যখন যা হাতের কাছে পেত তাই পড়ত। এক দিন তার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন এই বিদ্রোহ? সমাজ ও কাল ভেদে দাবী পরিবর্তনশীল। দাবী হল গণ্ডীবদ্ধ অসীম। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাওয়ার পরিধি বিস্তৃত হয়। কামনার শেষ কোথায়? সৈনিক থেকে সেনাপতি, সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রপতি। কর্মী থেকে কর্মাধ্যক্ষ, তার পরে সর্বাধ্যক্ষ। আরও প্রতিষ্ঠা, আরও প্রতিপত্তি। সমস্ত সমাজ আমার মুঠোর মধ্যে আসবে। সকল দেশ আমার মুখাপেক্ষী হবে। সারা পৃথিবী শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আমাকে বরণ করবে, গ্রহণ করবে, স্মরণ করবে। আর্জ্ ফর বেটার লিভিং নয়, থার্স্ট ফর বেস্ট পোজিশান। ভাল ভাবে বাঁচা নয়, ভালভাবে শাসন করা। কিন্তু যদি দাবী না থাকে? তৃপ্তি হয় সহজাত?

দু বছর বাদে জেল থেকে ফিরল বিশ্বনাথ। কিন্তু এ যেন আগের বিশ্বনাথ নয়। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সাধনা ছিল যার, সে আজ রক্ত দেখলে দুঃখ পায়। বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে। মা তাকে আঁকড়ে ধরলেন একমাত্র অবলম্বন বলে। বিয়ে দিয়ে বন্দী করতে চাইলেন তাকে। আপত্তি করল সে। মা শুনলেন না। পাত্রীপক্ষকে কথা দিয়ে দিলেন। আর দেরি করা সমীচীন নয় বুঝে একদিন শেষ-রাত্রে গৃহত্যাগ করল সে। পায়ের কাছে একখানা চিঠি রেখে মাকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। প্রার্থনা করেছে তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন, আরতির বিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের সুখ-শান্তিকে ফিরিয়ে আনেন, বিশ্বনাথের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেন চিরকালের মত।

থামল বিশ্বনাথ। আমিও চুপ করে থাকি। এক ঝলক শুষ্ক হাসি হেসে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করে আমাকে, "কি ভাবছেন? আমার মত পাষণ্ড সন্তান হয় না এ সংসারে?"

"না না, তা নয়। ভাবছি রক্ত দিয়ে যে একদিন মুক্তিস্নান করাতে চেয়েছিল এ দেশকে, আজ সে গেরুয়া পরে গঙ্গোত্রীতে সন্ন্যাসজীবন যাপন করে কেমন করে মুক্ত করবে তাঁর ভারতমাতাকে ?"

"এ দেশকে দুর্দশামুক্ত করতে হলে গেরুয়া পরতে হবে মুক্তিকামীদের। হিংসা নয় প্রেম, লোভ নয় সেবা, কথা নয় কাজ। গেরুয়া পরে ছড়িয়ে পড়তে হবে সারা দেশে। শিক্ষার আলোয় সকল অন্ধকারকে দূর করতে হবে। তাহলেই শোষণমুক্ত হবে জনসাধারণ। পার্টি নয়, প্রভুত্ব নয়, নিঃস্বার্থ সেবা।"

"এই সন্ন্যাসজীবন যাপন করে কেমন করে এগিয়ে যাবেন সেই সেবাব্রতে ?"

"কেন ? ঘুরে বেড়াই গ্রামে গ্রামে। রুগ্নদের সেবা করি। ছোটদের লেখাপড়া শেখাই। ওদের নিয়ে রাস্তা বানাই। কেউ মারা গেলে সৎকার করি। উত্তরকাশীর সৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠে গিয়ে পড়াশুনা করি। সুযোগ পেলেই ধর্মালোচনা করি।"

"আপনি বাঙালী জেনেও আপনার কাছে ওরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দেয় ?"

"এদের প্রতি অনেক ভুল ধারণা আছে আপনাদের। এরা স্বজাতিকে ভালবাসে। আপন সম্প্রদায়ের বাইরে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। এজন্য অনেক সময় সব ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তা হলেও অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে না। আর বাঙালী তো এদের কাছে অতি আপন।"

"কেন ?"

"বাংলার সঙ্গে গাড়োয়ালের যোগাযোগ ঘটে প্রায় এগারো-শ বছর আগে। গাড়োয়াল ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। আজ এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ সরোলা ব্রাহ্মণদের তেরোটি শাখাই বাঙালী। আবার এদের মধ্যেই ছটি শাখা হল রাজগুরু—ঢংগান পল্যাল মংজখোলা গজল্ভী চাংদপুরী বৌসোলা। এদের মূল পুরুষরা কনকপালের সঙ্গে ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় থেকে এদেশে আসেন। এরা ছাড়াও মৈটওয়ানী খংভুড়ী সেমলটীয়া থপল্যাল বতুড়ী সোমওয়াল বুধানা ধিলভ্যাল লাখেড়া বডোনী ঔরাঙ্গ কুড়িয়াল কিমোটি কোটনালা কোঠারী গংগাড়ী ও মুসড়া—এই সতেরোটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মূল পুরুষও বাংলা থেকে এ দেশে এসেছেন।"

"নামগুলো শুনে তো বোঝা কঠিন যে এদের মূল পুরুষ বাঙালী ছিলেন।"

"তা তো হবেই। নামগুলো যে মূল পুরুষদের পৈতৃক পদবী নয়। ওগুলো গাড়োয়ালী গ্রামের নাম। ওঁরা যে যে গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন, সে সব গ্রামের নামই পরবর্তীকালে ওদের সম্প্রদায়ের নাম হয়ে গিয়েছে।"

"কবে এসেছেন এঁরা ?" রঞ্জন মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে।

"শেষের দুজন কখন এসেছিলেন ঠিক বলতে পারব না। তবে বাকি সকলে ৮৮৮ থেকে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গাড়োয়ালে এসেছেন।"

"তার মানে প্রায় ন'শ বছর ধরে বাংলার সঙ্গে গাড়োয়ালের যোগাযোগ ছিল ?"

"হ্যাঁ। ইংরেজ বাঙালীকে বাবু সম্প্রদায়ে পরিণত করার আগে পর্যন্ত বাঙালী তাদের জ্ঞানের প্রচার আর বুদ্ধির বিকাশের জন্য যুগে যুগে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গাড়োয়ালী রাজপুতদের মধ্যে বংগারী রাউত বলে এক সম্প্রদায় আছে, সম্ভবতঃ এরাও বাঙালী। সাধারণের জন্যে লেখা কাতন্ত্র ব্যাকরণের বাংলা টীকার খুবই আদর ছিল এদেশে। ত্রিপুরা জেলার মেহারের সাধক সর্বানন্দের তান্ত্রিক মতবর্তী শিষ্য এখনও গাড়োয়ালে আছেন।" চুপ করে বিশ্বনাথ। আমাদের নির্বাক দেখে আবার বলতে শুরু করে, "কষ্টের পথ বলে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীতে আজ বাঙালীর ভিড় সবচেয়ে কম। অথচ পরম ব্রহ্মের উপাসক রামকৃষ্ণ, যিনি সিলেটে বিল্বমঙ্গল মঠ স্থাপন করেছিলেন, তিনি আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী এসেছিলেন। রাজস্থান ও কাথিয়া-ওয়ারে তাঁর বহু ভক্ত আছে। তারা এখনও তাঁর রচিত নির্বাণসঙ্গীত গেয়ে থাকেন —

ভজুরে আতম সাধগুরু প্রাণী
আগমগম করে অহনদ শুনায় বাণী।
অভয় ভবে, অখিল মিলে, পূরণ আনন্দ শিবে
তজি পরপঞ্চ সত্যসার বুঝ, আনন্দ তনমন রীবে।
ক্ষীর তজি, আপন ঘর মথি, মমে বিচারি ভিখ
অচেত করম, পরমাদ তজি, আতম মরম শিখ।"

॥ ঊনচল্লিশ ॥

একটা গুহার সামনে এসে থামল বিশ্বনাথ। পাঁচ-ছ হাত লম্বা। হাত চারেক চওড়া একটা গুহা। একজন সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী প্রদীপ জ্বালিয়ে কি যেন লিখছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "এই যে বিশ্বনাথ, এস। আসুন।" বলতে বলতে খাতা-খানা বুজিয়ে ফেললেন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গুহার এক কোণে গুছিয়ে রাখা কাগজপত্রের মধ্য থেকে কয়েকখানা খবরের কাগজ এনে বসতে দিলেন আমাদের।

ঘাড় নিচু করে থাকার থেকে নিষ্কৃতি পেলাম আমরা। গুহার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না।

বিশ্বনাথ শুরু করে, "গুরুদেব, এঁরা কলকাতার লোক। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।"

বিশ্বনাথের দিকে অসন্তোষের দৃষ্টি হেনে সন্ন্যাসী বললেন, "দিন দিন তোমার স্মরণশক্তি বড্ড কমে যাচ্ছে বিশ্বনাথ।"

"কেন বলুন তো?"

"কালই তোমাকে নিষেধ করেছি গুরুদেব বলে ডাকতে। অথচ এরই মধ্যে তুমি তা বেমালুম ভুলে বসে আছ!"

নিরুত্তর থাকে বিশ্বনাথ। আশ্চর্য হই। তবে কি সদানন্দজী বিশ্বনাথের গুরু নন? আমাদের লক্ষ্য করে সন্ন্যাসী বলতে থাকেন, "ওর কী রোখ চেপেছে আমাকে গুরু বানাবে! এতো করে বলছি, আমি নিজেই এখন পর্যন্ত গুরু খুঁজে পেলাম না, আমি আবার কাকে চেলা করব—তা কিছুতেই শুনছে না।"

বিশ্বনাথ কিন্তু এখনও নির্বাক। মনে হচ্ছে এসব কথা শোনার অভ্যেস আছে তার। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই। বলি, "আমরা আপনার কাছে এসেছি কিছু শুনতে, কিছু জানতে।"

"কি শুনতে চান বলুন তো!"

মুশকিলে পড়ে যাই। চট করে কোন জবাব দিতে পারি না। সন্ন্যাসী আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মায়াবাদের কথা শুনতে ভাল লাগে আপনাদের?"

উৎসাহিত হয়ে বলি, "লাগে বৈকি।"

সন্ন্যাসী বিশ্বনাথকে উদ্দেশ করে বলেন, "মায়াবাদ সম্বন্ধে কিছু বল এঁদের।" তারপরে আমাকে জানান, "বিশ্বনাথ মায়াবাদ নিয়ে পড়াশুনো করতে করতে সন্ন্যাসী হয়েছে। অদৃষ্ট মন্দ। বাবার অগাধ টাকার মায়া না করে এখানে এসেছে মায়াবাদের চর্চা করতে।" মৃদু হাসেন সন্ন্যাসী।

"ওনারা আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান।" বিশ্বনাথ মুখ খোলে।

"কিন্তু কি শুনতে চান তাই যে বলতে পারছেন না। সংসারীরা দেখছি ঠিক সন্ন্যাসীদেরই মত। কি চান তাঁরা নিজেরাই জানেন না। কিন্তু সেকথা যাক। কি বলব বলুন? আপনারা যা জানেন তার চেয়ে বেশী কিছুই জানি না আমি।"

"তবে এখানে রয়েছেন কেন?"

"জানতে। এইসব সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভে যদি কিছু হয়। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে প্রতিনিয়ত ভগবানে অবিশ্বাসী করে তোলে। প্রমাণ না পেলে

কিছুই বিশ্বাস করে না। ভগবানে বিশ্বাস বজায় রাখতে হলে তাই প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যন্ত্রশক্তি যেখানে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেইখানে এসে মানুষকে ভগবানের মহাশক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।"

"আপনি কি শীতকালেও এখানে থাকেন?"

"না, সাহস পাই না। সংসার ছাড়লেও প্রাণের মায়া ছাড়তে পারি নি।"

"যাঁরা শীতকালে থাকেন তাঁদের বুঝি প্রাণের মায়া নেই?"

"আছে কি না জানি না। কোনদিন জিজ্ঞেস করি নি তাঁদের। তবে তাঁরা দৈহিক কষ্টের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। আমি পারি নি।"

"যদি কোনদিন পারেন, তাহলে কি বারোমাস এখানে থাকবেন?"

"সে কথা এখন কেমন করে বলি বলুন। সেটা নির্ভর করছে আমার সেদিন-কার মানসিক অবস্থার ওপর। পরিবর্তন জগতের ধর্ম। মানুষের মন তো বটেই, প্রকৃতির স্বরূপ পর্যন্ত পাল্টে যাচ্ছে। আমিও পাল্টে যেতে পারি।"

"প্রকৃতির স্বরূপ পাল্টে যাচ্ছে বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন যে মানুষ নিজের প্রয়োজনে যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করছে? হয়তো গঙ্গোত্রীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন করবে মানুষ। ডিনামাইট বা ক্ষুদে এ্যাটম বোমা দিয়ে পর্বত ভেঙে রাস্তা বানাবে কিংবা রোপওয়ে বসাবে। শীত কমিয়ে ফেলবে। মহাদেবের জটার ওপর জেনারেটার লাগিয়ে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরি করবে। সবাই আসবে শৈল-বিহার করতে। কিন্তু সে তো প্রকৃতির নিজস্ব পরিবর্তন নয়। এ যে পরিবর্তন সাধন করা। আপনিও কি মনের পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করেছেন নাকি?"

স্নিগ্ধ হেসে সদানন্দজী রঞ্জনকে বললেন, "আপনি ঠিক ধরতে পারেন নি আমার বক্তব্য। আমি প্রকৃতির নিজস্ব পরিবর্তনের কথা বলতে চেয়েছি। প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনশীল। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে শীত কমছে। আলাস্কা থেকে তুষারস্তূপ পিছু হঠছে। আর্কটিক ও উত্তর সাগরের বরফের উচ্চতা গত শতাব্দীর তুলনায় এখন অর্ধেক। ল্যাপল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাংশে গত পঞ্চাশ বছরে গাছপালা প্রায় তিন মাইল এগিয়ে গেছে। গত একশ বছরে পৃথিবীর উত্তাপ দুই ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়েছে। একদিন এই গঙ্গোত্রী সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার একদিন হয়তো এখানে এত বরফ পড়বে না। বহুলোক শীতকালেও এখানে থাকবেন। কোলাহল এড়াতে সাধু-সন্ন্যাসীরা এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবেন।"

রঞ্জন আর কোন কথা বলছে না। জিজ্ঞেস করি, "সদানন্দজী, প্রকৃতির এই শান্ত সুন্দর পরিবেশে আপনি বোধ হয় খুব আনন্দে থাকেন?"

"নিশ্চয়ই। তবে মাঝে মাঝে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। এই পরিবেশে থেকেও কিছু সৃষ্টি করতে পারছি না। এমন কি নিজের সত্যিকার স্বরূপ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারি নি। বড় হেয় বলে মনে হয়। গ্যেটের তরুণ ভের্টরের মত আমিও ভাবি—যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি আমার হারিয়ে যায় আর চারপাশের জগৎ ও আমার মনের স্বর্গ ধারণ করে প্রিয়া মূর্তি—তখন সাধ হয়—যদি প্রকাশ করতে পারতাম, যদি সহজ ভাবে কাগজের ওপর ফুটে উঠত যা নিবিড় ভাবে অনুভব করছি—তা হলে সৃষ্টি হত আমার অন্তরাত্মার দর্পণ, আমার অন্তরাত্মা যেমন দর্পণ অনন্তস্বরূপের।"

বিশ্বনাথ প্রদীপের পলতেটা একটু উসকে দেয়। আলো বাড়ে। আমাদের চমক ভাঙে। বাইরে ঘন আঁধার।

"আমরা তা হলে উঠি স্বামীজী!"

"উঠবেন? হ্যাঁ, অনেক দেরি হয়ে গেছে। সারাদিন পরিশ্রম করেছেন। এবার গিয়ে বিশ্রাম করুন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।"

হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরোতে বেরোতে প্রশ্ন করি, "কি বলুন তো?"

"আমাকে দয়া করে স্বামীজী বলবেন না। স্বামীজী বলতে একজনকেই বোঝায়। আমাকে স্বামীজী ডেকে তাঁর অমর আত্মার অসম্মান করবেন না।"

অনেকক্ষণ থেকেই কি যেন বলি-বলি করছিল সুমন। এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি। ও চুপ করে পাশে বসে রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারে নি। একবার ভেবেছিলাম সদানন্দজীকে অনুরোধ করি হিন্দীতে বলতে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর গুহায় বসে বাংলা বলার লোভ সামলাতে পারি নি। শান্তকণ্ঠে সুমন আমাকে বলে, "সাধুজীকে জিজ্ঞেস করুন না, উনি গোমুখী গেছেন কিনা?"

জিজ্ঞেস করতেই সদানন্দজী সুমনকে বাংলায় বলেন, হ্যাঁ, দুবার গিয়েছি।"

বুঝতে না পেরে সুমন আমার দিকে তাকায়। সদানন্দজীকে বলি, "হিন্দী বা ইংরেজীতে বলতে হবে সাধুজী।"

"উনি কি বাঙালী নন?"

"না, মারাঠী।"

"ক্ষমা কিজীয়ে বহিনজী।" হিন্দীতে বলতে শুরু করেন সদানন্দজী, "বাঙালী ভেবে বাংলায় কথা বলে আপনার ওপর অন্যায় করেছি এতক্ষণ।"

"না না, অন্যায় কি? আপনিই বা বুঝবেন কেমন করে? দেখে তো নাকি বোঝাই যায় না।" একবার আমার দিকে তাকায় সুমন, "যাক্ গে, আপনি গোমুখী গেছেন কি?"

"হ্যাঁ, দুবার। গতবারই গেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?"

উত্তর না দিয়ে নিজেই পাল্টা প্রশ্ন করে সুমন, "রাস্তা কেমন?"

"রাস্তা?" সদানন্দজীর কণ্ঠে বিস্ময়, "রাস্তা বলে তো কিছু নেই। গঙ্গার শব্দ লক্ষ্য করে যে যেখান দিয়ে পারে এগিয়ে যায়। তবে তাকেই যদি রাস্তা বলেন তা হলে বলব অতি বিপজ্জনক।"

"গিয়ে ফিরে আসা যায়?"

"সশরীরে আমাকে দেখেও এ সন্দেহ হচ্ছে।" হেসে ফেললেন সদানন্দজী, "দুবার ফিরে এসেছি আমি।"

"আপনি মহাপুরুষ। আপনার কথা আলাদা, সাধারণ মানুষ কি গিয়ে ফিরে আসতে পারে?"

"আপনার কথা মেনে না নিয়েও বলব মহাপুরুষরাও মানুষ। মহাপুরুষরা যা পারেন মানুষের তা অসাধ্য নয়। তবে একাগ্রতা চাই। মনোবল চাই। কিন্তু একথা কেন?"

সুমন চুপ করে আছে দেখে আমি বলি, "আমি—আমরা গোমুখী যাব।"

"পার্থিব জীবনকে ভুলে গেছি। স্নেহ মায়া মমতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার। তবু বলব, ভারতীয় নারীর পরিচয়—সে শক্তি। সকল মহৎ ও মঙ্গলময় প্রচেষ্টায় পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সে প্রেরণা যুগিয়েছে। সন্তানকে যুদ্ধের বেশে সাজিয়েছে, স্বামীকে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে নিজে জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছে। আপনি কেন এঁদের গোমুখী যাত্রায় অন্তরায় হবেন?"

বাক্যহীন সুমন অন্ধকার কালো আকাশের বুকে ফুটে থাকা লক্ষ কোটি নক্ষত্রের পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। জল্‌জল্‌ করছে তার চোখ দুটি। সে চোখের কোলে জল! কিন্তু উজ্জ্বলতায় ঐ অগণিত নক্ষত্রের সঙ্গে যেন রয়েছে মিল।

॥ চল্লিশ ॥

পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। সাবিত্রীই সব করেছে। আমরা শুধু টাকা দিয়েই খালাস। তাই বলে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারি নি। মন্দিরের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে এতক্ষণ। পুজো-শেষে সদানন্দজীকে নিয়ে সিধা কিনতে দোকানে গেলাম।

সিধা নিয়ে প্রথমে এসে দাঁড়ালাম স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের সামনে। তাঁর বয়স কত

কেউ জানেন না। তবে পঞ্চাশ বছরের বেশী এখানে আছেন তিনি। কথা বলেন না। উলঙ্গ ও ধ্যানমগ্ন। মনে হচ্ছে যেন একখানি কালো পাথরের মূর্তি। অনেক্ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও প্রাণের কোন স্পন্দন দেখতে পেলাম না তাঁর শরীরে। বিহ্বল রঞ্জনকে ক্যামেরা ঠিক করতে দেখে স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের শিষ্যা এক নেপালী সন্ন্যাসিনী বাধা দিলেন। বললেন, "হৃদয়ে রাখো।"

তার পর এলাম আর একজন মৌনী সন্ন্যাসীর কাছে। ইনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ইংরেজী জানেন। বললাম, "আমরা আপনার আশীর্বাদপ্রার্থী।"

সামনে রাখা একখানা শ্লেটের ওপর সন্ন্যাসী লিখলেন, "বিবেকই ভগবান। বিবেকের বিরুদ্ধে যেও না।"

সিধা দিলাম রামানন্দজীকে। ইনিও এখানে আছেন প্রায় বিশ বছর। কথা বলেন। আমাদের দেখে খুশি হলেন। প্রসাদ দিলেন। রঞ্জন ছবি নিল।

একটা কুস্তির আখড়ার সামনে এসে থামলেন সদানন্দজী। বললেন, "এটাও একটা আশ্রম।"

অবাক হলাম। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, হিমালয়ের এই শান্ত নির্জন ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে প্রভূত পরিশ্রমে সৃষ্ট নরম মাটির আখড়ায় দুজন পালোয়ান ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একে অপরকে চিৎ করার ফিকির খুঁজছে। ধুলোগায়ে নেংটিপরা আরও কয়েকজন কুস্তিগীর সে দৃশ্য উপভোগ করতে করতে নিজেদের পালার অপেক্ষায় পল গুনছেন। তাঁদের মধ্যে একজন এগিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নির্দিষ্ট স্থানে সিধা রেখে আমরা বাইরে এলাম। কুস্তিগীর সাধু আশীর্বাদ করলেন, "গঙ্গামায়ী আপনাদের অভিলাষ পূরণ করবেন।"

রাস্তায় উঠে সদানন্দজীকে জিজ্ঞেস করি, "এঁরা কেমন সন্ন্যাসী?"

"শিবের উপাসক ও মহাবীরের সাধক। যাত্রীদের সেবা করতে এঁরা প্রতি বছর এখানে আসেন। বিপন্নকে উদ্ধার করেন, অসুস্থকে শুশ্রূষা করেন, এমন কি ধস নেমে রাস্তা ভেঙে গেলে যদি সরকারী লোকদের আসতে দেরি হয়, তা হলে রাস্তা মেরামত করেন। এই তো সেদিন গোমুখীর পথে একজন সন্ন্যাসী মারা গেলেন, খবর পেয়ে তুষারপাতের মধ্যে গিয়ে তাঁর দেহ বয়ে এনেছেন এঁরা।"

দেখি সজল নেত্রে সুমন আমার দিকে চেয়ে আছে। ওর চোখের ভাষা বুঝি। বলছে—শুনলে তো? তুষারপাত হচ্ছে গোমুখীর পথে। সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। নাই বা গেলে তোমরা। না হয় রাখলেই আমার একটা কথা।

এলাম স্বামী জ্ঞানানন্দের আশ্রমে। তিনি কয়েকজন অবাঙালী নারীপুরুষ

শিষ্যের কাছে কি যেন বলছিলেন। আমরা প্রবেশ করায় বাধা পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কে? পরিচয় দিতেই বসতে বললেন। আসন নিলাম সুকোমল গালিচার ওপর।

আবার শুরু করলেন জ্ঞানানন্দজী, "দেবর্ষি নারদ ভাবলেন তাঁর চেয়ে বড় সঙ্গীতজ্ঞ আর নেই ত্রিভুবনে। তাঁর কিন্তু মাঝে মাঝেই তালভঙ্গ হত। রাগ-রাগিণীরা তখন গর্বিত নারদকে জব্দ করতে চাইলেন। তাঁরা বিকলাঙ্গ নরনারীর রূপ নিয়ে পথের ধারে পড়ে রইলেন। নারদ তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের অঙ্গহানি হল কেমন করে?

—আর বলেন কেন? নারদ নামে একটা দেমাকী গাইয়ে আছে, সে তালভঙ্গ করে আমাদের এই দশা করেছে—আমরা সব রাগরাগিণী।

অনুতপ্ত নারদ বললেন—কি করলে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠবে?

—মহাদেব যদি গান করেন তাহলেই।

দেবর্ষি তখন কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেবকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি গাইতে রাজী হলেন—তবে এক শর্তে, তাঁর অন্তত একজন সমঝদার শ্রোতা চাই। নারদ জিজ্ঞেস করলেন—ত্রিভুবনে সমঝদার শ্রোতা কে কে আছেন?

—কেউ নেই। তবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে যদি নিয়ে আসতে পারো, তাহলে মোটা-মুটি একরকম চলতে পারে।

নারদ লজ্জিত হলেন। গায়ক তো দুরের কথা, শ্রোতা হবার যোগ্যতাও নেই তাঁর। যাই হোক তিনি এলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে। অনেক সাধাসাধি করে তাঁদের নিয়ে গেলেন কৈলাসে।

মহাদেব গান ধরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাগরাগিণীরা সুস্থ হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মা কিন্তু দেবাদিদেবের কণ্ঠনিঃসৃত সেই মহাসঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন না। বিষ্ণু কিছুটা পারলেন। আর তারই ফলে তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা তখন দ্রবীভূত বিষ্ণুকে নিজের কমণ্ডলুতে ধারণ করলেন। এই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা।"

দ্রবীভূত শিষ্যরা প্রণাম করলেন। গঙ্গাকে কি জ্ঞানানন্দজীকে বুঝতে পারি না। তবে প্রণাম করে তাঁরা চলে গেলেন একে একে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন জ্ঞানানন্দজী, "কাল চলে যাচ্ছ তোমরা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেমন লাগল গঙ্গোত্রী?"

"খুব ভাল।"

"লাগতেই হবে। দেব-দেবীর লীলাভূমি, বুঝলে না? ভাল না লেগে উপায় আছে? আগে আরও ভাল ছিল। এখন যতসব ভণ্ড প্রতারক এসে ঠাঁই নিয়েছে। আগের সে পবিত্রতা আর নেই।"

বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ, ব্যবসায়ের যুগ—এ যুগে সকলেই কামনা করেন মনোপলি মার্কেট, নিদেনপক্ষে একটা কার্টেল।

"তোমরা সিধা দাও নি?" জ্ঞানানন্দজী বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছেন।

"হ্যাঁ, এই তো দিয়ে এলাম।"

"কোথায়? আমার জন্য তো আন নি?"

এরকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ধারণা যে সব সাধুদের প্রতি মা-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না, তাঁরা সিধা নেন না। এসব ক্ষেত্রে রঞ্জন ঘাবড়াবার ছেলে নয়। কৈফিয়ৎ দেয়, "বড় সন্ন্যাসীদের কাউকে সিধা দেই নি। সাধ্যানুযায়ী প্রণামী দেব তাঁদের।" বলতে বলতে একখানা দশ টাকার নোট জ্ঞানানন্দজীর পায়ের কাছে রাখে।

নোটখানাকে সার্জের ফতুয়ার পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন জ্ঞানানন্দজী, "এবার তা হলে তোমরা এস। আমাকে আবার একবার ওপরে যেতে হবে। একজন গুজরাতী শিষ্যের আসার কথা আছে।"

"কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম আপনার একখানা ছবি নেব।" রঞ্জন মিনতি জানায়।

"ছবি? মানে ফটো?" বলেই হো হো করে হাসতে লাগলেন জ্ঞানানন্দজী। বিস্মিত হই। একটু বাদে হাসি থামিয়ে নিজেই বলেন, "ফটো ওঠে না আমার। আমার চোখের দিকে তাকাও।" থামলেন তিনি। সুযোগ দিলেন তাঁর চোখ দর্শন করতে। তার পর বললেন, "দেখলে?"

"কি?"

"কি রকম জ্যোতি! ফটোতে চোখ তুলতে পারে না কেউ।"

"তা হলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?" রঞ্জন অবিচলিত।

"দোষ আছে বৈকি। চক্ষুহীন ছবি দিয়ে কি করবে?"

"ঠিক চোখ তুলে দেব আপনার। একবার অনুমতি দিয়ে দেখুন।"

"কি বললে?" মনে হয় অপমানিত বোধ করেছেন জ্ঞানানন্দজী, "চোখ তুলবে? ভেবেছ ভাল ক্যামেরা হলেই আমার চোখ তুলতে পারা যায়? কি ক্যামেরা তোমার?"

"ক্যাননৃ। ওয়ান পয়েণ্ট টু লেন্স্।"

"ক্যাননৃ!" আবার উচ্চহাসি। "রোলিফ্লেক্স দিয়েই আমার এক শিষ্য সেবারে কত চেষ্টা করল। না, না। ওসব বেয়াদবী করো না। তা ছাড়া সময়ও নেই আমার।"

অদৃশ্য হলেন জ্ঞানানন্দজী।

॥ একচল্লিশ ॥

আজই গঙ্গোত্রীতে আমাদের শেষ দিন। আনন্দস্বামী আজ বিকেলটা আমাদের বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আমি বিশ্রাম নিলেও দাদাকে নিয়ে রঞ্জন গেছে মন্দিরের দিকে। মন্দিরে নয়, গাইড ঠিক করতে। গাইড ছাড়া গোমুখী যাওয়া যায় না। সাবিত্রী গোছগাছ করছে। কাল সকালে ওরা নামতে শুরু করবে। যতটা সম্ভব আজই গুছিয়ে রাখতে চায়। যে কাজে এসেছিল তা হয়েছে শেষ। ঘরপিয়াসী মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে চাঞ্চল্যকে দাবিয়ে রাখতে গোছগাছ করে সময় কাটাচ্ছে সাবিত্রী।

আশ্রমের একজন পরিচালক চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিল সুমন। উঠে দাঁড়াল সে। লোকটির হাত থেকে কেটলিটা নিয়ে তিনটে গ্লাসে চা ঢেলে একটা গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দেয়। কাল থেকে আমাদের পথ আলাদা। এ কি, সুমনের চোখে জল কেন? চোখের জল দেখলে চোখে জল আসে। তা হলেও স্বাভাবিক স্বরে বলি, "ভেবে দেখলাম তাই ভাল। ঋষিকেশে গিয়েই তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো। তরশু দিন বিকেলে এখানে ফিরে আসছি আমরা। পরদিনই নামতে শুরু করব। পা চালিয়ে নামব। চাই কি পথেও দেখা হয়ে যেতে পারে।" সুমন কোন জবাব দেয় না। আবার বলি, "কদিনেরই বা ব্যাপার! চিন্তা করো না। নির্বিঘ্নে ফিরে আসব আমরা।"

এবারে মুখ তোলে সুমন। বলে, "আমি তো এসব শুনতে চাই নি। তবে একসঙ্গে চলেছি এ কদিন—অনেক অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি—আজ ক্ষমা চাইছি আমরা সেসব অপরাধের জন্য। পারবেন কি ক্ষমা করতে?"

চুপ করে থাকি। কি বলব বুঝতে পারি না। সুমন আবার বলে, "অজানাদের ভিড়ে যদি হারিয়ে যাই, বৃথা খোঁজবার চেষ্টা করবেন না। আর—আর হারিয়ে গেলে হয়তো আপনার ভালই হবে। আমার শুধু পাথেয় হয়ে রইল বুকভরা দীর্ঘশ্বাস আর গঙ্গোত্রীর হৃদয়জোড়া স্মৃতি।"

রঞ্জনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন দাদা। সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী। সুমন দূরে সরে গেল। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীকে বসতে অনুরোধ করি। দাদা তাড়াতাড়ি সাবিত্রীর একখানা শাড়ি কম্বলের ওপর বিছিয়ে দিলেন। বেশ জাঁকিয়ে মজলিসী চালে আসন গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসী। দাদা আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছে তাঁর একটা বক্তব্য আছে। ফিরে তাকাতেই ফিস্‌ফিস্ করে জানালেন, "খাঁটি কানাড়ী সাধু। সিদ্ধপুরুষ।"

"তাই নাকি? পেলেন কোথায়?"

"মন্দিরের সামনে যোগাসনে বসে ছিলেন। প্রণাম করতেই ধ্যান ভেঙে গেল। আশীর্বাদ করলেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এখানে আসার কারণ খুলে বলতেই সাবিত্রীকে দেখতে চাইলেন।" বলতে বলতে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দাদার পরামর্শ অনুযায়ী সাবিত্রী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে। দাদার এত বাধ্য হতে ওকে দেখি নি কোনদিন। বোধ করি দাদাও সেই আনন্দে সন্ন্যাসীকে আর একবার প্রণাম করে ফেললেন।

সন্ন্যাসী কিন্তু আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাচ্ছেন বুঝি? বড় আরাম লাগে এই শীতের দেশে চা খেতে।"

"খাবেন নাকি?"

"পেলে খাব না কেন? তবে থাক। আপনাদের আবার অসুবিধা হবে।"

"কিসের অসুবিধা? আনিয়ে নেব।" দাদা ভদ্রতা করেন।

আমি যোগ করি, "আপত্তি না থাকলে এটাই আপনি নিন না। আমি মুখে দিই নি।" হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে ধরি সন্ন্যাসীর দিকে।

"একান্তই বলছেন যখন।" গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিলেন তিনি।

"কত সহজ এঁদের মন। দেখানো ভদ্রতার ধার ধারে না।" দাদা ভারী অথচ ফিস্‌ফিস্ স্বরে আমার কানে সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

সুমন আর এক গ্লাস চা এনে আমার সামনে ধরে। জিজ্ঞেস করি, "তুমি খেলে না?"

"মুচ্‌রাকে পাঠিয়েছি। দাদাদের সঙ্গে খাবো'খন পরে।" একটু আগের সেই উত্তেজনার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই তার স্বরে।

"আমিই না হয় পরে খেতাম।"

"জ্বালাতন করবেন না, সর্দিতে গলা বসে গেছে, শীগ্‌গির খেয়ে নিন বলছি।"

আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। গ্লাসটা হাতে নিলাম। আগামীকাল সর্দিতে স্বরহীন হলেও এমন স্নেহমধুর শাসন করে চায়ের পাত্র হাতে তুলে দেবে

না কেউ। আমি থাকব চিরবাসায়। সুমন থাকবে হরশিল। সুমন ভাববে—আর আমি ভাবব—

"আপনারা খাবার কি ব্যবস্থা করেছেন ?" জিজ্ঞেস করলেন সন্ন্যাসী।

রঞ্জন উত্তর দেয়, "আজ আর রান্নার হাঙ্গামা করতে হবে না আমাদের। আশ্রমের এক পরিচালককে জিনিসপত্র দিয়ে দিয়েছি। আজ রাতের ও কাল পথের খাবার তৈরি করে দেবে।"

"তা হলে থাক, আমি ভাবছিলাম আপনাদের এখানেই রাতের খাওয়াটা সেরে নেব।"

"থাকবে কেন ? এতগুলো লোকের মধ্যে আপনারও হয়ে যাবে। আপনি বসুন, খেয়ে যাবেন।" সাবিত্রীর মতামত না নিয়েই দাদা সন্ন্যাসীকে কথা দিয়ে ফেলেন। এ জিনিসটি ইতিপূর্বে ঘটতে দেখি নি। আর আশ্চর্য, দাদার এই সাবালকপনা সাবিত্রীর উষ্মার উদ্রেক করল না।

"আপনাদের কৃপায় আজ বিনা পরিশ্রমে খাওয়াটা জুটে গেল। সন্ন্যাসীদেরও আজকাল পরিশ্রম করে খেতে হয়। যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাদের ফরমাশ খাটতে হয়, তবে খাওয়া জোটে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ফিরে যাই সামাজিক জীবনে। কিন্তু সেখানও তো অন্নবস্ত্র সহজলভ্য নয়। তাই আঁকড়ে আছি এ জীবন। আর আছি বলে তো সুযোগটা পেয়েছিলাম।"

"সুযোগ ?" মনোযোগী হই, "কিসের সুযোগ ?"

"মোহন্ত হবার। গত বছর রাজস্থানী এক যাত্রীদলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দলপতির কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল আমার ওপর। বলেছিল তাদের গাঁয়ের মঠের মোহন্ত বুড়ো হয়েছেন, অসুখে শয্যাশায়ী, কথা দিয়েছিল বুড়ো মারা গেলে আমাকে মোহন্ত করে নেবে। বিশ্বাস করি নি তখন। ভেবেছি নিছক মৌলিক আশ্বাস। কিন্তু ভুল, সংসারী হলেও সরল ওদের মন—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় না ওরা। গত সোমবার চিঠি এসেছে, বুড়ো পটল তুলেছে। সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিয়েছি। কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠল না।"

"কেন বলুন তো ?" দাদা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করেন।

"অর্থম অনর্থম !" বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সন্ন্যাসী বুঝিয়ে দেন, "পথখরচা নেই। আজকাল সাধু-সন্ন্যাসীদেরও টিকিট না কেটে উপায় নেই।"

"তা বলে এত বড় সুযোগ আপনি ছেড়ে দেবেন ? ক'টাকা দরকার ?"

"আমার কাছে কিছু আছে। আরও গোটা বিশেক…"

দাদা তৎক্ষণাৎ দুখানা কড়কড়ে দশ টাকার নোট বার করে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রেখে ধন্য হলেন।

সন্ন্যাসীর সৌভাগ্যে সুখী হলাম। আর ভিক্ষে করতে হলে না। তাঁর বেকার জীবনের হল অবসান।

সহসা সুমন এগিয়ে আসে সন্ন্যাসীর কাছে। জিজ্ঞেস করে, "হাত দেখতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই।" বলেই কেমন থতমত খান। কণ্ঠস্বর সঙ্কুচিত করে আবার বলেন, "না।"

আমরা সকলেই একটু অবাক হই সন্ন্যাসীর জবাবে। তিনি বলতে থাকেন, "আপনাদের কাছে মিথ্যা বলব না। প্রায়ই আমাকে হাত দেখার অভিনয় করতে হয়। কিন্তু আপনাদের কাছে স্বীকার পেতে লজ্জা নেই, হাত দেখতে জানি না আমি।"

সন্ন্যাসীর উত্তরে আহত হয় সুমন। চলে যেতে চায় সেখান থেকে। সন্ন্যাসী তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, "হাত দেখিয়ে কি লাভ বহিনজী? অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটবেই। হস্তরেখার সঙ্গে কজনের জীবনের মিল থাকে? আমার ভাগ্য-রেখাটা দেখুন।" ডান হাতখানা তিনি মেলে ধরেন সুমনের সামনে, "রাজা-মহারাজাদেরও হার মানায়!"

"আপনার সৌভাগ্যসূর্য উদিত হচ্ছে সাধুজী।" রঞ্জন সন্ন্যাসীকে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করে, "মোহন্তের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর দেখবেন হাতের রেখার সঙ্গে মিলে গেছে আপনার জীবন।"

সুমন চট্ করে জিজ্ঞেস করে ফেলে, "আচ্ছা গোমুখী গেছেন আপনি?"

"না বহিনজী। মা গঙ্গা আমার মাথায় থাকুন। রওনা দিয়েছিলাম একবার, কিন্তু ফিরে এসেছি।"

"সন্ন্যাসী হয়েও যেতে পারলেন না?"

"সন্ন্যাসী হলেও আমরা অমর নই বহিনজী। তা ছাড়া কুষ্ঠীতে আছে আমার নাকি অপঘাতে মৃত্যু হবে!"

একটু আগে সন্ন্যাসী বলেছেন, যার যা অদৃষ্টে আছে ঘটবেই। অথচ নিজের নিয়তিকে স্বাগত জানাবার সাহস নেই তাঁর! জিজ্ঞেস করি, "কুষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের জীবন মেলে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তা হলে আমি আরও চল্লিশ বছর বাঁচব।"

"আমি বিয়াল্লিশ।" আমি শেষ করতেই বলে ওঠে রঞ্জন।

এবারে সন্ন্যাসী আলোচনার কারণ বুঝতে পারেন। বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, "আপনারা কি গোমুখী যাবেন নাকি?"

"হ্যা।"

"সে কি? আমরা সাধু হয়ে যেতে পারলাম না, আর আপনারা......"

"আমরা অসাধু হয়েও যাব। আপনার যা অসাধ্য, আমাদের তা ছেলেখেলা।"

"আপনারা পাগল।" রেগে গেছেন সন্ন্যাসী। হেসে ফেলি আমি ও রঞ্জন। দাদা কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারেন না। সাবিত্রী নীরব। সুমন সামনের ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের হাসির রোল ঐ পাহাড়ে পৌঁছাবে না।

দরজা খোলার শব্দ। হাসি থামাতে হল। ঘরে ঢোকেন সদানন্দজী। আমরা উঠে দাঁড়াই। সন্ন্যাসীও বাদ যান না। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন সদানন্দজী, "মনে হচ্ছে গোমুখীর মামলা মিটে গেছে!"

"অতি জটিল মামলা।" জবাব দিই, "এত সহজে মিটে যাবে! আপীল চলছিল।"

"রায় দেওয়া হয়ে গেছে?" সদানন্দজী আড়চোখে সুমনের দিকে তাকান।

"না। তবে যেভাবে শুনানী হচ্ছিল তাতে আপনি না এলে আমাদেরই হার হত।"

"হলেই বা ভয়ের কি! হাইকোর্টের পরও সুপ্রীম কোর্ট আছে। আনন্দস্বামীর কাছে আপীল করলে আপনাদের জয় সুনিশ্চিত।"

"জানি।" জবাব দেয় সুমন।

"জেনেও কেন বৃথা চেষ্টা করছেন? জানেন যখন কিছুতেই আটকাতে পারবেন না, তখন কেন অযথা বাধা দিয়ে নিজে কষ্ট পাচ্ছেন আর এঁদের অমঙ্গল ডেকে আনছেন?"

"অমঙ্গল!" চীৎকার করে ওঠে সুমন।

"অমঙ্গল ছাড়া আর কি বলব। ভাল চাইতে গিয়ে খারাপ করছেন। এঁদের দুর্বল করে তুলছেন। সেদিন অনুরোধ করেছি, আজও বলছি, ওঁদের বাধা দেবেন না—পারলে সহায় হন।"

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর ধীরকণ্ঠে সুমন বলে, "ক্ষমা করবেন স্বামীজী। আর আমি বাধা দেব না। আপনার কথাই রাখব।"

সবাইকে একরকম ঘুম থেকে টেনে তুলেছে সাবিত্রী। তার হিসেবে যাত্রার সময় সমাগত। আমার কিন্তু ওর ব্যস্তবাগীশ স্বভাবের জন্য রাগ হচ্ছে। আরও ঘণ্টা-খানেক ঘুমিয়ে নেওয়া যেত অনায়াসে। মৌ-ঘুমটা মাটি করে দিলে।

সুমন জিজ্ঞেস করে, "বড় ব্যাগটা এখানে রেখে যাবেন কি?"

"হ্যাঁ। খাবার কম্বল ও একটা শার্টপ্যান্ট নিচ্ছি। বড় ব্যাগের দরকার কি? শুধু হ্যাভারস্যাক দুটো সঙ্গে নেব।"

"কিন্তু তাতে আমার কম্বল ও জামাকাপড় ধরবে কি?"

"তোমার জামাকাপড় আমাদের হ্যাভারস্যাকে।"

"বা রে, তিন দিনের পথ—জামাকাপড় না নিয়েই যাব নাকি?"

"কোথায় যাবে তুমি?"

"গোমুখী।"

চমকে উঠি।

"তুই কি ক্ষেপেছিস সুমন?" হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে সাবিত্রী।

"না।"

"তা হলে?"

"তার আগে বল্, তুই কেন এসেছিস এই দুর্গম তীর্থে?"

"আমার অসুস্থ স্বামীর স্বাস্থ্যকামনায়।"

"আমিও গোমুখী যাব আমার এক অসুস্থ সঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে।"

সাবিত্রী নির্বাক। দাদা ও রঞ্জন শব্দহীন। মৃদুকণ্ঠে বলি, "আমি তো এখন বেশ ভাল আছি সুমন।"

"হ্যাঁ, তাই কাল সারারাত কেশেছেন। আর একটু জ্বরও হয়েছিল।"

আশ্চর্য! টের পেল কেমন করে? বলি, "ও কিছু নয়। এখন আর জ্বর নেই।"

"তা হলেও আপনাকে এ শরীরে এই বিপজ্জনক পথে পাঠিয়ে আমি কিছুতেই ফিরে যেতে পারব না।"

"কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে আমার বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না সুমন!"

"না না, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না দোহাই!"

'তুমি' শব্দটা সবাইকে সচকিত করে তোলে। হরশিলে সেদিন দুজনে একা ছিলাম। আজ সবার সামনে—

"এ যে ভয়ঙ্কর পথ সুমন। তোমার কষ্ট হবে।"

"না যেতে পারলে আরও বেশী কষ্ট হবে। মিনতি করছি, আমাকে সঙ্গে নাও।"

কি বলব ? কেমন করে প্রত্যাখ্যান করব ? ওকে নিয়ে যদি বিপদ বাড়ে বাড়ুক। সে বিপদকে জয় করতে হবে। কিন্তু সুমন কেন গোমুখী যেতে চাইছে ? বনবাসে কষ্ট জেনেও সীতা রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গী হয়েছিলেন। কষ্ট জেনেও সুমন আমাদের সঙ্গী হতে চাইছে। তবে কি তিন হাজার বছরেও নারী-মনের কোন পরিবর্তন হয় নি ?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আনন্দস্বামী আমাদের আশীর্বাদ করতে এলেন। আমাদের সঙ্গে সুমনও প্রণাম করল তাঁকে। সুমনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "তোমরা আজ কতদূর নামবে ঠিক করেছ ?"

"আমি তো নামছি না।"

"নামছ না !" বুঝতে পারেন না তিনি, "তুমি কি আরও দু-এক দিন থাকবে নাকি এখানে ?"

"না। তবে নামব না, উঠব।"

"উঠবে ?"

"হ্যাঁ। গোমুখী যাব।"

"কিন্তু তুমি তো গোমুখী দর্শনের বাসনা নিয়ে আস নি ?"

"তা হলেও যাব।"

"কার সঙ্গে যাবে ?"

সুমন আমাদের দেখিয়ে দেয়।

"কোন্ অধিকারে ?"

আনন্দজীর প্রশ্নে চমকে উঠি। সুমনের দায়িত্ব নেব কোন্ অধিকারে ?

"অধিকার ? সব অধিকারের কথা সকলকে বোঝানো যায় না স্বামীজী !" দ্বিধাহীন কণ্ঠে সুমন বলে।

ভোরের কুয়াশা কেটে গেছে। পথের রেখা স্পষ্ট। সোনালী রোদে নতুন দিনের দীপ্তি—দিনের কত আলো—গঙ্গোত্রী কত সুন্দর। মানুষ কত মহান্। জীবন কত মধুর।

॥ তেতাল্লিশ ॥

যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করেও রওনা হতে প্রায় আটটা বেজে গেছে। এখন আর তাড়াতাড়ি করার উপায় নেই। কোনমতে পথ দেখে চলা।

তলিয়ে গেছে আনন্দ-আশ্রম। তলিয়ে গেছে কেদারগঙ্গা। তলিয়ে গেছেন ওঁরা সবাই। ওঁদের সকল বাধাকে উপেক্ষা করে, মাত্র উৎসাহকে সম্বল করে এগিয়ে চলেছি বন্ধুর পথে। যাত্রা করেছি ভারতের দুর্গমতম তীর্থে। দেবভূমির আকর্ষণে নয়, খেয়ালী প্রকৃতির পাগল-করা -আহ্বানে। আমার ভয়-ভুলানো মন-মাতানো জাহ্নবীর জন্মভূমি দর্শনে।

বিদায় বেলায় সুমনের চেয়ে সাবিত্রীই যেন বেশী কষ্ট পেয়েছে। সুমনই সাবিত্রীকে সান্ত্বনা দিয়েছে, "কাঁদছিস কেন? কদিনই বা লাগবে ঘুরে আসতে? ঋষিকেশে আবার দেখা হবে। একসঙ্গেই পুণা ফিরে যাব। হয়তো আরও কেউ সঙ্গে থাকবে। বাবাকে লেখা চিঠিটা ডাকে দিতে ভুলিস না যেন।"

সবার আগে চলেছে মুরলীধর। আমাদের গাইড। তার পেছনে রঞ্জন ও সুমন, শেষে আমি।

আমরা চলেছি গঙ্গার বাঁ তীর দিয়ে। মন্দিরের দিক দিয়ে অর্থাৎ অপর তীর দিয়েও যাওয়া যায় তিন-চার মাইল। ওপারের রাস্তা ভাল, মাইল দুই দূরে একটা আশ্রম আছে। সেখানে বিশ্রামও করা যায় খানিকক্ষণ। তা হলেও আমরা এপার দিয়ে চলেছি। তিন-চার মাইল পরে আর ওপারে হাঁটার উপায় নেই। নদীর গা ঘেঁষে খাড়া উঠে গেছে মসৃণ স্লেট পাহাড়। ফলে গঙ্গা ডিঙিয়ে এপারে আসতে হয়। সেটা বিপজ্জনক। হয় গঙ্গার বুকে পড়ে-থাকা-পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, না হয় আর একটু এগিয়ে জমে যাওয়া গঙ্গার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এপারে আসতে হয়। প্রথমটিতে পা ফসকে কিংবা পাথর গড়িয়ে ডুবে যাবার ভয়। দ্বিতীয়টিতে নরম বরফে সমাধিস্থ হবার সম্ভাবনা। সুমন সঙ্গে থাকায় মুরলীধর আমাদের ওপথে নিয়ে যেতে রাজী হয় নি। তবে ওপার দিয়েই আগামী দিনে পথ তৈরী হবে। তখন গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখীর দূরত্ব হবে মাত্র বারো মাইল। শত শত পুণ্যার্থী প্রতি বছর সেই সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথে গোমুখী আসবেন। সে সুদিন শীঘ্র আসুক।

সুমন কিন্তু আজ শাড়ি-পরিহিতা তীর্থযাত্রিনী নয়। স্ল্যাক্স্ পরে নিয়েছে। গায়ে পুরোহাতার সোয়েটার। পায়ে হকি-শু। হাতে স্পাইক লাগানো লাঠি। লাঠিটাই মাটি করেছে, না হলে একেবারে বোম্বাই ছবির নায়িকা। তবে রাস্তাটা মেরিন ড্রাইভের মত নয়, এই যা।

গঙ্গোত্রী মিলিয়ে যায় নি। বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে বিন্দুর মত। ওরা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছে? এখনও কি তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে? ইচ্ছে করছে বাইনোকুলার দিয়ে দেখে নিই একবার। থাক, পেছনে তাকাব না।

মুরলীধরের ভাষায় হেঁটে চলেছি একটা 'গিলা' পাহাড়ের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারছি স্থিতিহীনতার জন্যে ওরা একে 'গিলা' বা কাঁচা পাহাড় বলে। ঝুরঝুরে পাথরের সুদূরপ্রসারী একটা স্তূপ। অনেক নীচে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। মাঝে মাঝে পাথর গড়িয়ে পড়ছে তার বুকে। ওপর থেকে একটা পাথর গড়ালো। পথে কয়েকটা পাথরকে সঙ্গে নিল। ছোটখাটো এদটা ধসের মত গিয়ে গঙ্গায় পড়ল। প্রতি পদক্ষেপের আগে দেখে নিতে হচ্ছে ওপরে ও নীচে দু দিকেই। যে পাথর-খানার ওপর পা রাখব, লাঠি ঠুকে তার বুনিয়াদ পরীক্ষা করতে হচ্ছে, ভার সইতে পারবে কিনা। হয়তো ঐ পাথরখানার ওপর পা দিয়ে সবাই চলে গেছে। কিন্তু আমি পা দিতেই পাথরখানা গড়াতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় পা-খানা অন্য একটা পাথরের ওপর রেখে, লাঠি দিয়ে এক পায়ে ভারসাম্য বজায় রাখলাম। ভাগ্যিস দ্বিতীয় পাথরখানার গোড়া শক্ত ছিল! ওপরের দিকে নজর দেবার সময় পাই নি। হঠাৎ একটা পাথর এসে পিঠের ওপর পড়ল। হাড়সুদ্ধ নড়ে উঠল। পড়ে গেলে যে কোন কিছু আঁকড়ে ধরব তার পর্যন্ত সুযোগ নেই। গাছ তো দূরের কথা, শ্যাওলাও চোখে পড়ছে না। সদাচঞ্চল এই পাথরের রাজ্যে গাছপালা জন্মাবে কেমন করে? এখানে চলেছে শুধু গড়িয়ে পড়ার পালা। গোটা পাহাড়টাই যেন গঙ্গার কোলে আশ্রয় নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতা চলেছে পাথরদের মধ্যে, কে কার আগে গড়িয়ে পড়বে? ছোট গোলাকৃতি পাথরেরা বড় এবড়ো-খেবড়ো পাথরদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছে। তাই বলে যে সব সময় গঙ্গার বুকে আশ্রয় নিতে পারছে তা নয়। হয়তো কোন একখানা বড় পাথরের পেছনে ঠেকে থাকতে হচ্ছে। আবার কখনও সেই বড় পাথরসুদ্ধ গিয়ে গঙ্গার বুকে লাফিয়ে পড়ছে।

পাথরের বুনিয়াদ পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলেছে মুরলীধর। কখনও অনেক ওপর দিয়ে, কখনও গঙ্গার একেবারে পাশ দিয়ে এগোতে হচ্ছে। গঙ্গার পাশ দিয়ে মানে জলের প্রায় শ'খানেক ফুট ওপর দিয়ে। পাহাড়টা হঠাৎ শেষ হয়েছে। আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গিয়ে জলে মেশে নি। এই শ'খানেক ফুট গড়াবার দরকার নেই। একটু অসাবধান হলে সোজা গিয়ে টুপ করে গঙ্গায় পড়ব। অগভীর প্রস্তরময় বিক্ষুব্ধ গঙ্গায় পড়লে গঙ্গাপ্রাপ্ত হতে সময় লাগবে না।

এগিয়ে চলেছি তিনটি তরুণ-তরুণী। ভারতের বৃহত্তম নগরীর বাসিন্দা। মসৃণ রাজপথে হেঁটে দিন কাটে আমাদের। এ জীবনের দুস্তরতম পথ। সঙ্গী হয়েছে সুমন। এক মাস আগে ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। যাকে জানি না সে কেউ নয়, এ কথা বলা যায় না। যাকে চিনি না সে আমার জন্য প্রাণ বিপন্ন করতে পারে না

এ কথাও বিশ্বাস করি না। স্থান কাল পাত্রের কোন প্রভাব নেই মানুষের মনে। এতদিন জানতাম ভগবানের আকর্ষণে মানুষ তীর্থে আসে, আজ জানলাম মানুষের প্রয়োজনেও তীর্থে আসা যায়। জানতাম জীবনকে ভালবেসেই মানুষ মানুষকে ভালবাসে। আজ জানলাম মানুষকে ভালবেসে জীবন বিপন্ন করা যায়···

কিন্তু আমি নীচে নামছি কেন? প্রাণপণ শক্তিতে একখানা পাথরকে আঁকড়ে ধরতে চাই, নাঃ, সে পাথরখানাও গড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকখানা পাথর এসে গায়ে পড়ল। পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছি। চোখের সামনে সব আবছা হয়ে আসছে। জ্ঞান হারালে চলবে না। গড়াতে গড়াতে গিয়ে যদি গঙ্গায় পড়ি, তা হলেও সজ্ঞানে পড়ব। সুমনকে এখনও দেখতে পাচ্ছি। চীৎকার করে উঠেছে। ও নীচে নামছে কেন? পড়ে যাবে যে? যাক্, রঞ্জন সুমনকে টেনে ধরেছে। হাত-পা নেড়ে মুরলীধর কি যেন বলছে। কিছুই যে বুঝতে পারছি না। যা ধরতে যাচ্ছি তাই আমার সঙ্গে গড়াচ্ছে। উপরন্তু সেগুলো এসে সারাশরীরে আঘাত করছে। গড়াতে গড়াতে যথাসম্ভব মুখখানা রক্ষা করছি; এ অবস্থায়ও খেয়াল আছে যে চশমার ওপর পাথর পড়লে মহাবিপদ—। বিপদ! আর বিপদকে ভয় করে কি হবে? কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরে আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। রঞ্জন কাঁদবে। মুরলীধর চোখের জল ফেলবে। সুমন···

বাঁচতে হবে আমাকে। যেমন করেই হোক। হাতের সামনে যা পাচ্ছি তাই আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছি। একখানাও যে শক্ত পাথর পাচ্ছি না। সর্বশরীর পাথরে ছড়ে যাচ্ছে। আর মিনিট দুই গড়ালেই গঙ্গা। জীবনকে তো এত ভালবাসতাম না! তবে কি জীবনের প্রতি মমতা বেড়েছে আমার? কিন্তু কেন?

হঠাৎ স্থির হয়ে গেলাম; আর গড়াচ্ছি না। দুখানা শক্ত পাথরের মাঝে আটকে গেছি। আমার সহযাত্রী পাথরগুলো সেই দুখানা পাথরকে ডিঙিয়ে গঙ্গার বুকে আশ্রয় নিল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম। তার পর কয়েক মুহূর্ত কি ঘটেছে বলতে পারি না। জেগে থেকেও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সচেতন হলাম একটা আকর্ষণে। মুরলীধর ও রঞ্জন আমাকে টেনে তুলছে। বহু কষ্টে নেমে এসেছে ওরা। মুরলীধরের প্রদর্শিত পথে আবার ওপরে উঠে এলাম। সুমন দাঁড়িয়ে আছে। সুমন নির্বাক।

সারাদেহ ছড়ে গেছে অথচ রক্ত পড়ছে না। আমি কি রক্তহীন হয়ে গেছি? হেসে ফেলে মুরলীধর, বলে, "ঠাণ্ডার জন্য রক্ত বের হচ্ছে না।"

বোধ হয় দশ মিনিটও হাঁটি নি, একটা প্রচণ্ড শব্দে পেছন ফিরে তাকাতে

হল। যেখান থেকে ওরা আমাকে টেনে তুলেছে সেই জায়গাটা ধসে পড়ল গঙ্গায়। আর দশ মিনিট দেরি হলে আমরাও ধসের সঙ্গে গঙ্গাপ্রাপ্ত হতাম।

গঙ্গা ডাইনে বেঁকে গেছে। গঙ্গোত্রী মিলিয়ে গেছে ঐ বাঁকের মুখে। গিলা পাহাড় শেষ হল।

একটু বাদেই একটা ঝরনা। স্বচ্ছ শীর্ণ ঝরনা। উপলখণ্ডে প্রহত হয়ে সহস্র হীরকখণ্ডে বিচ্ছুরিত হয়ে বয়ে চলেছে সে। যাত্রীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গঙ্গায় পড়ছে। হয়ত ধন্যই হচ্ছে। জল খেতে খেতে একটু এদিক সেদিক দেখে নিলাম। এ জায়গাটার আর এক রূপ। হিমালয়ের যে চেহারার সঙ্গে বেশির ভাগ লোকের পরিচয়, সে চেহারা এখানে আর নেই। তবুও রূপ বলব বৈকি। ভাল লাগল দেখে। এতক্ষণ পায়ের দিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে নজর দেবার ফুরসত পাই নি। একে ভয়ঙ্কর পথ, তার ওপর মুরলীধরের তাড়া—ঠিকমত না চললে সন্ধ্যের মধ্যে চিরবাসা পৌঁছতে পারব না।

ভূর্জ গাছের একটি জঙ্গলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। এখন বেলা এগারোটা। মুরলীধর জানাল, "ভাংলুবাসা এসে গেছে। এবারে বিশ্রাম নেওয়া যাক খানিকক্ষণ।"

বলতে দেরি আছে, বলতে দেরি নেই। ব্যাগ থেকে ডেটল সালফা নিলামাইড পাউডার ও ব্যাণ্ডেজ বার করে রঞ্জন আমার শুশ্রূষা শুরু করল। মুরলীধর ততক্ষণে আনন্দস্বামীর দেওয়া মুগের লাড্ডু বার করে ফেলেছে। দিল্লীর এক শিষ্য আনন্দজীর জন্য লাড্ডুগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুমনকে দিয়েছেন। গোমুখীর পথে দিল্লীকা লাড্ডু—ভাগ্যিস সুমন সঙ্গে এসেছে! সুমনের দিকে তাকাতেই আমার হাসি মিলিয়ে গেল। সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। ওর চোখের পলক পড়ছে না; সে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ! ডাক দিলাম, "সুমন!"

একটু নড়ে উঠল। যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বলল, "কি?"

মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ঐ কণ্ঠস্বর। একটু বাদে ধীর পদক্ষেপে আমার পাশে এসে বসে। জিজ্ঞেস করি, "কি ভাবছ এত? আমি বেঁচে আছি!"

কথা বলে না। একবার চোখাচোখি হয়। তার পরেই লজ্জা-শরম সব ভুলে অবুঝের মত অঝোরে কাঁদতে থাকে। নিজের চোখের জলে ধুইয়ে দিতে চায় আমাদের বিপদ। অশ্রুর প্রবাহে মুছে ফেলতে চায় তার মনের শঙ্কা, প্রিয়জন হারাবার ভয়।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

ভূর্জগাছের জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। শেষ করতে প্রাণান্ত হয়েছে। কখনও ডালপালা সরিয়ে চলতে হয়েছে—কখনও মাটি ঘেঁষে পড়ে থাকা ডালপালার ওপর দিয়ে লাফিয়ে এগোতে হয়েছে। গড়িয়ে পড়ার জন্য এমনিতেই আমার হাত-পায়ের অবস্থা শোচনীয়। তার ওপর এই ডালপালার ঘর্ষণ। ভাগ্যিস মুরলীধরের কথামত হাঁটু পর্যন্ত গরম কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিয়েছিলাম, নইলে পায়ের এতক্ষণে কি হাল হত কল্পনাও করতে পারছি না। জল ফুরিয়ে গেছে। মুরলীধর ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছে পা চালিয়ে চলতে। সামনেই নাকি বরফ। বরফে তৃষ্ণা মিটবে। শ্রান্তি কমবে। এখনই শীতে কাঁপছি, এর ওপর আবার বরফ! কি সন্দেশই দিল মুরলীধর!

সন্দেহ যাই হোক, খানিকক্ষণ পরেই বরফের মুখোমুখি হলাম। সকলেই আর একবার কোল্ডক্রীম মেখে নিলাম। জঙ্গলের সীমারেখার অনতিদূরেই বরফের রাজ্য। এ রাজ্যে সাদা ছাড়া আর কোন রঙ নেই। পাহাড় সাদা। কাঁটা গাছ সাদা। খাদ সাদা। গঙ্গা সাদা। সাদায় সাদায় একাকার হয়ে গেছে চারিদিক। তাই বলে সাদার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। কোথাও গাঢ়, কোথাও হাল্কা। কোথাও পাথর ও কাঁটাগাছের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে সাদা। দূরে পাহাড়ের মাথায় সাদার ওপর রামধনুর খেলা। কাছের পাহাড়ের গায়ে সাদার ওপর সোনালীর ছড়াছড়ি। জগতে কত রং। রঙের ছোঁয়া লেগেছে আমার মনে।

বরফের ওপর দিয়ে চলেছি। জীবনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু গঙ্গার রুদ্ধ গর্জন কানে আসছে। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। উচ্চতার জন্য অক্সিজেনের প্রাচুর্য হ্রাস পেয়েছে। শরীরের ওজন যেন গেছে কমে। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কথা বলতে পারছি না। বলতে ইচ্ছেও করছে না। একটা হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া মাতামাতি করছে। বরফের ঘনত্বের তারতম্যের জন্য উত্তাপের কোন স্থিরতা থাকে না এসব জায়গায়। পৃথক পৃথক বায়বীয় চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে সব সময়।

যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যন্ত্রের মত পা দুখানা টেনে নিয়ে চলেছি। শুধু পায়ের সাহায্যেও চলতে পারছি না সব সময়, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। হাত কিংবা পা ডুবে যাচ্ছে বরফের মধ্যে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তলিয়ে যাওয়া অবশ হাত অথবা পা টেনে তুলতে হচ্ছে। শুনেছি এই বরফের আস্তরণের নীচেই কোন কোন জায়গায় গভীর খাদ থাকে। চলতে চলতে লোক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের মৃতদেহ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরাও

যে-কোন সময় তলিয়ে যেতে পারি। অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি এ পৃথিবী থেকে। পৃথিবী! আমরা কি এখনও পৃথিবীতে আছি? পৃথিবী বলতে যাকে জানি তার সঙ্গে তো এর কোন মিল নেই। কিন্তু আমি যে পৃথিবীর প্রাণী তা এখনও ভুলে যাই নি। ভুলে যাই নি, যেমন করেই হোক এই ব্যথাতুর দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে চিরবাসা ধর্মশালায়। সেখানে বিশ্রাম করতে পারব সারারাত। কিন্তু পারব কি পৌঁছতে? এ পথের কি শেষ আছে? আর কত দূর?

হাঁটু পর্যন্ত অবশ হয়ে গেছে। লাঠি ধরে থাকা হাতের মুঠি খুলতে পারছি না। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। বরফ তুলে তুলে মুখে পুরছি। কিছুক্ষণের জন্য পিপাসা মিটছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটা কমণ্ডলু। তবে কি আশেপাশে কোথাও লোক আছে? প্রাণ আছে? কিন্তু কোথায়? যতদূর দৃষ্টি চলে বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই। সবাই দাঁড়িয়ে আছি কমণ্ডলুর পাশে। কারও মুখে কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ বাদে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে মুরলীধর বলল, "হতভাগ্য সন্ন্যাসী! এতদূর এসেও চিরবাসা পৌঁছতে পারলেন না!"

চোখের সামনে ভেসে উঠল ব্যথাকাতর একখানি মুখ। গঙ্গোত্রীর ধর্মশালায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। পাঁচ-ছ দিন আগে আর একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে গোমুখী রওনা হয়েছিলেন। এইখানে এসে সহযাত্রীর প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে। প্রাণের মায়ায় গোমুখীর মায়া ত্যাগ করে সহযাত্রীকে ফেলে গঙ্গোত্রী পালিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষত দেহে পৌঁছতে পারেন নি। তুষারপাতে একখানা পা গলে গেছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছেন গঙ্গোত্রী ধর্মশালার রুদ্ধকক্ষে।

পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি কমণ্ডলুর দিকে। কত তীর্থ পরিক্রমা করেছে ঐ কমণ্ডলু! কতবার বিগলিত করুণা জাহ্নবীর পুণ্যসলিলে পূর্ণ হয়েছে! আজ সন্ন্যাসীর অপঘাত মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে আমাদের সামনে পড়ে আছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করতে এসেছ, সে বড় নিষ্ঠুর। মানুষের স্নেহ-ভালবাসার কোন মূল্য নেই তার কাছে। মুহূর্তের অসাবধানতায় সে তোমার ওপর চরম আঘাত হানতে দ্বিধা করবে না। রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বাস করো না তাকে। রূপকথার রাক্ষসী সে। রূপের মোহ বিছিয়ে নির্বোধ মানুষকে বিহ্বল করে সুযোগ বুঝে তার ঘাড় মটকায়।

কমণ্ডলুটা মুরলীধর হাতে তুলে নিল। বলল, "স্বামী তত্ত্ববোধকে দেব।"

তত্ত্ববোধ! ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর কথা। তাঁর কাছে যে যেতেই হবে

আমাকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন তিনি এই প্রাণহীন প্রান্তরে পড়ে আছেন?

আবার যেন সবুজ চোখে পড়ছে। সাদা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বরফমুক্ত কঠিন পাথর দেখতে পাচ্ছি। তবে কি—হ্যাঁ! চীৎকার করে উঠল মুরলীধর, "গঙ্গা মায়ীকি জয়! স্বামী তত্ত্ববোধকী জয়।"

ঐ তো পাহাড়ের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে চিরবাসা ধর্মশালা। মুরলীধরের সঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠলাম। আমরা তা হলে বোবা হয়ে যাই নি। কথা বলতে পারছি। কি আনন্দ! কিন্তু সুমন শুয়ে পড়ল কেন? মুরলীধর এসে বসে পড়ল সুমনের কাছে। ওর মাথাটা তুলে ধরল ওপরে। আমরাও এগিয়ে গেলাম। ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়লাম তার মুখের কাছে। নিঃশ্বাস বইছে। হৃদ্‌পিণ্ড-স্পন্দনেরও প্রমাণ পাচ্ছি। অথচ চোখ বুজে আছে, কথা বলছে না।

"সুমন! সুমন!"

"ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। তুমি ওর মাথাটাকে কোলে নিয়ে বোসো। দেখি ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলে সুস্থ হয় কিনা।" রঞ্জন বলে।

মুরলীধরের হাত থেকে সুমনের মাথাটা তুলে নিই। কাঁধ থেকে থলেটা নামায় মুরলীধর। হাতড়ে হাতড়ে রঞ্জন বোতলটা বার করে। অতিকষ্টে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দেয় সুমনের গলায়।

সুমনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছি আমরা। গোধূলির আব্‌ছা আলোয় চিরবাসা ধর্মশালা দেখা যাচ্ছে। তবু ওকে নিয়ে যাই কেমন করে? নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। ওর জ্ঞান হবার অপেক্ষায় বসে আছি। একটা চীৎকার কানে এল। আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল মুরলীধর, "স্বামী তত্ত্ববোধ আসছেন।" চীৎকার করে সাড়া দিল সে। দেবভূমির বাসিন্দা মাটির মানুষের সাহায্যে আসছেন। আর্ত মানুষের সাহায্যে মানুষ এগিয়ে আসছেন, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি।

জটাবিলম্বিত দাড়িগোঁফময় নাতিদীর্ঘ এক স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন সামনে। প্রণাম করলাম তাঁকে। প্রতি-নমস্কার করে তিনি ঝুঁকে পড়লেন সুমনের দিকে। একখানা হাত তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলেন। তারপরে বললেন, "থাও্‌, অওর থাকাওয়াট্‌সে বেচারী বেহুশ হো গয়ী।"

আমাদের কিছু বলবার বা বোঝবার আগেই নিজের সবল দু বাহু বাড়িয়ে সুমনকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, "চল্‌ বেটা ধরম্‌শালামে চল্‌। ভগওয়ান পর ভরোসা রাখ।"

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে এল সুমনের। চোখ মেলে তাকাল সে। ওষুধপত্র বের করতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়েছিলেন স্বামী তত্ত্ববোধ, "বেটা, পাহাড়ে এসেছিস, পাহাড়ী ওষুধ খেতে দে ওকে, তা হলেই ভাল হয়ে যাবে।"

কতকগুলো জংলী লতা থেঁতলে নিয়ে চিনি মিশিয়ে সুমনকে খাইয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিক সেদিক তাকিয়ে কি যেন দেখছে সুমন। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, "আমরা চিরবাসা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। ইনি স্বামী তত্ত্ববোধ। তোমাকে বয়ে নিয়ে এসেছেন। ওষুধ দিয়েছেন। তুমি ভাল হয়ে গেছ।"

স্বামীজীর দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে সুমন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "ব্যথা, বড্ড ব্যথা!"

ব্যথা তো হবেই। আমাদেরও সর্বশরীর ব্যথার বোঝা হয়ে আছে। এই শরীর নিয়ে কাল গোমুখী রওনা হব কেমন করে? যাতায়াতে আঠারো মাইল। ভোরে রওনা দিয়ে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে।

স্বামী তত্ত্ববোধ সুমনকে ভরসা দেন, "আচ্ছা বেটী, তোর ব্যথা আমি সারিয়ে দেব। ব্যথা কমে গেলে কিন্তু আর শুয়ে থাকতে পারবি না—আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হবে।"

ছোট মেয়েটির মত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সুমন। অবাক হয়ে তাকাই স্বামীজীর দিকে। কি বলছেন তিনি? এই ব্যথা সারিয়ে দেবেন? দেখাই যাক্ না! বললাম, "আমাদেরও সারা শরীর ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। আমরাও আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। দিন না আমাদের ব্যথা সারিয়ে!"

হেসে উঠলেন স্বামীজী। শিশুর মত সরল হাসি। বললেন, "দেব রে দেব। তোদের সবার সব ব্যথা সারিয়ে দেব।" একটু থামলেন। তারপরে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি সারাবার কে? যিনি শরীর দিয়েছেন তিনিই ব্যথা দূর করবেন। আমি শুধু তাঁর হয়ে তোদের সেবা করতে এখানে রয়েছি।"

চমকে উঠি। মানুষের সেবা করার জন্ত দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে এই বিজন প্রান্তরে দিনাতিপাত করছেন তিনি! তবে কি যা শুনেছিলাম তা ভুল? শুনেছিলাম তপস্যা করতে তিনি রয়েছেন এখানে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীজী প্রশ্ন করলেন, "কি রে? কি ভাবছিস?"

আশ্চর্য ! অন্তর্যামী নাকি ? তা হলেও মনের দ্বিধাকে ঘুচিয়ে ফেলতে জিজ্ঞেস করি, "শুনেছি আপনি এখানে বসে তপস্যা করেন ?"

আবার হেসে উঠলেন তিনি। প্রাণখোলা নির্মল হাসি, "আরে বেটা, তোর সেবা করা আর ভগবানের পুজো করা যে একই কথা। জীবমাত্রেই নারায়ণ। তুই তো ভগবান।"

"এ কি বলছেন আপনি ? আমি যে ভগবানকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না !"

"বিশ্বাস কর না ?" মাঝখান থেকে শাসিয়ে ওঠে রঞ্জন, "সব কিছুর একটা সীমা আছে। আজ যা ঘটেছে, কাল যা ঘটতে পারে, তা জেনেও এ কথা বলছ ?"

রঞ্জনের কথাকে আমল না দিয়ে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, "আমি কি গোমুখী যেতে পারব ?"

আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্বামীজী। তার পর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "পারবি।"

"কিন্তু আমার যে ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস নেই।"

"কিছুই যায়-আসে না। তুই নিজেকে বিশ্বাস করিস। আত্মবিশ্বাস আর ভগবৎবিশ্বাসে পার্থক্য নেই কিছু।" নানা প্রশ্ন মনে এসে উঁকি মারছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারলেন তিনি। বললেন, "মনের ভাব গোপন করা মহাপাপ। বল্ কি জানতে চাস্ ?"

"আপনি তা হলে এখানে এসেছেন কেন ?"

"আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে। আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল বলেই পালিয়ে এসেছি এখানে। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস লাভ করি নি এখনও। করলেই ফিরে যাব।"

"কোথায় ?"

"সংসারে।"

সন্ন্যাসী ফিরে যাবেন সংসারে ! কি বলছেন ? আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, "ওরে, সংসার-জীবন সন্ন্যাস-জীবনের চাইতে অনেক কঠিন। কায়মনোবাক্যে কু-আচরণ না করে যদি সংসার করতে পারিস, তা হলে তার চেয়ে বড় তপস্যা আর নেই এ জগতে।"

মুরলীধরকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী চলে গেলেন নিজের ঘরে। একটু বাদে রঞ্জনও বেরিয়ে গেল জল আনতে।

সুমন কাছে ডাকে আমাকে। বলে, "স্বামীজীর কথা শুনলে ?"

"হ্যাঁ।"

নিজের দুর্বল হাত দুখানি আমার মুঠোয় গুঁজে দেয় সুমন। নীরব স্বল্পক্ষণ। হঠাৎ বলে ওঠে সে, "আচ্ছা আমি যদি আর না বাঁচি?"

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! বাঁচবে না কেন? কি হয়েছে ওর? বলি, "এসব উদ্ভট কথা ভাবছ কেন? ছিঃ!"

দুষ্টুমি-ভরা একটুকরো হাসি সুমনের ঠোঁটে। ভারি সুন্দর দেখায় ওকে হাসলে। নিটোল গাল দুটির ঠিক মাঝখানে টোল পড়ে। আরও কাছে সরে এসে উচ্ছল কণ্ঠে বলে, "ইস্, মরলেই হল! তুমিই বা আমাকে মরতে দেবে কেন? গোমুখী থেকে ফিরে যাব পুণা। সঙ্গে থাকবে তুমি। বান্ধবীদের বলব কৈলাস থেকে বিশ্বনাথকে নিয়ে এসেছি। সব্বাই তোমাকে দেখে খুশি হবে। ঠিক কথা পথে কিন্তু এলাহাবাদে একবার নামতে হবে। সঙ্গমে গিয়ে পুজো দেব গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীকে। বলব—ভেবেছিলাম তোমরা আমার ওপর রুষ্ট হয়েছ, কিন্তু দেখলাম তোমাদের করুণার শেষ নেই। তোমাদের দান আমি মাথায় তুলে নিয়েছি।"

থামতে হল সুমনকে। সরে যেতে হল একটু দূরে। হাত ছাড়িয়ে নিতে হল আমার হাত থেকে। চা ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল মুরলীধর। সুমনকে উঠে বসতে সাহায্য করলাম। চায়ে চুমুক দিয়েই বলে উঠল সে, "এ কি, চায়ে এরকম ঝাঁজ কেন?"

হেসে জবাব দেয় মুরলীধর, "আপনারা যে চা খান, এ সে চা নয়। এ হচ্ছে এখানকার পাহাড়ী চা। খেয়ে নিন। দেখবেন গায়ের ব্যথা থাকবে না। শরীর গরম হয়ে উঠবে।"

স্বামীজী এলেন একটু বাদে। জানালেন, "মুরলীধর আমার ঘরে আগুনের পাশে শয্যা পেতেছে। তোরাও বিশ্রাম কর। রাতে খাবার সময় ডাকব।"

চলে গেলেন স্বামীজী। একখানা তক্তার ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। আগের মত আর অত শীত লাগছে না। হাঁটু দুটোর শক্তিও ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। বাইরে ঘন আঁধার। ঘুম নেমে আসছে চোখে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। কাদের কথাবার্তায় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলাম। সুমনও বসে আছে। জিজ্ঞেস করি, "ও কি, তুমি আবার উঠলে কেন?"

"আমি ভাল হয়ে গেছি। গায়ের ব্যথা কমে গেছে। শীতও লাগছে না।"

ঠিকই তো। আমারও তাই মনে হচ্ছে। পাহাড়ী চায়ের গুণ আছে বলতে হবে। কথাবার্তার শব্দটা এগিয়ে আসছে। মুরলীধর ও রঞ্জনের সাড়া পাচ্ছি। ত

সুমনকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। ঘন কালো অন্ধকার। ওরা এসে বারান্দায় উঠল। রঞ্জন ও মুরলীধরের কাঁধে ভর দিয়ে স্বামীজী ঢুকলেন নিজের ঘরে। তাঁর দেহে দু জায়গায় ক্ষতচিহ্ন। বিছানার ওপর বসলেন তিনি। ঘরের এক কোণে রাখা পাতার স্তূপ থেকে কয়েকটি পাতা নিয়ে রস করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল মুরলীধর। সুমন কখন আমাদের ঘরে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসেছে খেয়াল করি নি। সযত্নে ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিল সে। একটা স্নিগ্ধ হাসি হেসে স্বামীজী বললেন, "আজ বড় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম। পেছন থেকে এসে ঝাপটে ধরেছিল কিনা।"

এই তুষারের রাজ্যে কিসের মোহে কে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে ঝাপটে ধরল? কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম না কিছু। স্বামীজী নিজেই বলতে থাকলেন, "তোদের জন্য চা বানাতে গিয়ে দেখি আর চা-পাতা নেই। ভাবলাম নিয়ে আসি। পাতা তুলছি, এমন সময় পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। আমার চীৎকার শুনে মুরলীধরকে ছুটে আসতে দেখে পালিয়ে গেল।"

আর প্রশ্ন না করে পারি না, "কে?"

"ভাল্লুক।" একবার থামলেন স্বামীজী, "কাছাকাছি থাকে। আমার ওপর দারুণ রাগ ওদের। আগে আমি নদীর ওপারে একটা গুহায় থাকতাম। সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে ওদের অত্যাচারে। এখানেও ওরা আমায় থাকতে দিতে চায় না। শীতকালে ওরা ধর্মশালাতেই থাকে। গরমের সময় আমি গঙ্গোত্রী এলে ওদের চলে যেতে হয়। আমাকে তাই ওরা মেরে ফেলতে চায়।"

চা বানিয়ে সবাইকে পরিবেশন করল মুরলীধর। চা ও খাবার খেয়ে আমরা ফিরে এলাম আমাদের ঘরে। আসার সময় সুমনকে ভরসা দিলেন স্বামীজী, "তুই ভাবিস নে বেটী, তোদের সঙ্গে আমিও কাল গোমুখী যাব। ভাল্লুকের থাবার যন্ত্রণা কমে যাবে কাল সকালের মধ্যে।"

পাহাড়ী ওষুধ ও চায়ের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে স্বামীজীর এ আশ্বাসকে বিশ্বাস করব বৈকি।

ঘরে ঢুকেই আমাকে সাবধান করে সুমন, "বারান্দার দরজাটা ভাল করে বন্ধ করবে।"

"কেন, ভাল্লুক আসবে?"

লজ্জা পায় সুমন। কিন্তু ধরা দিতে চায় না। বলে, "এলে আমার কি? তোমাকে লড়তে হবে। আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে সে লড়াই দেখব।"

"যদি হেরে যাই? ভাল্লুকটা যদি আমাকে ঝাপটে ধরে পিষে…"

আমার মুখ চেপে ধরে শাসনের স্বরে বলে, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ওসব অলুক্ষণে কথা বললে!"

ওর হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলি, "তা হলে নীরব দর্শক হবে না তুমি? ঐ লাঠিখানা নিয়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে!"

"হ্যাঁ।"

শুধু ভাল্লুকের বেলায় নয়, জীবন-সংগ্রামের প্রতি পদক্ষেপে তোমাদের সাহায্য অপরিহার্য। তোমরা যে আমাদের জীবন-রথের সারথি। আমাদের শক্তি।

নিদ্রামগ্ন প্রকৃতির কোলে জেগে আছি একা। সুমন ও রঞ্জন বোধ হয় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস। তৃপ্তি আর প্রশান্তির নিঃশ্বাস। বাইরে তুষার-ঝরা-শীত। গঙ্গার জল জমছে। বরফের শিব-লিঙ্গের মাথায় ঝরা জলের ধারাও বুঝি বা জমে গেছে। ঘরের মধ্যে আগুন জলছে। সেই অগ্নিশিখায় সুমনকে দেখছি। আলো না থাকলেও কি দেখতে পেতাম ওকে? আমার মনের আলোয় কি আলো করে নিতে পারতাম ওর মুখখানি? কিন্তু অগ্নির তো কোন প্রয়োজন নেই আমাদের জীবনে। তা হলে এই লেলিহান শিখা জলছে কেন? ও আগুন যে আমাদের দেহের আগুনকে পুড়িয়ে ফেলছে। মনের আলোকে ম্লান করে দিতে চাইছে। কিন্তু সুমনের যদি প্রয়োজন থাকে ঐ আগুনের?

ভুল—ভুল ভাবছি আমি। হঠাৎ পাশ ফেরে সুমন। বলে, "আগুনটা একটু কমিয়ে দাও না। এত আলো ভালো লাগছে না।"

সুমনের জীবনেও প্রয়োজন নেই ঐ অগ্নিশিখার। বুঝিবা সে তার জীবনের আলো খুঁজে পেয়েছে।

॥ ছেচল্লিশ ॥

আগুন নিভে গেছে। ঘন আঁধারে ঘেরা ঘর। রাত পোহাল কিনা বলতে পারছি না। আবার শব্দ হল। তা হলে ভুল শুনি নি। কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। উঠে বসলাম। টর্চটা জ্বাললাম। রঞ্জন উঠে বসল। সুমনেরও ঘুম ভেঙে গেল, "ভোর হয়েছে নাকি?"

"বুঝতে পারছি না। ঘড়িটা দেখো দেখি।"

ঘড়ির দিকে নজর দিয়েই আঁতকে ওঠে সুমন, "এ যে দেখছি পাঁচটা বেজে গেছে। ছিঃ ছিঃ! স্বামীজী না জানি কি ভাবছেন?" উঠে দাঁড়ায় সে। অবিন্যস্ত শাড়িটা যথাসাধ্য ঠিকঠাক করে নেয়। আমার পেছনে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

স্বামী তত্ত্ববোধ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দরজা খুলতেই বললেন, "বেটা, এবারে রওনা দিতে হবে।"

স্বামীজীর ঘরে এসে দেখি মুরলীধর তৈরী হয়ে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। আমাদের তাড়া দেয়, "চট্ করে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। আর দেরি করলে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা যাবে না।"

কেট্‌লি থেকে গরম জল নিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম। স্বামীজী ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছেন। অপরিসীম উৎসাহ। বোঝাই যায় না, কাল রাতে ভাল্লুকের কবলে পড়েছিলেন!

যাত্রা শুরু হল। আজ স্বামীজী আমাদের কর্ণধার। ওপারে পাহাড়ের কোলে বরফের শিবলিঙ্গ। পাহাড়ের গা বেয়ে অবিশ্রাম ধারায় জল পড়ছে! স্বামী তত্ত্ববোধ বলেছেন, সারা বছর জল পড়ে শিবের মাথায়। এত শীতেও জল জমছে না। শুধু শিবের মাথায় ঐ ধারা নয়, গঙ্গাও এখানে সতত-সঞ্চারিণী স্ফটিক-স্বচ্ছ জলধারায় পরিণত।

কয়েকটি হরিণ শিবলিঙ্গের পাশ কাটিয়ে নির্ভয়ে গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে। তৃষ্ণার্ত ওরা। এসেছে গঙ্গার স্বচ্ছ-শীতল বারিতে তৃষ্ণা মেটাতে। তৃষিত আমরা। চলেছি মৃত্যুশীতল গোমুখীতে গঙ্গার উৎস দর্শনে।

ভুজগাছে ঘেরা চিরবাস আর দেখা যাচ্ছে না। প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরে বোঝাই পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছি আমরা। কোন কোন পাথরের ওপরে উঠে লাফ দিয়ে ওপারে নামতে হচ্ছে। কখনও বা দুই পাথরের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। এতক্ষণ মুরলীধর নির্বাক ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "সামনেই গিলা পাহাড়। সাবধানে চলবেন।"

সাবধানেই চলেছি। এর বেশী সাবধানতা মানুষের অসাধ্য। তবু আরও মনোযোগী হয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলতে শুরু করি।

গিলা পাহাড় দৈর্ঘ্যে বিশাল নয়। তা হলেও আধ ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছে। গিলা পাহাড় পেরিয়ে আবার তেমনি বড় বড় পাথর। পাথর আর বরফ। তার পর আবার গিলা পাহাড়। তেমনি লাঠি ঠুকে ঠুকে, একের অনেক পেছনে পেছনে সারি বেঁধে এগিয়ে চলা।

পথের কষ্ট ক্রমেই বাড়ছে। আর বুঝি চলতে পারি না।

তবুও চলতে হবে। এখন আর ভাববারও সময় নেই। চল—প্রাণপণে এগিয়ে চল শুধু।

ভুজবাসা চিরবাসার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। উচ্চতা ১২,৪৪০ ফুট। চিরবাসা থেকে ৬১০ ফুট ওপরে উঠেছি। গোমুখী এখান থেকেও ৩৩০ ফুট উঁচু। অল্প একটু সমতল জায়গা। কয়েকটা ভূর্জগাছ ও একটা গুহা। স্বামী তত্ত্ববোধ জানালেন, "ঐ গুহায় একজন সন্ন্যাসী থাকতেন। কয়েক বছর আগে তুষারপাতে মারা গেছেন।"

এসব জেনেও তিনি রয়েছেন এখানে! মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ।

ভূর্জগাছের শুকনো কয়েকটা ডাল কুড়িয়ে আগুন জ্বালালাম। পাথরে ঠোকর খেতে খেতে আমার বাঁ পায়ের জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকে বরফ ঢুকছিল জুতোর ভেতরে। পা-টা অবশ হয়ে গেছে। হাঁটুটিও কর্মহীন হবার চেষ্টায় ছিল। বড়ই আরাম লাগছে আগুনের শিখার ওপর পা রাখতে। স্বামীজী নিষেধ করলেন, বললেন, "এখন ভালই লাগবে। পুড়ে গেলেও টের পাবি না—পরে ভোগাবে।"

ধর্মশালার কেটলিটা নিয়ে এসেছি। জংলী চা ও চিনি এনেছেন স্বামীজী। মুরলীধরকে গঙ্গা থেকে জল আনতে বলা হল। মুরলীধর গাইড। হিসেব করে পথ চলে। জলের বদলে খানিকটা বরফ কেটলিতে ঢুকিয়ে আগুনে চাপাতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের জন্ত পেরে উঠল না। শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় নেমে জল নিয়ে এল।

জুতোর ছেঁড়া জায়গাটা ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আবার চলতে শুরু করেছি স্বামীজী ভূর্জগাছের কয়েকটি শুকনো ডাল নিয়েছেন। বলেছেন, "গোমুখীতে আগুন জ্বালাব, স্নানের পর চা খাবি। হাত-পা সেঁকবি।"

যেন চড়ুইভাতি করতে চলেছি।

থামতে হল। কাঠের বোঝা মাটিতে রেখে স্বামীজী তরতর করে নেমে গেলেন গঙ্গায়। খরস্রোতে কোথা থেকে একখানা তক্তা ভেসে এসে তীরের কাছে অভদ্রের মত পড়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড পাথরের পেছনে আটকে গেছে। স্রোতের তালে তালে ফুলে ফুলে উঠছে। যেন অন্যায়ভাবে তার ভাসার অধিকার খর্ব করার জন্তে শাসাচ্ছে ঐ পাথরখানাকে। কিন্তু ফল হচ্ছে না কোন। নাছোড়বান্দা পাথর তাকে ভাসতে দিতে নারাজ। স্বামী তত্ত্ববোধও পাথরের দলে। কাঠখানাকে টেনেটুনে পারে তুলে ফেললেন। কিছুদূর বয়ে এনে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটা জায়গায় রেখে উঠে এলেন আমাদের কাছে। জ্বালানি কাঠের পরিত্যক্ত বোঝাটি কাঁধে তুলে বললেন, "চল্।"

"তক্তাখানা তুলে রেখে এলেন কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"ফেরার পথে চিরবাসায় নিয়ে যাব। মাটিতে শুতে বড় কষ্ট হয় যাত্রীদের।"

দুর্গম পথ। নিজেদেরই ফেরার কোন নিশ্চয়তা নেই। ওয়াটার-বটল বয়ে নিয়ে যেতেই কষ্ট হচ্ছে আমার। আর ঐ বৃদ্ধ কিনা অত বড় তক্তাখানা বয়ে নিয়ে যাবেন! তাও নিজের প্রয়োজনে নয়? যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করতে—'When religion is made a science there is nothing more intricate, when it is made a duty there is nothing more easy.'

গঙ্গা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। আমাদের ঘুরতে হল ডানদিকে। বাঁকের মুখে উল্টো দিকে বিশাল একটা মসৃণ কালো পাহাড। স্লেট পাথরের পাহাড। ভূজবাসা অদৃশ্য হয়েছে অনেকক্ষণ। আবার শুরু হয়েছে বড় বড় পাথর আর বরফ। শুধু পাথরের ফাঁক নয়, মাঝে মাঝে অনেকটা এলাকা জুড়ে বরফের রাজ্য।

একটা রুদ্ধ গর্জন ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে তুলছে। দাঁডিয়ে পডলাম। বায়নোকুলার দিয়ে দেখলাম, হঠাৎ ছোট ছোট পাথরগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। বড পাথরেরাও যেন নডে উঠতে চাইছে। মুরলীধর আমার হাত থেকে বায়নোকুলারটা নিল। কিছুক্ষণ দেখল। তারপর চীৎকার করে উঠল, "আঁধি! এইদিকে আসছে—হুঁশিয়ার!"

হুঁশিয়ার হব কেমন করে? মুরলীধর উপায় বাতলে দেয়, "ছুটে চলুন ঐ গুহার মধ্যে।"

গুহা! সত্যিই তো। কয়েক হাত দূরে যেন আমাদের আশ্রয় দেবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে একটা গুহা।

হোঁচট খেয়ে, গড়িয়ে পড়ে, কোন রকমে ভেতরে ঢুকলাম। মুরলীধরের কথামত মুখ গুঁজে, চোখ বুজে, কান ঢেকে শুয়ে পড়লাম সকলে। একটু বাদেই বাইরে শুরু হল তাণ্ডব। কয়েকটি মেকানাইজ্‌ড্‌ ডিভিসন যেন বিজয় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আমার একখানি হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে সুমন। ওর হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এ অবস্থার মধ্যেও হাসি পাচ্ছে। বাইরে যে দানবীয় শক্তির জয়োল্লাস, তার তুলনায় আমার শক্তি কতটুকু! তবু আমার স্পর্শ যেন ওর কাঁপুনি কমাচ্ছে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে সুমন।

একটানা গম্ভীর গর্জনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। শতাধিক দূরপাল্লার কামান যেন গর্জে উঠল একসঙ্গে। মহাসমর শুরু হয়েছে। পবন বুঝি আক্রমণ করেছে কৈলাস। রাগ হল মুরলীধরের ওপর। এত কাছে থেকেও যুদ্ধটা দেখা হল না! প্রাণের মায়ায় গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছি।

চোখ-কান বুজে পড়ে আছি মড়ার মত। সুযোগ পেয়েও যদি এ মহাসমরের সাক্ষী না হতে পারি, তা হলে এ ব্যর্থ জীবন রেখে লাভ কি? মুরলীধরের নিষেধ অমান্য করে মাথা তুলে তাকালাম। একটা অদৃশ্য মহাশক্তি এসে আঘাত করল স্লেট পাহাড়কে। চড়্ চড়্ করে ফেটে যাচ্ছে পাহাড়টা। পাতলা চোকলার মত কালো কালো পাথরের টুকরো ঘুড়ির মত যেন শূন্যে উড়ছে। পাথর উড়ছে, নুড়ি উড়ছে, বরফ উড়ছে। গুহাটাও যেন নড়ে উঠল। আমরাও কি উড়ব ঐ মহাশূন্যে? উড়ে যাব চন্দ্রলোকে কিংবা আরও দূরে? দূরে বহুদূরে? সেখানেও সুমন আমার সঙ্গে থাকবে কি?

॥ সাতচল্লিশ ॥

মুরলীধরের ডাকে সম্বিৎ ফিরে এল। আপনা থেকেই কখন চেতনা হারিয়েছিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না।

"আঁধি থেমে গেছে।" মুরলীধর ঘোষণা করে, "চলুন এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।"

শান্ত সুন্দর নির্জন প্রকৃতি। একটু আগেই এখানে যে এত বড় একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। সেই বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে চলতে হচ্ছে। পাথরগুলো ঝড়ের দাপটে হয়তো একটু এদিক ওদিক সরে গেছে, কিন্তু তাতে আমাদের কোন সুবিধা হয় নি—পথ পরিষ্কার হয় নি।

পাথরের আয়তন ছোট হয়েছে। বরফের ঘনত্ব বেড়েছে। আমাদের পায়ের নীচে বরফ। দূরে আকাশের গায়ে বরফ। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফ। অন্তহীন সাদার মাঝে ভগ্নদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে স্লেট পাহাড়—সাদার সীমারেখা।

এতদিন জানতাম সাদা একটা রং। আজ দেখছি সাদার মধ্যেও রকমফের আছে। কোন পাহাড় দুধলো সাদা। কোনটা সেলোফেন কাগজের মত স্বচ্ছ সাদা। কোনটি বা রাংতার মত উজ্জ্বল ঘন সাদা।

অস্থির আকাশ। কখনও মেঘে ঢাকা। মেঘের ফাটল দিয়ে শত শত সূর্যরশ্মি সহস্র রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে পাহাড়গুলোকে। কোন পাহাড়ে সে আলো হচ্ছে প্রতিফলিত – কোন পাহাড়ে প্রতিসরিত। পাহাড়ের মাথার ঠিক ওপরেও আকাশের গায়ে চলেছে রঙের খেলা। বরফের ওপরে সূর্যরশ্মি পড়ে তৈরি হচ্ছে মেঘ। কম্পমান একটা সাদা ধোঁয়ার প্রবাহ গিয়ে মিলেছে আকাশের গায়ে। প্রতিসরিত

আলোকরশ্মি সৃষ্টি করেছে আকাশজোড়া এক রামধনু। তার আলিঙ্গন থেকে গঙ্গাও বাদ পড়ে নি।

এ দৃশ্য কিন্তু স্থায়ী নয়। কিছুই বোধ করি স্থায়ী নয় এখানে। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি তার রূপ পাল্টাচ্ছে। সাদার উজ্জ্বলতা বাড়ছে-কমছে। সূর্যরশ্মির দল মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিচ্ছে। কখনও বা দিক পরিবর্তন করছে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হচ্ছে। একটু আগে যে দিকটা লাল ছিল, এখন সেখানে নীলের ছড়াছড়ি। নীলের দিকটা আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দিগন্তবিস্তৃত এক রঙ্গমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশ বাতাস মেঘ পাহাড় আর গঙ্গা—অভিনেতা ও অভিনেত্রী। মহাশূন্যের পরপারে আমাদের অগোচরে বসে যে আলোক-শিল্পী ক্রমাগত এই আলোর রঙ বদলাচ্ছেন, তাঁকে কি কোন দিন কেউ দেখতে পেয়েছে? দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে তিনি কি কখনও আবির্ভূত হবেন এই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে? কে যেন কানে কানে বলল—আবির্ভূত হবে কি, সে-ই তো প্রকৃতি।—প্রকৃতি! একটু আগে যে মহাশক্তির দানবীয় অগ্রগতিকে বুক ফুলিয়ে বাধা দিয়েছিল ঐ স্লেট পাহাড়, সেও তো প্রকৃতি। কিন্তু সে যে ধ্বংসের বার্তা এনেছিল বহন করে! অসুররূপী সেই প্রলয় আর মাতৃরূপিণী এই অপার স্নিগ্ধ নিখিল চরাচর—সবই কি তাঁর রূপ? কোথাও লেলিহান মরুরূপিণী, কোথাও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। কোথাও নিশ্চল অসীম পর্বতমালা, কোথাও আবহমান কাল থেকে প্রবহমাণ মহাসমুদ্র।

সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে গঙ্গা। কিন্তু ঘুমের ঘোরেও শব্দহীন হয় নি। ওপরে বরফের আস্তরণ। বরফের নীচে কুলকুল করে জল বয়ে চলেছে। চতুর্দিকে বরফের মধ্যে গঙ্গার কোন পৃথক সত্তা নেই। শব্দহীন হলে তাকে চেনাই যেত না। গোমুখী দর্শনও হয়ে উঠত না ভাগ্যে। ঐ শব্দই যাত্রীদের পথের নিশানা।

সাবধান করে মুরলীধর, "কালো চশমা এক মুহূর্তের জন্যও খুলবেন না। খালি চোখে সইতে পারবেন না এত আলো—অন্ধ হয়ে যাবেন।"

গঙ্গা আবার ডাইনে বাঁক নিল। এবারে সোজা উত্তরে চলেছি। মুরলীধর আবার সাবধান করে—প্রতি পদক্ষেপেই লাঠি ঠুকে চলতে হবে। মাঝে মাঝেই নাকি গভীর খাদ ও নালা আছে। বরফ পড়ে ওপরটা ঢেকে যায়। সমতল হয়ে মিশে থাকে চারদিকের পাথরের সঙ্গে। সে সব জায়গায় পা পড়লেই অতল সমাধি। যে কোন জায়গাতেই নরম বরফের ওপর পা দিলে বিপদ ঘটতে পারে। একাধিকবার

হাঁটু অবধি তলিয়ে গেছে। একে অন্যকে টেনে তুলেছি। ডুবে যাওয়া পা-খানি ঝেড়েঝুড়ে বরফমুক্ত করে আবার এগিয়ে চলেছি। তা হলেও গতকালের মত শ্রান্তিবোধ করছি না। গিলা পাহাড়গুলো অবশ্য কালকের মত অত বিশাল আর মারাত্মক নয়। কিন্তু আজকের পথকেও সহজ বলা যায় না। অথচ স্বামীজী বললেন, "এ পথের অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে প্রথম দিনে—গঙ্গোত্রী ও চিরবাসার মধ্যে। যদিও যাত্রীরা প্রথম দিনে ন মাইল, দ্বিতীয় দিনে আঠারো মাইল পথ ভাঙে। দ্বিতীয় দিনে যাত্রীরা অভিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় বলেই এমনটি হয়।"

কথাটা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তা হলেও স্বামীজীর দিকে নজর দিতে গিয়ে আমিই দুর্ঘটনায় পড়ে গেলাম। কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গিয়ে স্থির হয়েছি। ফলে এযাত্রা বেঁচে গেলাম। শুধু আমি নয় সুমনও। ডুবতে দেখে সুমন আমাকে টেনে ধরেছিল। ভাগ্যিস খাদটা গভীর নয়, আর সুমনের দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটার বরফ শক্ত ছিল! কিন্তু কাঁধ থেকে পড়ে গেল টর্চটা। ডিগবাজী খেয়ে গড়াতে গড়াতে গঙ্গার কাছে একখানা পাথরের পাশে গিয়ে আটকে রইল। এত নীচে যে তুলে আনাও অসম্ভব। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবীজীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলাম না। ঐ টর্চের মধ্যে আমি তাঁর স্নেহের পরশ পেতাম। তিনি যেমন আমার মধ্যে খুঁজে পেতেন অকালে সর্পাঘাতে মৃত তাঁর ছোট ভাইটিকে।

স্বামীজী এসে ছাড়িয়ে নিলেন সুমনকে। বললেন, "তীর্থের পথে অত উতলা হলে চলে না বেটী। আর একটু হলে দুজনেরই মৃত্যু ডেকে আনতিস।"

মুরলীধর এসে টেনে তোলে আমাকে। ডান পা-টায় বেশ চোট লেগেছে। খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে। সুমন শঙ্কাকুল নয়নে তাকাচ্ছে আমার পায়ের দিকে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করছে না। পাছে আবার প্রমাণ হয়ে যায় সে উতলা হয়েছে।

"গঙ্গা মায়ীকি জয়!" হঠাৎ মুরলীধর চীৎকার করে ওঠে।

সামনে তাকাই। পাথর আর বরফে ছাওয়া অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি। সমতল ভূমির শেষে বরফে ঢাকা খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের পায়ের কাছে দুটি কালো বিন্দু। স্বামীজী বললেন, "ঐ কালো বিন্দু দুটির ডানদিকেরটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। বাঁদিকেরটা পুরনো গোমুখী।"

"হ্যাঁ, অনেকটা গরুর মুখের মতই তো। বিন্দু দুটি যেন নাসিকা-রন্ধ্র।"

সুমন উল্লসিত হয়ে ওঠে। উল্লসিত আমরাও। মনস্কামনা প্রায় সিদ্ধপ্রায়। গিরিতীর্থ গোমুখী দৃষ্টির মধ্যে। পারব না বলে যাঁরা বাধা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি অনুকম্পা হচ্ছে। অসম্ভব নয় বলে যাঁরা উৎসাহ যুগিয়েছেন, সফলকাম হব বলে

যাঁরা আশীর্বাদ করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠছে।

ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, একটা বরফের ঝকঝকে পাহাড়। যতদূর দেখা যায়, ওর রূপালী দেহ উঁচু হয়ে আছে আপন মহিমায়। মনে হচ্ছে শ্রান্ত হয়ে সুবিশাল দেহটিকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে অন্তিম শয়নে। আর কোন দিন উঠে দাঁড়াবে না। দাঁড়ালে বোধ করি সূর্যদেবের অনুরোধে অগস্ত্যমুনিকে ফিরে আসতে হবে এখানে।

"ওটা কি পাহাড় ?" প্রশ্ন করি স্বামীজীকে।

"ভৃগুপন্থ। ওর সোজা পূবে শিবলিঙ্গ—হিমালয়ের পরম বিস্ময়, দেখা যাবে একটু বাদে। তার পাদদেশেই তপোবন।"

"তপোবন ?" বিস্মিত হই, "তা হলে তো গাছপালা আছে সেখানে ?"

"তা আছে বই কি। তবে বড় গাছপালা নয়। ঘাস কাঁটাঝোপ আর ছোট ছোট ফুল। নানারকমের ফুল।"

আশ্চর্য। বরফের মধ্যে ঐ সব ঘাস বেঁচে আছে কেমন করে ? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর জেনে কি হবে ? শুধু এটুকু জানা-ই কি যথেষ্ট নয় যে ঐ হিমবাহের রাজ্যেও ঘাস আছে ফুল আছে, আর—আর কি আছে ?

"আপনি গেছেন ওখানে ?" সুমন স্বামীজীকে প্রশ্ন করে।

হেসে ফেলেন স্বামীজী। বলেন, "হ্যাঁ, দুজন সাধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক বার। থেকেও ছিলাম এক রাত।

"কতক্ষণ লাগে যেতে ?"

"গোমুখী থেকে রওনা হয়ে আমাদের তিন-চার ঘণ্টা লেগেছিল। কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করছিস কেন ? যাবি নাকি ?"

"হ্যাঁ। আর তো কোনদিন জীবনে আসা হবে না।" সুমন যুক্তি দেখায়।

"কিন্তু তা হলে যে চিরবাসায় ফিরতে রাত হবে।"

"হোক গে।" বলেই আমার মুখের দিকে তাকায় সুমন।

হেসে বলি, "আমার আপত্তি নেই। রঞ্জনকে জিজ্ঞেস কর, তার মত আছে কিনা।"

"তপোবনে যাবার সুযোগ ছেড়ে দেবো ? আমার সম্বন্ধে তোমার এরকম ধারণা হল কেমন করে ?"

রঞ্জনের জবাবে সুমন খুশি হয়। আনন্দের আতিশয্যে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। বাধা দিয়ে মুরলীধর বলে, "হুঁশিয়ার মাইজী, লাঠি ঠুকে ঠুকে চলবেন। মাঝে মাঝে নরম বরফ আছে।"

॥ আটচল্লিশ ॥

নরম মিষ্টি একটা গন্ধ বিহ্বল করে তুলেছে। চতুর্দিকে বরফ—গন্ধটা আসছে কোথা থেকে ? সুমন স্বামীজীর দিকে তাকায়।

"ভগবানের লীলা বেটা। তাঁরই সব কারসাজি। কারণ খুঁজতে গেলে গন্ধটা উপভোগ করতে পারবি না মনেপ্রাণে।"

সেই ভাল। মানুষের বিচারবুদ্ধি যেখানে ব্যর্থ, সেখানে ঈশ্বরে নির্ভর করে নীরবে থাকাতেই পরম প্রশান্তি।

বাঁদিকের কালো বিন্দুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডানদিকেরটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

একটা ঝরনা। লুব্ধ হলাম। সকলেই তৃষ্ণার্ত। বহুক্ষণ থেকে বরফ চিবিয়ে পিপাসা মেটাচ্ছি। জল মুখে দিয়ে অবাক হই। মনে হচ্ছে যেন গোলাপজল। সবাই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছি। হেসে ফেলেন স্বামীজী। বলেন, "বেটা, আগেই বলেছি—কারণ খুঁজতে যাবি না। শুধু জেনে রাখ, এইরকম বরফাবৃত অঞ্চলে গোলাপ জন্মাতে পারে না।"

কে তবে গোলাপের সুবাস মিশিয়ে দিল এই ঝরনার স্বচ্ছ শীতল সুমিষ্ট ধারায় ? যাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি—এ কি তাঁরই লীলা ?

> "Into our hearts high yearnings
> Come yelling and surging in
> Come from the mystic ocean
> Whose rim no foot has trod
> Some of us call it longing
> And others call it God."

আশ্চর্য হচ্ছি স্বামীজীকে দেখে। আমাদের হাতে দস্তানা, পায়ে গরম কাপড়ের পট্টি মোজা ও হকি-শু। তাতেও হাত-পা অবশ হয়ে গেছে শীতে। আর স্বামীজী নগ্নপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ থামলেন তিনি। বরফের ওপর ফুটে থাকা নানারকমের কতকগুলো ফুল দেখিয়ে বললেন, "দেখ্‌ কি সুন্দর ফুল ফোটে মা গঙ্গার দেশে।" তুলে নিলেন কয়েকটি। বললেন, "গোমুখীতে গঙ্গামায়ীকে অঞ্জলি দেব।"

সহ্যাতীত শীত। গলা থেকে শব্দ বেরোচ্ছে না। কথা জমে যাক, পরে ফুটবে'খন। কিন্তু আমরা তো জমে যাব না ? স্বামীজীর দিকে তাকাই ভয়ে ভয়ে। স্বামীজী ভরসা দেন, "প্রায় এসে গেছি।"

কালো বিন্দুটাকে গুহা বলে চেনা যাচ্ছে এখন। স্নিগ্ধ স্বচ্ছ উজ্জ্বল গঙ্গা শিশুর চাপল্য নিয়ে প্রথম মাটিতে পা দিয়েছে।

একটি প্রস্তরময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। বরফের পরিমাণ কমে এসেছে। বরফ-গলা জল অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রান্তরকে সিক্ত করে মিলিত হচ্ছে গঙ্গায়।

প্রান্তর পেরিয়ে অসংখ্য অতিকায় পাথরের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। মুরলীধরের মতে অবশ্য এইটেই শেষ বাধা। একখানি মসৃণ পাথরের ওপর মুরলীধর উঠে গেল। একে একে টেনে তুলল আমাদের সবাইকে—অতি সন্তর্পণে। সেই পাথর থেকে লাফিয়ে আর একটা পাথরে এলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচে। একটা গভীর ফাটলের ওপর দিয়ে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে কোনরকমে এসে পৌঁছলাম এপাশে। এবারে আর পাথরে চাপতে হল না। দুই পাথরের মাঝে নিজেকে গলিয়ে দেবার মত একটু ফাঁক পাওয়া গেল। এমনিভাবে প্রায় আধ ঘণ্টায় আধ মাইল অতিক্রম করে গঙ্গার তীরে এসে বসা গেল। ইচ্ছে ছিল গুহার পাশে গিয়ে বিশ্রাম নেব, কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনে আর এগোতে ভরসা হল না। হিমবাহের বরফ গলছে, আর নানা আকারের পাথর আলগা হয়ে মাঝে মাঝে নিচে পড়ছে। ওর যে কোন একখানা মাথায় পড়লে ভবলীলা সাঙ্গ হতে দেরি হবে না।

সামনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। আপাতদৃষ্টিতে প্রকাণ্ড একটা পাথর ও মাটি মেশানো বরফের দেয়াল : দুই পাহাড়ের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের অংশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে নিচে পড়ছে। কয়েকটি জলের রেখা পাহাড় থেকে নেমে এসে পাথর ডিঙিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

হিমবাহ-নিঃসৃত জলধারা ঐ গুহামুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে গঙ্গারূপে। এই হিমবাহ অঞ্চলের অপর দুই প্রান্ত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কেদারনাথের মন্দাকিনী আর বদ্রীনাথের অলকানন্দা : একই হিমবাহ অঞ্চলের তিন দিকে তিন তীর্থ।

মুরলীধর আগুন জ্বাললো। মনের আনন্দে হাত-পা সেঁকে নিলাম সবাই। কথা বলতে পারছি। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠছি। কয়েকখানা ছবি নিলাম। সুমন ও আমার ছবি নিল রঞ্জন। গোমুখীর সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ আর হয়ত কোনদিন আসবে না জীবনে। অনেক কাণ্ড করে গোমুখী এসেছে সুমন। ভাগ্যিতে যমুনোত্রী পৌঁছেছে যে রুগ্‌ণা সুমন, আমার জন্য জীবন তুচ্ছ করে পায়ে হেঁটে গোমুখী এসেছে সে।

স্নান না করলে নাকি তীর্থদর্শনের ফল হয় না। রঞ্জনকে নিয়ে স্বামীজী স্নান করতে চলে গেলেন। হাতে নিয়ে গেলেন পথ থেকে তুলে আনা ফুল কটি। তিনি

শুধু স্নানই করবেন না, পুষ্পাঞ্জলি দেবেন আর বলবেন—

ত্বমন্তো লোকনামাখিলদুরিতাস্থেব দহসি,
প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়সি সর্কোপরি নতান্ ॥
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোজনয়সি মুরারাতি-নিবহান্,
অহো মাতগঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্ ॥

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি একটা বেজে গেছে। গ্রীষ্ম-দগ্ধ কলকাতার রাস্তায় এখন পিচ গলছে। এখানে বরফ গলছে। তা হলেও শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছি বলতে পারি না। এই তো কলকাতার ছেলে রঞ্জন, খালিগায়ে স্বামীজীর সঙ্গে স্নান করতে গেল। এরপরে আমাদের পালা।

"আমাদের সঙ্গে মুরলীধরও স্নান করতে যাবে নাকি ?"

মুরলীধরের দিকে ফিরে তাকাই। না, শোনে নি—সে বেশ দূরে। একখানি পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। সুমনকে বলি, "যেতে পারে।"

"না।"

"কেন ?"

"ধ্যেৎ, কিছু যদি বুঝতে পার খুলে না বললে !"

"তবে খুলেই বল।"

"সব কথা বুঝি খুলে বলা যায় ?"

একটু চুপ করে থেকে বলি, "একটা কথা কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম।"

"কি ?"

"তুমি যে আমার জন্য গোমুখী আসবে।"

"ছাই বুঝেছিলে। বুঝলে কি আর ঝালা থেকে ওভাবে চলে আসতে পারতে ?"

"আচ্ছা, আর যদি দেখা না হত ?"

"অসম্ভব। আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে না।"

"কেন ?"

"ভগবান আছেন বলে।"

"আমি যদি আর ভাল না হয়ে উঠতাম ?"

"ছিঃ !" একখানা হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে সুমন, "ও কথা বলতে নেই।"

"বললে কি হয় ?"

"ভগবান রুষ্ট হন।"

চতুর্দিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গ। আকাশে সূর্যের বর্ণাঢ্য আলোকসম্ভার। সে আলোর স্পর্শ লেগে পাড়াড়ের মাথায় রঙের বন্যা নেমেছে। মুঠো মুঠো সোনা কে যেন দিয়েছে ছড়িয়ে। নিচের জগতে সোনা নিয়ে কত অশান্তি। আর ঐ সোনা আমাদের মন ভরে তুলেছে পরম প্রশান্তিতে। ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে বলেই হয়ত।

স্বামীজীর সঙ্গে রঞ্জন ফিরে এল স্নান সেরে। আমার কানে কানে সুমন বলে, "মুরলীধরকে সঙ্গে নিও না যেন।"

এই সহজ কথাটা তখন বুঝতে পারি নি বলে লজ্জা পেলাম। কিন্তু আমার কাছে কি ওর লজ্জা করবে না ?

গুহামুখ দিয়ে বাঁধন-ছেঁড়া গঙ্গা বেরিয়ে আসছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট বড় পাথর অনবরত পড়ছে ওপর থেকে। তারই মাঝে সুযোগ বুঝে হামাগুড়ি দিয়ে বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে আমরা দুজনে নেমে এলাম গুহার কাছে। মাথার ওপরে আকাশ সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। গুহার ভেতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। ভেতরে তাকাতে ভয় হয়—আনন্দও হয়। এগিয়ে যাই। কল্ কল্ করে জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে আসছে বেরিয়ে। স্বামীজী বলেন, কৈলাস হতে—ভগীরথের আমল থেকে।

আধহাঁটু জল। স্নান সারা হল। বাহ্যিক আড়ম্বরহীন হলেও আজকের এ স্নান আমাদের জীবনের স্মরণীয়তম অবগাহন।

শীত লাগছে না আমার। শীত লাগছে না সুমনের। বরফের মধ্যে বরফগলা জলে স্নান করেও আরাম বোধ করছি। শান্তি—শান্তিবারি সিঞ্চন করছি সারা দেহে। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে আমার সত্তা। মন ভেসে বেড়াচ্ছে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। আকাশের কোণে কোণে গঙ্গার এই বিগলিত করুণাধারায়।

বিহ্বল হয়ে দেখছি। হঠাৎ একটা টান মেরে আমাকে কাছে টেনে নিল সুমন। কিছু বোঝার আগেই দেখি যেখানে দাঁড়িয়ে কল্পনার জাল বুনছিলাম, ঠিক সেখানে প্রকাণ্ড একটা পাথর ওপর থেকে দুম্ করে পড়ে জল ছিটকে উঠল। আবার ভিজে গেলাম আমরা দুজনে। গুহার ভেতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে হয়ে শব্দটা মিলিয়ে গেল। আমাকে ধরে তখনও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সুমন। ওর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। ও না থাকলে ঐ প্রস্তর-পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বরও এ পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যেত চিরদিনের মত।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

পেছনে তাকাতে নেই। তবু মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছি। স্বেচ্ছায় নয়—কেউ যেন আকর্ষণ করছে। তাকাচ্ছি গোমুখীর দিকে। ফিরে চলেছি আপন গৃহ-কোণে। মানুষের অগোচরে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে যে শান্তি ঢেলে রেখেছেন, তার অনেকখানি নিয়ে চলেছি মনে ভরে। তবু মন এত উতলা হচ্ছে কেন? ক্ষণিকের দেখা ঐ গোমুখী আমাকে পিছু টানছে কি? কিন্তু কেন? সে কি জানে না, তাকে ফেলে এলেও আমি তার আকর্ষণ অনুভব করছি? আমরণ করব। ঐ তো গঙ্গা আমার সঙ্গে রয়েছে। এই গঙ্গার করুণাধারায় সঞ্জীবিত বাংলার বুকে ফিরে যাচ্ছি আমি। জীবনের শেষদিনটিতে আমার আত্মা যখন দেহমুক্ত হবে, তখনও গঙ্গার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচবে না। এই পতিতপাবনী গঙ্গার তীরেই আমার দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে।

থমকে দাঁড়াল সুমন। বলল, "থাক গে, যাব না তপোবনে।"

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। সে সময় সায় দিলেও আমল দিই নি তেমন। নেহাৎ কথার কথা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। তাহলেও সুমনকে বলি, "তা হয় না। মনে মনে যখন ঠিক করেছ, না গিয়ে উপায় নেই। তীর্থের পথ—যা মনস্থ করবে তাই করতে হবে।"

"তা হলে উপায়?" অসহায় কণ্ঠে সুমন বলে, "কিন্তু আমার যে যেতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।"

"ভয়!" অবাক হই, "ভয় কিসের?"

"কি জানি, বড় ভয় করছে। ইচ্ছে করছে ফিরে যাই তাড়াতাড়ি।"

পুণ্যসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত। ঘরের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে ঘরমুখো নারীমন। আর ভাল লাগছে না যাযাবর জীবন। পথের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলতে চাইছে। এখন ঠাট্টা করা সমীচীন হবে না। বলি, "বেশ তো, না হয় যাবে না। তপোবন তো তীর্থক্ষেত্র নয়—মনস্থ করে ওখানে না গেলেও কোন পাপ হয় না।"

"হয় না? ঠিক তো?"

আমাদের দাঁড়াতে বলে মুরলীধর নিচে নামছে কেন? নেমে গেল অনেক নিচে। গঙ্গার কাছে। নিচু হয়ে কি যেন একটা তুলে নিল হাতে। বাইনোকুলার চোখে লাগাই। টর্চ! হ্যাঁ, আমার টর্চটা কুড়িয়ে পেয়েছে মুরলীধর। ভাবীজীর উপহার। কেদার-বদ্রী যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী পথের বিশ্বস্ত সহচর আমার। আবার ফিরে পেয়েছি। তবে বুঝি কিছুই হারায় না পথে!

লাঠি ঠুকে বরফ পরীক্ষা করতে করতে মুরলীধর চলেছে সবার আগে। ওর প্রদর্শিত জায়গায় পা ফেলে ফেলে অতি সন্তর্পণে নামছি আমরা। রঞ্জন সুমন ও আমি। আমার পেছনে স্বামীজী। মাঝে মাঝেই দড়ি ব্যবহার করছে মুরলীধর। নিজে বিপজ্জনক জায়গা পেরিয়ে গিয়ে দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে। দড়ি ধরে একে একে আমরা ওর কাছে পৌঁছচ্ছি। বার বার সাবধান করছে, "নরম বরফ, পা দেবেন না যেন।"

সূর্য ছুটে চলেছে পশ্চিমাঞ্চলে। দিগন্তে আবীরের আলপনা। মেঘদল উন্মত্ত আবেগে আকাশের সঙ্গে হোলি খেলছে।

কেবলই পিপাসা পাচ্ছে। বরফ কুড়িয়ে মুখে পুরছি। শক্ত বরফ খেতে বিস্বাদ। চিবানো যায় না। দাঁতে লাগে। অথচ শক্ত বরফ দেখে দেখে তার ওপর পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে মুরলীধর। নরম বরফ বেশ দূরে দূরে। তবু হামাগুড়ি দিয়ে যতটা সম্ভব পাশে গিয়ে নরম বরফ তুলে আনছি। ভাগাভাগি করে খাচ্ছি সবাই। অনেকক্ষণ পিপাসা পাবে না। মাঝে মাঝে সুমনও তুলে আনছে। দুবার মুরলীধর তিরস্কার করেছে তাকে, একটু দূরে চলে গিছল বলে।

অবিরাম কুল্‌কুল্‌ করে বয়ে চলেছে গঙ্গা—অদৃশ্য গঙ্গা। শুধু পথের নিশানা নয়, ফিরতি পথের আবহ-সঙ্গীত ঐ কলকাকলি।

কান পেতে আছি সে সঙ্গীতের দিকে। আর একটা গুন্‌গুন্‌ ধ্বনিও কানে আসছে। সুমন গাইছে ওর মাতৃভাষায়। কথা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু সুরটা শুনছি। ভারী মিষ্টি লাগছে। কথাগুলোও নিশ্চয় সুন্দর। একটানা গাইতে পারছে না অবশ্য, মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু।

হঠাৎ তারই মধ্যে একবার পেছন থেকে প্রশ্ন করল সুমন, "আচ্ছা, আমাদের বাড়ি ফিরতে কদিন হবে? দু সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছতে পারব?"

কৌতুক অনুভব করি। বড়ই উতলা হয়ে উঠেছে বেচারী বাড়ির জন্য।

একবার মনে হল ওকে চটিয়ে দিই। বলি, বাড়ি কিন্তু আমাদের দুজনের দুদিকে। বহু ব্যবধান—ও নিজেই বলেছে দেড় হাজার মাইল। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। এখানে উত্তেজিত করে লাভ নেই। চুপ করে থাকি। পথ বড় দুর্গম। সাবধানে চলতে হচ্ছে। বরফ যেন আরও বেড়েছে—যাবার সময় তো এত বরফ দেখতে পাইনি! তবে কি আমাদের চলে যাবার পরও তুষারপাত হয়েছে? হতে পারে—তুষারের রাজ্যে তুষারপাতের কি কোন সময় অসময় আছে?

মনকে প্রবোধ দিই, আর দেরি নেই। এ কষ্ট শেষ হল বলে—সেই আশ্বাসে এগিয়ে চলি ক্রমাগত।

অকস্মাৎ একটা অব্যক্ত আর্ত চীৎকার যেন শব্দের বিদ্যুৎ হেনে সেই শান্ত সুন্দর আবহাওয়ায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সে শব্দ একটা তপ্ত শলাকার মত কানে এসে বিঁধল আমাদের।

সুমন?

"ওগো বাঁচাও!" আবারও যেন ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল। মুমূর্ষু কণ্ঠের অন্তিম আর্তনাদ। চাবুকের মতই সে আর্তনাদ আঘাত করল আমার চৈতন্যকে।

"সুমন!" পাগলের মত ছুটে গিয়ে ওর প্রায়-অদৃশ্য দেহকে আঁকড়ে ধরতে যাই, কিন্তু পারি না।

"সুমন! সুমন!"

সুমন নেই—কেউ নেই, শুধু আছে একটা গহ্বর। একটা গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে ওর তলিয়ে যাওয়া জায়গাটায়। সুমন তলিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে, অপসৃত হয়েছে দৃষ্টির বাইরে।

না না, ওকে বাঁচাতেই হবে। অকস্মাৎ জড়তা কেটে যায়। বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠি। লাফ দিতে যাই—কেউ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। স্বামীজী বরফের ওপর আছড়ে ফেলেন আমাকে।

"ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন!" স্বামীজীর বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে চাই। প্রাণপণে ছাড়াতে চাই তাঁকে।

পারি না।

কিন্তু সত্যিই কি সুমন নেই? আমার ডাকে আর কি কোনদিন সাড়া দেবে না সুমন? গহ্বরটাকে লক্ষ্য করে আবার চীৎকার করে উঠি, "সু-ম-ন!"

কতক্ষণ পরে জানি না, চোখ মেলে দেখি আমাকে ঘিরে রয়েছে রঞ্জন মুরলীধর ও স্বামীজী।

"সুমন!" উঠে বসতে চাই। বাধা দেয় ওরা। "কিন্তু সুমন—সুমন কোথায়?"

"সুমন নেই।"

"নেই?"

"না। নরম বরফ তুলতে গিয়ে, মুরলীধরের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পা দিয়ে বরফে তলিয়ে গেছে।" রঞ্জন বলে।

"তলিয়ে গেছে?" কান্নায় স্তব্ধ হয়ে আসতে চায় আমার কণ্ঠ, "বরফ খুঁড়ে ফিরিয়ে আনা যায় না তাকে?"

"আমরা চেষ্টা করেছি—পারি নি। ফাটলের মধ্যে পড়ে গেছেন। নিশ্চয়

বহুদূরে চলে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে। নিচে প্রবল স্রোত।" মুরলীধরের কণ্ঠ নিয়তির মতই নির্মম।

সুমন চলে গেছে আমাদের ছেড়ে—আমাকে ছেড়ে। মরজগতের সীমারেখা পেরিয়ে—পার্থিব জীবনের উর্ধ্বে। আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে। হাসিভরা মুখখানি নিয়ে আর কখনও সে আসবে না আমাদের সামনে। এ যে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কি সম্ভব ? না না, সুমন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। নইলে দাদাকে আর সাবিত্রীকে কৈফিয়ৎ দেব কি ? তাঁরা যে আমাদের ভরসায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে।

সুমন ছিল—এখন নেই। মানুষ কেন থাকে না ? আমি আছি। নাও থাকতে পারি! তবু থাকতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বেঁচে থাকতে হয় এ সংসারে। বাঁচতে হয় অন্ধকে খঞ্জকে সঙ্গীহীন ভাগ্যাহতকে। যারা সুমনকে বাঁচাতে পারেনি তারাই আমাকে উপদেশ দিল—সান্ত্বনা দিল। রঞ্জন কাছে টেনে নিল। ঠিক যেমন করে সুমন আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিল গোমুখীতে।

সহসা স্বামীজী বলেন, "ছিঃ ছিঃ! তুই না আত্মবিশ্বাসী ? এত বিচলিত হয়ে পড়লি কেন ?"

"সুমন যে নেই স্বামীজী!"

"কে বলল সুমন নেই ? সুমন রয়েছে।"

চমকে উঠি। "সুমন আছে ? কোথায় ?"

"তোর ভালবাসায়।"

"সুমন ছাড়া সে ভালবাসার সার্থকতা কোথায় ?"

"স্মৃতিতে। সুমনের স্মৃতিই সে ভালবাসাকে মহিমান্বিত করে তুলবে। আত্ম-নিগ্রহ নয়—আত্মবিকাশ।"

দিগন্তে রক্তের ছড়াছড়ি। আমার সুমনের রক্তে লাল হয়ে গেছে আকাশ। সূর্য যাচ্ছে অস্তাচলে। আসছে আঁধার—কালরাত্রির আঁধার।

॥ পঞ্চাশ ॥

আঁধার চিরস্থায়ী নয়। সে যতই কালো হোক, আলো তাকে অনুসরণ করে। রাত্রির অবসান হয়। ধরিত্রীর সকল বিষাদ ঘুচিয়ে উষার হাসি দেখা দেয়। সে হাসিতে থাকে দুঃখকে জয় করার প্রেরণা, দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করার বাসনা, বর্তমানকে আলিঙ্গন করার কামনা।

পাতাল-প্রসারী সেই গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে অস্তাচলগামী সূর্যকে দেখে ভেবেছিলাম, আমার সারা ভবিষ্যৎও আগত ঐ আঁধারের মতই কালো হয়ে গেছে। অন্ধকার দুর্গম পথে আমিও সুমনের মত হারিয়ে যাব। কিন্তু তা হয় নি। স্বামী তত্ত্ববোধের তত্ত্বাবধানে ফিরে এসেছিলাম চিরবাসা। স্বামীজী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আমি তাকিয়ে ছিলাম আঁধারের দিকে। অনন্ত আঁধারের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম—আগামী দিনের আলোর ভিতরে আমার সুরে সুমন কি সঞ্চারিত হয়ে উঠবে না?

ভাবতে ভাবতে কখন আঁধারের অবসান হয়েছিল টের পাইনি। স্বামীজীর ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম। সোনালী রোদে হাসছিল চিরবাসা। আমাকেও যেন সে ওরই মত হাসিখুশি দেখতে চেয়েছিল।

তারপর চারদিন হেঁটে কাল সন্ধ্যায় এসেছি উত্তরকাশী।

কিন্তু না—আর উত্তরকাশী নয়। উত্তরকাশীর আকাশে বাতাসে মন্দিরে গঙ্গাতীরে সুমনের স্মৃতি রয়েছে জড়িয়ে। তত্ত্ববোধ বলেছিলেন, সুমনের স্মৃতিই তার ভালবাসাকে মহিমান্বিত করে তুলবে। স্মৃতি মানুষের সম্পদ। তা হলেও স্মৃতিকে তার বড় ভয়। স্মৃতি যে তার অতীতের দর্পণ। তাই পালিয়ে চলেছি উত্তরকাশী থেকে।

এই সেই পাহাড়-ঘেরা অনিন্দ্যসুন্দর উত্তরকাশী। দুটি পাহাড় দুদিক থেকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করেছে এই মনোরম উপত্যকা। বিধৌত হচ্ছে করুণা-বিগলিত উত্তর-প্রবাহিণী গঙ্গাধারায়। এই পথে সেদিন সুমনের সঙ্গে এসেছিলাম সিংগোট থেকে। গিয়েছিলাম গঙ্গোত্রী। সেই সৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠ। আয়তনে ছোট কিন্তু সুন্দর। ছাত্ররা সংখ্যায় সামান্য কিন্তু পাণ্ডিত্যে নয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে অধ্যয়নের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সুমনের তাগিদে সেদিন আমাদের ভেতরে যেতে হয়েছিল।

ঐ সেই পরশুরামের মন্দির। হ্যাপিকে খুশি করতে সেদিন সুমন এ মন্দিরে ঢোকে নি। বলেছিল—সে ক্ষত্রিয়। হ্যাঁ, সত্যই সুমন ক্ষত্রিয়। নইলে ওভাবে মরণকে বরণ করতে পারে?

তারপর সেই স্কুল বিশ্বনাথ মন্দির আদালত কাছারী হাসপাতাল ডাকঘর জয়পুর মহারাজার মন্দির ও ছত্র।

সেদিনের মত আজও বিড়লা ধর্মশালার দিকে না গিয়ে বাজারের রাস্তায় নেমে এসেছি। বাজার ছাড়িয়ে কালিকমলী ধর্মশালা। আপনা থেকেই পা দুখানি থেমে গেছে। এখানেই সুমন থাকত। রঞ্জন আমাকে থেমে থাকতে দেয়নি—

হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছে। বন্ধুর কাজই করেছে। জীবনের পথে থামবার অবকাশ নেই।

বিড়লা ধর্মশালা ছাড়িয়ে রাস্তার দু-দিকই ফাঁকা। ডান দিকটা সমতল। হাট বসে। আগামী দিনের বাস-স্ট্যাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট। বাঁ দিক বড় বড় পাথরে বোঝাই। জনশ্রুতি এখানে প্রাচীনকালে অনেক মন্দির ছিল। গঙ্গার বন্যায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

তার পর রাস্তা উঁচু হয়ে গেছে। পাহাড়ী পথ শুরু। গঙ্গার তীর ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ পথ। কোন রকমে একখানি জীপ চলতে পারে। পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ধরাসু থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করবে। তখন এ পথের অভিনবত্ব যাবে মুছে। বিজ্ঞান মানুষকে প্রতিনিয়ত পরাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। দূর নিকট হচ্ছে। কিন্তু যাত্রীর সঙ্গে পথের নৈকট্য ঘুচে যাচ্ছে।

ধরাসু থেকে বাসে চাপতে হবেই। তাই এই পথটুকু আমরা জীপে না চেপে হেঁটে চলেছি। মন যতই ভারাক্রান্ত হোক, শরীর যতই দুর্বল হোক, আমরা হাঁটব। সুমনও হাঁটতে ভালবাসত। ডাণ্ডি ছেড়ে দিয়ে যমুনোত্রী থেকে হেঁটে নেমেছে। হাঁটতে হাঁটতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

পাহাড়ী পথের শেষে আবার একটা উপত্যকা। এটা উত্তরকাশীর শহরতলি। এ অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তারপরে দুদিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। ডানদিকে পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসে বাঁদিকে গঙ্গার পায়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। গঙ্গা আবার দক্ষিণ-প্রবাহিণী। পাহাড়ের গায়ে চাষীদের বাড়ি। ছোট্ট গ্রাম জোকানুরী। মনে হয় বাড়িঘর তৈরি করে সমতলভূমি নষ্ট করে নি। সমতলভূমি শুধু চাষের জন্য। মাঝ-খান দিয়ে চলে গেছে পথ—নাকোরির পথ। সবই ঠিক তেমনি আছে। শুধু সুমন নেই।

বরুণা সঙ্গম পেরিয়ে আবার পাহাড়ী পথ। বেশ কয়েক মাইল। তার পর পল্লীগ্রাম। গুনরীর পল্লীগ্রাম। আগের মত সবুজ নয়—ধূলি-ধূসরিত। পাহাড়ের রাজ্যে এরকম বৃক্ষহীন ধূলিময় প্রান্তর আর চোখে পড়ে নি। সেদিন সুমনও বলেছিল এ কথা। তবে পাগলা হাওয়া এত দাপাদাপি করে নি সেদিন। তাই চোখ মেলে চারিদিকে চাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আজ চোখে মুখে ধুলো ঢুকছে অবিরাম। তার ওপর অসহ্য গরম। সেদিন এখানে বেশ আরাম লেগেছিল। আগের দিন সিংগোটের পথে প্রচণ্ড শীতে অস্থির হয়েছিলাম। সমতলভূমির উষ্ণতা সেদিন ভাল লেগেছিল। ইতিমধ্যে শীত আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। আজ

তাই সারাশরীর গরমে পুড়ে যাচ্ছে। আছাড় খেয়ে ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা। চলতে কষ্ট হচ্ছে।

কপিলমুনির আশ্রম। দেবাহুতি ও প্রজাপতির পুত্র সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল-মুনি। ভাগবতের মতে পঞ্চম অবতার। কিন্তু ইন্দ্র সগর রাজার শততম যজ্ঞের অশ্ব এখানে বাঁধেন নি। মুনি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন তাঁর সাগরদ্বীপের আশ্রমে। নাকোরির এ আশ্রমে বোধ হয় তিনি গ্রীষ্মকাল কাটাতেন।

অবশেষে সেই চায়ের দোকানে এসে বসা গেল। উত্তরকাশী থেকে এই সাড়ে ছ মাইল আসতে আমাদের প্রায় দু ঘণ্টা লেগেছে। ধরাসু এখান থেকে এগারো মাইল। এ জায়গাটা নাকোরির এসপ্ল্যানেড্। তিনটি প্রধান রাস্তার সঙ্গম—উত্তর-কাশী সিংগোট ও ধরাসু। আমরা সেদিন সিংগোট থেকে এখানে এসেছিলাম। এই দোকানে বিশ্রাম করেছিলাম। তারপর সুমনকে নিয়ে উত্তরকাশী গিয়েছিলাম। আজ সুমনকে না নিয়েই ধরাসু ফিরছি।

নাকোরির পর অজানা পথ। সাড়ে চার মাইল হেঁটে উদ্দালক। এখানে ধনারী নদী গঙ্গায় মিশেছে। দশ মাইল দূরে নচিকেতা হ্রদ। ধনারীর উৎস। উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা তপস্যা করেছিলেন সেখানে।

গঙ্গার অপর পাড়ে পাহাড়ের গায়ে শৃঙ্গোরী গ্রাম। ফুলের মত ফুটে আছে ছোট ছোট কুঁড়েগুলো। মুচরার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ি ঐ গাঁয়ে। মুচরা হয়ত ভাবছে তার প্রথমা বধূর কথা। রঞ্জন ভাবছে ভারতের প্রথম শিক্ষাগুরু সন্দীপন মুনির সুযোগ্য শিষ্য উদ্দালকের কথা। সন্দীপন উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্যকে এদেশের সক্রেটিস্ প্লেটো ও আরিস্টটল বলা যেতে পারে। কিন্তু গুরুভক্তির দিক থেকে উদ্দালকের স্থান মনে হয় সবার ওপরে। আর আমি ভাবছি···

ধনারী সঙ্গমের পর থেকে রাস্তা একটু অসমতল। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। সমতল করার কাজ চলেছে। এ কাজ শেষ হলেই বাস চলবে।

রাস্তার দু'দিকে ছোট ছোট গ্রাম। গাছপালাও রয়েছে কিছু কিছু। ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে গঙ্গা। উত্তরকাশীর পর থেকে গঙ্গা একটু একটু করে প্রশস্ত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বেশ দূরে চলে গেছে। তাহলেও তার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে ক্ষেত। ক্ষেতের পরে গঙ্গা। জল অনেক নিচে।

বড্ড পিপাসা পেয়েছে। রঞ্জন বলে, "চল না, গাঁয়ের ভিতরে গিয়ে দেখি জল পাওয়া যায় কিনা।"

মুচরাকে রাস্তার ওপর বসিয়ে রেখে আমরা দুজনে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। একজন লোক কুয়ো থেকে জল তুলছেন। সানন্দে তিনি আমাদের জল

তুলে দিলেন। সুমিষ্ট শীতল জল। মুখহাত ধুয়ে, পেটভরে জল খেয়ে ওয়াটার-বট্‌ল ভর্তি করে নিলাম।

"একটু পা চালিয়ে চলুন শেঠজী। ধরাসু আর মাত্র তিন মাইল।" মুচরা উৎসাহ দেয়। সে বেশ জোরে জোরে পা চালিয়েছে ˙ ঘরের ডাক শুনতে পেয়েছে। মন আকুল হয়ে উঠেছে।

সুমনও এমনি আকুল হয়েছিল ফেরার জন্য। তার নাকি বড্ড ভয় করছিল। সে কি বুঝতে পেরেছিল তার পথ ফুরিয়ে এসেছে? মানুষ কি পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে বুঝতে পারে?

ধরাসু। এখান থেকেই দু'শ সাতান্ন মাইল পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলাম। সেদিন যাঁরা সঙ্গে ছিলেন আজ তাঁরা নেই। এখান থেকে মুচরাও বিদায় নিল। বহুদিনের সঙ্গী মুচরা। বহু আনন্দ-বেদনার সাক্ষী সে। কাল সেও থাকবে না। আমরা থাকব বাসে—ঋষিকেশের পথে, সে থাকবে ঘরে—সহধর্মিণীদের পাশে।

সেদিন ধরাসুতে সুমনকে চিনতাম না। আর আজ? না—আজও তাকে চিনি না। তাকে দেখেছি, সঙ্গে চলেছি, কথা বলেছি—কিন্তু তাকে চিনি নি। চিনতে চাই নি। চাইলে তার হাত ধরে গঙ্গোত্রী থেকে আসতাম ফিরে।

পথ হয়ত ফুরোল—পাথেয় হয়ে রইল গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর হৃদয়জোড়া স্মৃতি।

যাত্রী কম। ঘর পেতে কোন অসুবিধে হয় নি। রঞ্জন দোকান থেকে খাবার কিনে এনেছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছি। কাশীরাম দাসের মহাভারতের কথা শুনতে পাচ্ছি। ভৈরবঘাটির সেই বৃদ্ধারা পাশের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরের ভেতরে বোধ করি গরম লাগছে। তাই তাঁরা বারান্দায় বসে গঙ্গাবতরণের কাহিনী পড়ছেন। হঠাৎ রঞ্জন প্রশ্ন করে, "এ কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু, তা কি কোনদিন বিচার করে দেখেছ?"

এসব আলোচনা করার মত মানসিক অবস্থা আমার নেই। চুপ করে থাকি। রঞ্জন বোধ করি আমাকে অন্যমনস্ক করার জন্যই মহাউৎসাহে বলতে থাকে সে ইতিহাস—

"সূর্যবংশের রাজা বাহু—শক ও যবনদের কাছে পরাজিত হলেন। পালিয়ে গেলেন ব্যাবিলনের নিকটে মার্ত প্রদেশে—ভৃগুবংশীয় ঔর্ব ঋষির আশ্রমে। সেখানেই সগরের জন্ম হল। বায়ু পুরাণে আছে—সগর বড় হয়ে শকদের অর্ধেক আর যবনদের পুরো মাথা মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৮ শতকে ব্যাবিলনের রাজা হলেন

অর্কভিস্ বংশের সরগন। অর্ক মানে সূর্য। কাজেই সগরই হয়তো এই সরগন। পুত্র অসমঞ্জস্যের সামঞ্জস্যহীন আচার-ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে পৌত্র অংশুমানকে নিয়ে সগর চলে এলেন আর্যাবর্তে—অযোধ্যায়।

"রাজমহল পর্যন্ত ছিল সমুদ্র। অগস্ত্য সমুদ্রের জল নিষ্কাষণ করে উদ্ধার করেছেন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। কিন্তু সেখানে জল নেই—ঊষর মরুভূমি।

"সগর ষাট হাজার প্রজাকে নিয়োজিত করলেন তাঁর সেচ-পরিকল্পনায়। পুত্রের মর্যাদা দিলেন তাদের। অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। অশ্ব মানে জল। ষাট হাজাব প্রজা খাল কাটতে শুরু করল। রাজা ধুন্ধুমার যমুনা ও সরস্বতীকে নিয়ে এসেছিলেন। সগর সম্ভবত সেই দক্ষিণমুখী জলধারা পূবমুখে নিয়ে চললেন। পথে জলের ধারা চোরাবালিতে হারিয়ে গেল—যজ্ঞাশ্ব চুরি গেল। কপিল মানে রুদ্র। ষাট হাজার পুত্র জলাভাবে মারা গেলেন। অংশুমান জলধারাকে উদ্ধার করলেন—কপিলমুনি অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। অংশুমানের ছেলে দিলীপও পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দিলীপের ছেলে ভগীরথ জলের ধারা সাগর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেল না। জল খুঁজতে ভগীরথ গেলেন বিষ্ণুপদ শৃঙ্গে—গোমুখীর পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে। পেলেন বরফাবৃত ব্রহ্মকমণ্ডলু—বিন্দুসর হ্রদ। বরফ কেটে সৃষ্টি করলেন গোমুখী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে সেই বিগলিত করুণাধারাকে নিয়ে এলেন গঙ্গোত্রী। মহাদেবের জটা বেয়ে প্রাণময়ী বসুধারা নেমে এল মর্ত্যলোকে—কপিলসদনে—

"যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥"

কত কি বলে চলে রঞ্জন। কিছু কানে যায়, কিছু যায় না। যা যায় তাও সব বুঝি না।

আমি ভাবি অন্য কথা। কত পুণ্যার্থী কত উপচার দিয়েছে বিষ্ণুপদ-শৃঙ্গ-নিঃসৃত এই পরম পবিত্র ধারায়। কিন্তু কেউ কি আমার মত দিয়েছে? জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন আমি অর্ঘ্য দিয়ে গেলাম। পতিতপাবনীর পরম পরশে সুমন বৈকুণ্ঠে গেছে কিনা জানি না—কিন্তু পুণ্য-পীযূষ-স্তন্যবাহিনী জাহ্নবী কি ধন্য হন নি সুমনের পরশে?

হয়ত এই ভাল হল। ওখানে যা পরম পবিত্র—মর্ত্যের মাটিতে তাই ধূলি-ধূসরিত। এখানে হয়ত সুমনের স্বপ্ন ভেঙে যেত। যে মাধুর্য মিশে আছে তার স্মৃতিতে, তাও যেত বিষাক্ত হয়ে। তার চেয়ে এই ভাল। মহীয়সী সুমনের চেয়ে মহত্তর তার স্মৃতি। পার্থিব জীবনে আমি তাকে পাই নি। পাওয়ার আনন্দের চেয়ে না-পাওয়ার বেদনা মধুর। সেই মধুর বেদনাই আমার ভাবী জীবনের মধু।